সৃজন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বার্ষিকী-২০০২

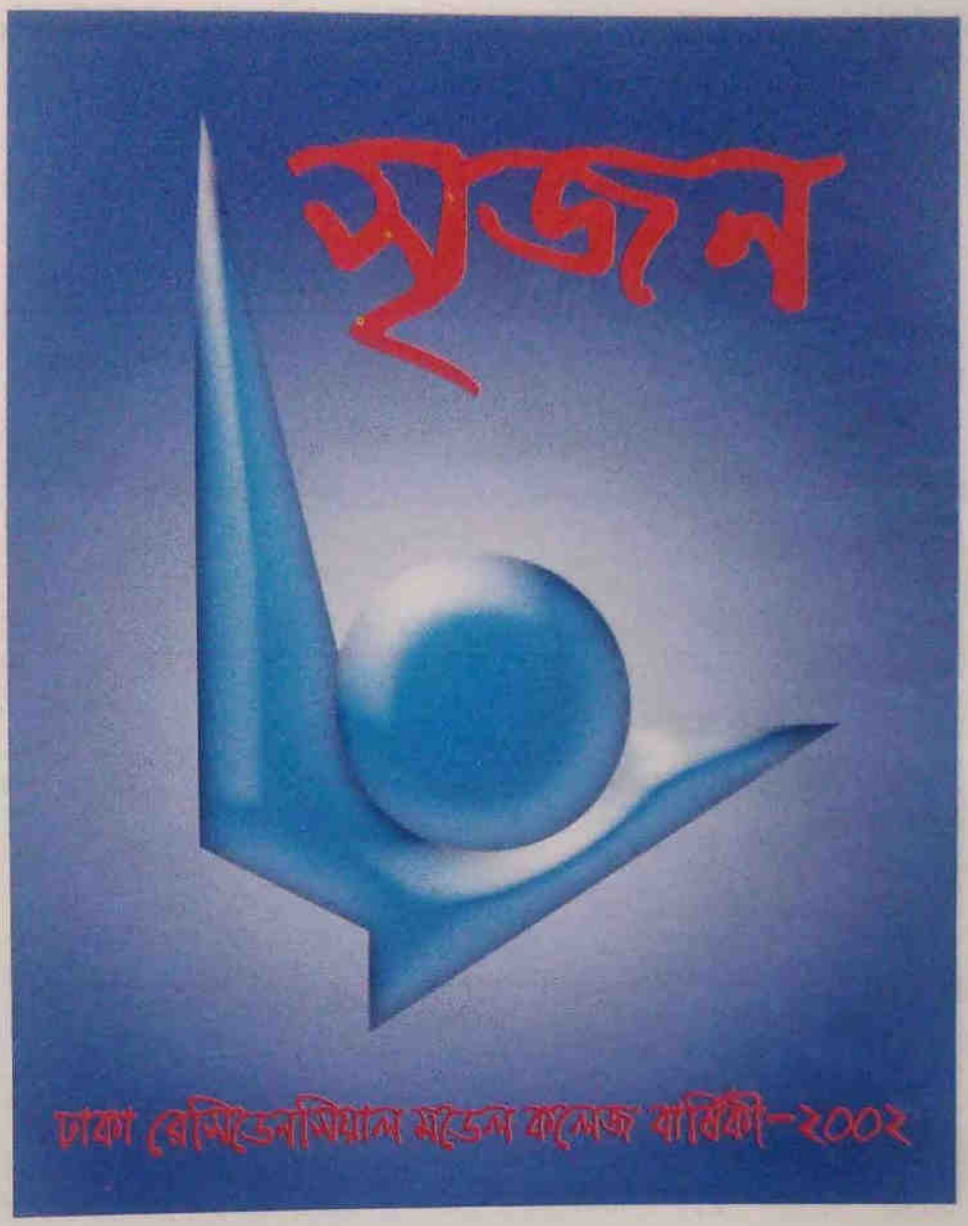

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য

STRIVE FOR EXCELLENCE

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক

অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী

মানজুর আল মতিন
কলেজ নম্বর : ৬০২৮
দ্বাদশ, বিজ্ঞান

মুদ্রণে

আল-মাইমানা (প্রাঃ) লিমিটেড
১৫, বিজয় নগর, ঢাকা
ফোন : ৯৩৪২৯৬১

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে

মোঃ সুজা-উদ-দৌলা
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ
ও
মোঃ রফিকুল ইসলাম সেলিম
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

অধ্যক্ষ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১৮৮৩৪, ৯১২৯৯১৭
২৭ আষাঢ় ১৪০৯
১১ জুলাই ২০০২

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা

সৃজনশীলতা ও মননশীলতা মানব মনের চিরন্তন ধর্ম। জীবনকে নানারূপে প্রত্যক্ষ করা, জীবনের অতলান্ত রহস্য উন্মোচন করার অসীম আকুলতা, নিত্যকালের সত্য ও বাণীকে নিজের মত করে বলার ঐকান্তিক আগ্রহই মানুষকে করে তোলে সৃষ্টিশীল। সাহিত্য এ সৃষ্টিশীলতারই বাণীবদ্ধ রূপ, মানব মনের ভাবনা কল্পনা প্রকাশের পথ অনুসন্ধান করে, নিজেকে বাঙ্ময় করে তুলতে চায়, সৃজনশীলতার এ আকুতিকে বয়সের সীমারেখায় বাঁধা যায় না। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতার এ আবেগ ও আকুলতাকে ধারণ করেই কলেজ সাহিত্য বার্ষিকী **সৃজন**-এর আত্মপ্রকাশ, এ আত্মপ্রকাশে অধ্যক্ষ হিসেবে আমি আনন্দ ও গৌরব অনুভব করছি।

মূলত শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের কচি-কোমল মনের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে এ সাহিত্য বার্ষিকীতে। একদিন এ সমস্ত ক্ষুদে লেখকের মধ্য থেকেই প্রতিভার দীপ্তিতে স্নাত সৃজনশীলতার ভাস্বর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটবে-এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

পরিশেষে যাদের উৎসাহ, সহযোগিতা ও কর্মনিষ্ঠার ফলে এ সাহিত্য বার্ষিকী আত্মপ্রকাশ করল তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

'সৃজন' হয়ে উঠুক শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার অমূল্য অনুপ্রেরণা।

কর্নেল মোঃ মোশাররফ হোসেন
অধ্যক্ষ

কলেজবার্ষিকী পরিষদের মাঝে অধ্যক্ষ

সম্পাদকীয়

মানুষ স্বভাবত সৃজনপ্রয়াসী। সে প্রকাশ করতে চায়, প্রকাশিত হতে চায়, নিজের অন্তরের একান্ত সুপ্ত অনুভূতিগুলোকে বাণীরূপ দিতে চায়, নব নব সৃষ্টির নেশায় সে অদম্য শক্তিতে জয় করতে চায় মহাবিশ্বকে। মানুষের এ সৃজনপ্রয়াস ও আত্মবিকাশের অমিত শক্তির নামই প্রতিভা। মানুষের সেই অমূল্য প্রতিভা-বিকাশের জন্য প্রয়োজন উন্মুক্ত–অবারিত সুযোগ, উপযুক্ত প্রকাশমাধ্যম। আর এই প্রয়োজনবোধ থেকেই প্রকাশিত হলো ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের এ বছরের বার্ষিকী 'সৃজন'।

এ কলেজের তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররাই **'সৃজন'** -এর মূল লেখক। তাদেরকে লিখনকর্মে আরো উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাও লিখেছেন 'সৃজন'-এ। ছাত্র-শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে 'সৃজন' হয়ে উঠেছে মননদীপ্ত, প্রাণবন্ত।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের পাঁচটি আবাসিক ছাত্রাবাস (হাউস) থেকে সম্পূর্ণভাবে ছাত্রদের সম্পাদনায় প্রতি বছরই প্রকাশিত হয় দেয়াল পত্রিকা। এসব পত্রিকায় শিশু-কিশোর-তরুণ ছাত্ররা তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পায়। 'সৃজন'-এ ছাত্রদের সেই নিয়মিত মননচর্চার বিন্দু-বিচ্ছুরণ ঘটেছে মাত্র। ছাত্ররা 'সৃজন'-এ কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ, কৌতুক, রম্যরচনা, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা যা কিছুই লিখেছে, নিঃসন্দেহে তা তাদের কচি মনের ও কাঁচা হাতের অপরিণত রচনা। তাই এগুলোকে সাহিত্য-শিল্পের মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ না করে নবীন লেখকের অঙ্কুরোদগম হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের প্রতি সুবিচার করা হবে।

'সৃজন' সম্মিলিত প্রয়াসের ফসল। অধ্যক্ষ মহোদয়ের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় এবং বার্ষিকী কমিটি-২০০২ এর সদস্যবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় 'সৃজন' যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। এ জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ-এর বোর্ড অব গভর্নরস-এর সম্মানিত সদস্যগণের তালিকা

১।	মোহাম্মদ শহীদুল আলম সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঃ	সভাপতি
২।	মুহাম্মদ আবুল কাসেম অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঃ	সদস্য
৩.	আবদুর রশীদ মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	ঃ	সদস্য
৪.	প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	ঃ	সদস্য
৫.	এস, কে, বিশ্বাস যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঃ	সদস্য
৬.	মোঃ এমদাদ হোসেন যুগ্ম সচিব, (অবঃ) ৬০/এফ (৩য় তলা) আজিমপুর সরকারী কলোনী ঢাকা-১২০৫ (অভিভাবক প্রতিনিধি)	ঃ	সদস্য
৭.	কে এম হেলাল উদ্দিন মহাব্যবস্থাপক নিটল মটরস লিঃ (অভিভাবক প্রতিনিধি)	ঃ	সদস্য
৮।	এ বি এম শহীদুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রভাতী শাখা) ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	ঃ	সদস্য
৯।	মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ প্রভাষক, গণিত বিভাগ শিক্ষক প্রতিনিধি (দিবা শাখা) ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	ঃ	সদস্য
১০।	কর্নেল মোঃ মোশাররফ হোসেন অধ্যক্ষ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	ঃ	সদস্য-সচিব

সৃজন

সৃজন

পৃষ্ঠপোষকতায়
কর্নেল মোঃ মোশাররফ হোসেন, অধ্যক্ষ

বার্ষিকী সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ-২০০২

১।	মোঃ সুজা-উদ-দৌলা (সহকারী অধ্যাপক)	–	আহবায়ক
২।	ফেরদৌস আরা বেগম (সহকারী অধ্যাপক)	–	সদস্য
৩।	মাহবুবা হাবিব (প্রভাষক)	–	সদস্য
৪।	মোঃ নূরুন নবী (প্রভাষক)	–	সদস্য
৫।	রফিকুল ইসলাম (প্রভাষক)	–	সদস্য
৬।	শাহীন আখতার (প্রভাষক)	–	সদস্য
৭।	মোঃ হায়দার আলী (প্রভাষক)	–	সদস্য
৮।	সাবেরা সুলতানা (প্রভাষক)	–	সদস্য
৯।	মোহাম্মদ নূরুন্নবী (প্রভাষক)	–	সদস্য
১০।	মির্জা তানবীরা সুলতানা (প্রভাষক)	–	সদস্য
১১।	আহসান ইবনে মাসুদ (প্রভাষক)	–	সদস্য
১২।	কাজী জুলফিকার আলী (প্রভাষক)	–	সদস্য
১৩।	কামরুন নাহার খানম (প্রভাষক, দিবা শাখা)	–	সদস্য
১৪।	ফারহানা রহমান (প্রভাষক, দিবা শাখা)	–	সদস্য
১৫।	ওবায়দুর রহমান (প্রভাষক, দিবা শাখা)	–	সদস্য
১৬।	সোহানা বিলকিস (প্রভাষক, দিবা শাখা)	–	সদস্য

ছাত্র-সদস্যবৃন্দ :

১। মানজুর আল মতিন, দ্বাদশ বিজ্ঞান

২। এস, এম, মিনহাজ উদ-দীন, দ্বাদশ বিজ্ঞান

৩। আশরাফ আলী, দ্বাদশ বিজ্ঞান (দিবা শাখা)

৪। নাহিয়ান-বিন-জলিল, দ্বাদশ বাণিজ্য (দিবা শাখা)

কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের তালিকা

প্রশাসন বিভাগ ঃ

১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা	–	এম মোবারক আলী
২। উচ্চমান সহকারী	–	মোঃ নূরুল হুদা
৩। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	আব্দুল বাতেন
৪। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	রওশন আরা
৫। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	মোঃ সানাউল্লাহ
৬। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	মোহাম্মদ মাসুম

স্টোর সেকশন ঃ

১। স্টোর অ্যাসিসটেন্ট	–	সৈয়দ শাব্বীর আহমেদ

গ্রাউন্ড শাখা ঃ

১। গ্রাউন্ড সুপার	–	এইচ এ মান্নান

রক্ষণাবেক্ষণ শাখা ঃ

১। উপ সহঃ প্রকৌশলী	–	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান

এম, টি শাখা ঃ

১। গাড়ি চালক	–	আব্দুল খালেক
২। গাড়ি চালক	–	মোঃ শহিদ উল্লাহ

হিসাব শাখা ঃ

১। উচ্চমান সহকারী	–	তহমিনা খানম
২। হিসাব সহকারী	–	মোঃ মিজানুর রহমান
৩। হিসাব সহকারী	–	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
৪। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	আব্দুর রহিম
৫। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	ফারহানা আফরোজ

হোস্টেল বিভাগ ঃ

১। মেট্রন	–	আফিয়া খানম
২। স্টুয়ার্ড	–	বশির আহমেদ সরকার
৩। স্টুয়ার্ড	–	খলিলুর রহমান
৪। স্টুয়ার্ড	–	মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার
৫। মেট্রন	–	পারভীন আক্তার (খণ্ডকালীন)

মেডিকেল বিভাগ ঃ

১। মেডিকেল অফিসার	–	ডাঃ মোহাম্মদ এ কে মাসুদ
২। ফার্মাসিস্ট		মোঃ গোলাম মোস্তফা
৩। ফার্মাসিস্ট	–	এস এম মুকুল হোসেন (খণ্ডকালীন)

একাডেমিক উইং ঃ

১। ক্যাটালগার	–	মোঃ মতিয়ার রহমান
২। টি, বি স্টুয়ার্ড	–	মোঃ ওয়াজেদ আলী

কর্নেল মোঃ মোশাররফ হোসেন
অধ্যক্ষ

এ বি এম আব্দুল মান্নান মিয়া
উপাধ্যক্ষ (সিনিয়র)

মোঃ আতাউল হক
উপাধ্যক্ষ (জুনিয়র)

সহযোগী অধ্যাপক

প্রলয় কুমার গুহ নিয়োগী
অর্থনীতি বিভাগ

এ.টি.এম. জালাল উদ্দিন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

সহকারী অধ্যাপক

মোঃ গোলাম মুর্তজা
রসায়ন বিভাগ

মোঃ ফয়জুর রহমান
গণিত বিভাগ

মোঃ নুরুল ইসলাম ভুইয়া
জীববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ সুজা-উদ-দৌলা
ভূগোল বিভাগ

মোঃ আমিনুল ইসলাম
জীববিজ্ঞান বিভাগ

এ, বি, এম শহিদুল ইসলাম
ইংরেজী বিভাগ

মাহফুজা ওয়ালী
রসায়ন বিভাগ

মোঃ হেমায়েত উদ্দীন
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

শামীম রহমান
ইতিহাস বিভাগ

সুলতান উদ্দিন আহমেদ
রসায়ন বিভাগ

ফেরদৌস আরা বেগম
বাংলা বিভাগ

ইরশাদ আহমেদ শাহীন
ইংরেজী বিভাগ

মোঃ নজরুল ইসলাম
ইতিহাস বিভাগ

মোঃ মোস্তফা
ইংরেজী বিভাগ

মোঃ আবদুল লতিফ
গণিত বিভাগ

প্রভাষক

দিলারা বেগম
গণিত বিভাগ

মাহবুবা হাবিব
চারু ও কারুকলা বিভাগ

নিশাত হাসান
ইংরেজী বিভাগ

মোঃ খালেদুর রহমান
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ মনজুরুল হক
গণিত বিভাগ

মোঃ সুলতান উদ্দিন
ক্রীড়াশিক্ষা বিভাগ

মোঃ নুরুন নবী
ইংরেজী বিভাগ

জেহিন বেগম
বাংলা বিভাগ

রওশন আরা চৌধুরী
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ফিরোজ খান
পরিসংখ্যান বিভাগ

শাহীন আখতার
বাংলা বিভাগ

মোঃ হায়দার আলী
বাংলা বিভাগ

মোঃ লোকমান হোসেন
ভূগোল বিভাগ

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজী বিভাগ

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজী বিভাগ

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ নুরুন্নবী
যুক্তিবিদ্যা বিভাগ

রাণী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

আব্দুর রহিম
রসায়ন বিভাগ

মুহাঃ আবুল কালাম আজাদ
গণিত বিভাগ

মীর্জা তানবীরা সুলতানা
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ আহসান ইবনে মাসুদ
বাংলা বিভাগ

মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

কাজী জুলফিকার আলী
বাংলা বিভাগ

প্রদর্শক

আব্দুল মোমেন খান
ভূগোল বিভাগ

মানিক চন্দ্র ঘোষ
রসায়ন বিভাগ

এম এম ফজলুর রহমান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ছানাউল হক
জীববিজ্ঞান বিভাগ

সহকারী শিক্ষক

মোঃ রফিকুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ নুরুল ইসলাম
কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ খলিলুর রহমান
ক্রীড়াশিক্ষা বিভাগ

সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক (দিবা শাখা)

কামরুন নাহার খানম
বাংলা বিভাগ

আসমা বেগম
জীববিজ্ঞান বিভাগ

আসমা পাঠান
ভূগোল বিভাগ

সৈয়দা খালেদা জাহান
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ
গণিত বিভাগ

ফাতেমা জোহরা
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

ফারহানা রহমান
ইংরেজী বিভাগ

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ফারহানা চৌধুরী
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আবু নছর মুহাম্মদ আঃ মাবুদ
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ আনোয়ার শাহাদাত
পরিসংখ্যান বিভাগ

জে এম আরিফুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত বিভাগ

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজী বিভাগ

মোঃ ওবায়দুর রহমান তাং
বাংলা বিভাগ

মোঃ আহসান গনি
রসায়ন বিভাগ

সোহানা বিলকিস
বাংলা বিভাগ

মেঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজী বিভাগ

মোঃ নুরুজ্জামান
ইংরেজী বিভাগ

মোঃ সাফায়েত আলম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

কাজী নায়লা রশীদ
জীববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আরিফুর রহমান
ইংরেজী বিভাগ

হারুন-অর-রশীদ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আবদুল গনি
ইংরেজী বিভাগ

কে এম রবিউল আলম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

আঃ ফঃ মঃ শহিদুর রহমান
ইংরেজী বিভাগ

প্রদর্শক

লায়লা আরজুমান বানু
রসায়ন বিভাগ

জি এম এনায়েত আলি
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

মোঃ কামাল হোসেন
কম্পিউটার বিভাগ

আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

প্রদর্শক

অনাদিনাথ মন্ডল
গণিত বিভাগ

ক্রীড়া শিক্ষক

মোঃ শামসুজ্জোহা

সহকারী শিক্ষক

মোহাম্মদ এনামুল হক
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

সহকারী শিক্ষক

মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া
কৃষিশিক্ষা বিভাগ

প্রয়াত শিক্ষক তোফায়েল আহমেদ

কুমিল্লা জেলার গৌরীপুরের পেন্নাই গ্রামে তোফায়েল আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ফজলুর রহমান ছিলেন সামরিক অফিসার। দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে তোফায়েল আহমেদ ছিলেন দ্বিতীয়। ১৯৮৬ সালে কুমিল্লা বোর্ডের গৌরীপুর সুবল আলতাব উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৮৮ সালে ঢাকা বোর্ডের সাভার কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন। এরপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এস সি (অনার্স) উচ্চতর ২য় শ্রেণীতে এবং এমএসসি গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। ১৯৯৮ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দিবা শাখায় প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। কলেজে যোগ দেবার পর তার বাবা মারা যান। এদিকে পিতার অবর্তমানে সংসারের দায়িত্ব এবং অন্য দিকে নতুন চাকরির ব্যস্ততা। সদা হাস্যমুখ গণিত শিক্ষক শিক্ষাদানকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি অবসরে এসে বলতেন "এই পিরিয়ডে আমার কোন ক্লাস নেই, কোন কাজ আছে?"

তোফায়েল আহমেদ ছাত্রদের গণিত শেখানোর ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল। সব সময় ছাত্রদের কল্যাণচিন্তা করে গেছেন। শ্রেণী কক্ষ, টিচার্স লাউঞ্জ, কম্পিউটার ল্যাব সব জায়গায় তার ছিল প্রাণবন্ত উপস্থিতি। এই মহান শিক্ষাব্রতী ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে সকলকে কাঁদিয়ে পরলোক গমন করেন। আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্তায়ালার কাছে তার রুহের মাগফিরাত কামনা করি।

কামরুন নাহার খানম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

অফিস কর্মচারীবৃন্দের মাঝে অধ্যক্ষ

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাঝে অধ্যক্ষ

চতুর্থ শ্রেণীর হাউস কর্মচারীদের মাঝে অধ্যক্ষ

সূচিপত্র

১. সাম্প্রতিক উন্নয়ন কার্যক্রম (একটি পর্যালোচনা) ১০
২. সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঢাকা রেসিডিয়ানসিয়াল মডেল কলেজ ১২
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ১৭
৪. হাউস প্রতিবেদন
(ক) কুদরত-ই-খুদা হাউস ১৮
(খ) জয়নুল আবেদীন হাউস ১৯
(গ) ফজলুল হক হাউস ২০
(ঘ) নজরুল ইসলাম হাউস ২১
(ঙ) লালন শাহ্ হাউস ২২

ছড়া ও কবিতা

১. সূর্য মামা ২৪
২. ঢাকা রেসিডিয়ানসিয়াল মডেল কলেজ ২৪
৩. ক্রিকেট প্লেয়াররা ২৪
৪. সবুজ বাংলাদেশ ২৪
৫. গরু সমাচার ২৫
৬. জেলের ঘানিটানা ২৫
৭. শিয়াল রাজা ২৫
৮. ছাত্র জীবনই দামী ২৫
৯. উল্টো পেটুক ২৬
১০. মাতৃভূমি বাংলাদেশ ২৬
১১. ভেলকি ২৬
১২. বেশ বেশ বেশ ২৬
১৩. গ্রামগুলোকে দেখে দেখে ২৭
১৪. বাংলা ভাষা ২৭
১৫. আমাদের গ্রাম ২৮
১৬. একুশ তুমি ২৮
১৭. নতুন সাজে ২৮
১৮. আঁতেল ২৮
১৯. মশার ডাক ২৯
২০. বাংলাদেশ ২৯
২১. পড়াশুনা ২৯
২২. মায়ের অনুভব ২৯
২৩. তবে কেন নজরুল ৩০
২৪. তৈলের গুন ৩০
২৫. স্বাধীনতার সুখ ৩০
২৬. শিয়াল মশাই ৩১
২৭. ঢাকা ৩১
২৮. পর্বত তুমি ৩১
২৯. একটা ভয় ৩২
৩০. ফাঁকি ৩৩
৩১. যদি ৩৩
৩২. শিয়াল ৩৩
৩৩. মুক্ত পাখি ৩৩
৩৪. মননে আমার কানন নিলয় ৩৪
৩৫. কিভাবে জানাই ৩৪
৩৬. চারুকারু ৩৪
৩৭. ব্রেন ঠান্ডা ৩৪
৩৮. পেটুক ৩৫
৩৯. ক্রিকেট খেলা ৩৫
৪০. মায়ের চিঠি ৩৫
৪১. রাজনীতি ৩৫
৪২. ম্যারাডোনা ৩৫
৪৩. পকেট হলো ফাঁকা ৩৬
৪৪. এক থেকে বিশ ৩৬
৪৫. ছিনতাই ৩৬

গল্প

১. বাদল ৩৭
২. একটি ছেলে ৩৮
৩. জন্মদিন ৩৯
৪. প্রদর্শনী নম্বর-১৯৯ ৪২
৫. ঈদের খাসি ৪৩
৬. বুদ্ধির ঢেঁকি ৪৫
৭. অগস্ত্য যাত্রা ৪৬
৮. ২১ বছর পর ৪৯
৯. অনিকেত আলোর সন্ধানে ৫৬

সৃজন

সূচিপত্র

ভ্রমণ কাহিনী

১.	সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	৬০
২.	একটি ভ্রমণ কাহিনী	৬১

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

১.	এক অমর স্রষ্টার জীবনী	৬২
২.	ইন্টারনেটের বিশ্ব	৬৩
৩.	তারুণ্যের স্বপ্ন হোক	৬৪
৪.	দাও ফিরে সে অরণ্য	৬৫
৫.	কম্পিউটারের অগ্রযাত্রা	৬৭
৬.	মানুষের কথা	৬৮
৭.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বনাম মানুষের অধিকার	৬৯
৮.	সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব	৭১
৯.	কিছু অপ্রিয় সত্য	৭৩
১০.	প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম কানুন	৭৫
১১.	প্রথম টকটেকিং	৭৮
১২.	রসায়নের রহস্য	৭৯
১৩.	সব্জি হিসেবে মাশরুম	৮০
১৪.	শিল্প চর্চার নান্দনিক বিকাশ	৮৩
১৫.	বাংলা শব্দের বানান ঃ একটি পর্যালোচনা	৮৫

জানা-অজানা

১.	ইংরেজী মাসের নাম	৯৩
২.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	৯৪
৩.	বিশ্বের ব্যতিক্রম ও বিচিত্র	৯৫
৪.	টুটেনখামেনের ধনরত্ন উদ্ধার	৯৬
৫.	সোনার শহর	৯৭
৬.	পিতা	৯৮
৭.	কতিপয় অসঙ্গতি	৯৯
৮.	অলৌকিক	১০১

কৌতুক

১.	কৌতুক	১০২ - ১০৪

English Section

1.	Apples	107
2.	A Fact	107
3.	Education	108
4.	What is Life	108
5.	How are You Bangladesh	108
6.	Soul	109
7.	Beautiful World	109
8.	Holy Wars	109
9.	Present,Past and Future	109
10.	The Very Story	110
11.	The Woman	110
12.	Jokes	110
13.	Joke	110
14.	My Mother	111
15.	A Cricket Match I Enjoyed	111
16.	My Memorable Day	112
17.	A Packet of Jokes	112
18.	A Boy with a Mission	113
19.	Riddles	114
20.	Jokes	115
21.	Three Engineers and a Faulty Car	115
22.	Afghanistan : Humanity vis-a-vis	116
23.	Jokes	117
24.	Don't cry, just laugh	117
25.	The story hour	118
26.	Freedom	118
27.	Jokes	118
28.	Love and Hatred	119
29.	Let a Dream Come True	120
30.	Fourth International Convention on Students' Quality Control Circles, Lucknow, India	123
31.	Cartoons	92,126

সাম্প্রতিক উন্নয়ন কার্যক্রম : একটি পর্যালোচনা

শাহীন আখতার
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

উন্নয়ন কার্যক্রম একটি সচল, সজীব প্রতিষ্ঠানের প্রাণন-শক্তির প্রকাশ। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি রুদ্ধ হলে যে কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মপ্রবাহে আসে অবাঞ্ছিত স্থবিরতা। প্রাতিষ্ঠানিক প্রগতির লক্ষ্যে স্থবিরতার বিরুদ্ধে আমাদের অগ্রযাত্রারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উৎকর্ষের সাধনায় অভিনিবিষ্ট এ প্রতিষ্ঠানটির নিরন্তর কর্মচঞ্চলতায়।

গত এক বছরে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে, যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করে বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

(ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন

(খ) শিক্ষা–সহায়ক উন্নয়ন

(গ) সৌন্দর্য–বর্ধক উন্নয়ন

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রায় অর্ধ-শতাব্দী প্রাচীন এ বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানটির পরিচিতিমূলক নামফলকটি প্রশাসনিক ভবনের দেয়ালে উৎকীর্ণ থাকলেও সীমানা-দেয়াল ও কলেজের চারপাশের শ্যামল বৃক্ষরাজির আড়ালে সেটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল। বর্তমানে আলোকায়নের ব্যবস্থাসহ একটি নতুন নামফলক কলেজের মূল ফটক-সংলগ্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলেজ সংলগ্ন ব্যস্ততম মিরপুর সড়কে পরিচিতিমূলক কয়েকটি প্রচার-ফলকও পুরনো এ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির আত্ম-পরিচয়ের উচ্চকিত স্বাক্ষর বহন করছে।

যথাযথ মর্যাদা সহকারে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য নির্মিত হয়েছে সুশোভন ফ্ল্যাগ-স্ট্যান্ড।

কলেজের আবাসিক ছাত্রদের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ভবনের সামনে কার্ড ফোন বুথ স্থাপিত হওয়ায় বহুদিন ধরে অনুভূত একটি অত্যাবশ্যকীয় চাহিদার পরিপূরণ ঘটেছে।

কলেজের প্রধান দু'টি ফটকে অপেক্ষমাণ অভিভাবকদের জন্যে ছাউনি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ক্যাম্পাসে অবস্থিত শিক্ষক-আবাসনের ব্যাপক সংস্কার-কর্মের উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক-আবাসনের ৩ নম্বর ভবনের জলছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার্সের জলছাদও নির্মিত হয়েছে।

জলাবদ্ধতা নিরসন ও যথাসময়ে জলনিকাশের জন্য জয়নুল আবেদীন হাউস থেকে কলেজের পশ্চিম গেট পর্যন্ত প্রলম্বিত নবনির্মিত নর্দমাটি বর্ষা-মৌসুমে জলাবদ্ধতার প্রকট সমস্যা দূর করবে বলে আশা করা যায়।

বিশাল কলেজ ক্যাম্পাসটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার লক্ষ্যে প্রশাসন ভবন এবং শিক্ষা ভবন ১ ও ২-এর চত্বরে লাগানো হয়েছে সুদৃশ্য লন-লাইট।

আবাসিক ছাত্রদের শরীরচর্চার সুবিধার্থে সবগুলো হাউসের সামনের মাঠে স্থাপন করা হয়েছে রিং-বার।

প্রত্যেক হাউসের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আসবাবপত্র তৈরী করা হয়েছে। কলেজের স্টাফ-লাউঞ্জে উন্নতমানের ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, বুক শেলফ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাভবন ১-এর তৃতীয় তলায় ও শিক্ষা ভবন ২-এর দোতলায় দিবা শাখার শিক্ষকদের জন্য পৃথক তিনটি স্টাফ-লাউঞ্জের বন্দোবস্ত করায় নানারকম প্রশাসনিক অসুবিধা দূর হয়েছে।

শহীদ মিনার ও প্রশাসনিক ভবনের আশেপাশে নির্মিত হয়েছে সুরক্ষা বেষ্টনী।

কলেজ-মসজিদের ভেতরে ও বাইরে ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। মসজিদের ছাদে 'আল্লাহ'-নামের সুদৃশ্য পলি সাইন ফলক স্থাপন করা হয়েছে। মসজিদের ভেতরের দেয়াল সুশোভিত হয়েছে চার কলেমা ও মসজিদে প্রবেশ-প্রস্থানের দোয়ার সুন্দর ক্যালিগ্রাফিতে। মুসুল্লিদের সুবিধার্থে মেঝেতে ফ্লোর-ম্যাটের ওপরে চাদরের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নজরুল ইসলাম হাউস থেকে মসজিদের মূল প্রবেশ পথ পর্যন্ত প্রলম্বিত রাস্তাটি পাকা করা হয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন আইল্যান্ড থেকে স্টাফ কোয়ার্টার্স অভিমুখী রাস্তাটিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষা-সহায়ক উন্নয়ন

বাংলায় "উৎকর্ষ সাধনে অদম্য" এবং ইংরেজীতে "Strive for Excellence"- এ দু'টি চমৎকার বাক্যবন্ধকে বেছে নেয়া হয়েছে কলেজের 'মটো' হিসেবে।

দীর্ঘ বিরতির পর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ। এ অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে প্রথমবারের মত উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষাসচিব, কলেজ পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম। বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সকল সদস্যও সানন্দে উক্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন।

যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

কলেজের অনুষদ সদস্যগণের পরিবার-পরিজন নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি চমৎকার প্রীতি-সম্মিলনী ও বনভোজন পর্ব।

সৌন্দর্য-বর্ধক উন্নয়ন

প্রশাসনিক ভবনের সামনে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলার ভাস্কর্যকে ঘিরে সৃষ্টি করা হয়েছে মনোরম সরোবর ও ফোয়ারা।

শিক্ষাভবন-২ সংলগ্ন এলাকায় গতি, তেজ ও শক্তির প্রতীক ঘোড়ার নবনির্মিত যুগল ভাস্কর্য ছাত্রদের সতত তেজীয়ান ও গতিমান থাকবার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

দেশের ও পৃথিবীর মানচিত্র মননে ও চিন্তায় গেঁথে রাখবার জন্যে তৈরি হয়েছে বিশালকার মানচিত্র।

শিক্ষাভবন-১ এর পশ্চিম পাশের সুদৃশ্য ছাতা যেন বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের নিশ্চিন্ত ও আরামপ্রদ ছত্রচ্ছায়ারই প্রতীক।

অডিটোরিয়াম সংলগ্ন পূর্বপার্শ্বের দেয়াল সজ্জিত হয়েছে চিত্তহারী পারটেক্স ম্যুরালের চমৎকারিত্বে।

অডিটোরিয়ামের ভেতরের দশটি চিত্রকর্ম সৌন্দর্যের লীলানিকেতন বাংলাদেশেরই যেন চিত্র-প্রতিরূপ।

লালন শাহ হাউসের ডাইনিং হলে ঝোলানো হয়েছে চমৎকার নয়নলোভন ঝাড়বাতি।

উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া; তাই এর সূচনা ও বিকাশ রয়েছে, কিন্তু পরিসমাপ্তি নেই। উন্নয়নের ক্রমধারায় উত্তরোত্তর প্রগতির পথে অগ্রসর হোক আমাদের এ প্রিয় প্রতিষ্ঠান।

সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

কাজী জুলফিকার আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

জীবনের গণ্ডি সীমিত হলেও পৃথিবীতে আহরণের বিষয় অনেক। মানুষের চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধি শক্তির যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে। কেবল পাঠ্যবই শেষ করে পর্যাপ্ত নম্বর পেলেই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ সফল হয়েছে বলা যায়না। একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ সামাজিক মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে তার পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি সহ শিক্ষা কার্যক্রমকেও সমান গুরুত্ব দেয়া উচিত। সময়ের পরিবর্তনে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকের জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা এবং মনোদৈহিক বিকাশে সহশিক্ষা কার্যক্রম যে অপরিহার্য তা আজ প্রমাণিত সত্য। প্রতিযোগীরা নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের উপযোগিতা থেকে নতুন নতুন বিষয় জানতে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, যা তাকে পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সহায়তা করে।

ছাত্রদের সুস্থ-সুন্দর মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বছরব্যাপী সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আন্তঃহাউজ মঞ্চ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের স্বাভাবিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এছাড়া কলেজের বাইরের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্ররা উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দিয়ে অংশগ্রহণ করে আসছে এবং আকর্ষণীয় সফলতাও অর্জন করে চলেছে।

নিচে ১ জুন ২০০১ তারিখ থেকে ৩১ মে ২০০২ তারিখ পর্যন্ত (১ বছরে) কলেজের বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ও সফলতার চিত্র তুলে ধরা হল :

১৪ই জুন ২০০১ তরিখে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ সিরাজুর রহমান ২য় স্থান অধিকার করে।

৫.৬.২০০১ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন মিলনায়তনে ৭ম জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্কের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের প্রতিযোগিতার রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়। এ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বিতার্কিক দলে প্রতিযোগী ছিল ঃ

খালেদ মাহমুদুর রহমান (৯ম-বিজ্ঞান)

মোঃ তরিকুল ইসলাম (১০ম বিজ্ঞান)

মোঃ আরিফুর রহমান (১০ম বিজ্ঞান)

২৮.৬.২০০১ তারিখে একুশে টেলিভিশন আয়োজিত পেপসোডেন্ট ব্রেইন চেক কুইজ প্রতিযোগিতার ১ম রাউন্ডের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়। ৬টি স্কুলের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রতিযোগীরা সর্বোচ্চ স্কোর অর্জন করে এবং নিজস্ব গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে এবং ঢাকার ৮টি স্কুলের মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করে।

প্রতিযোগী :

মোঃ তরিকুল ইসলাম (১০ম -বিজ্ঞান)

তাসনিম ইবনে ফয়েজ (৯ম -বিজ্ঞান)

ফাহমিদ উজ্জামান (৮ম -বিজ্ঞান)

০৫.১২.২০০১ তারিখ থেকে ১০.১২.২০০১ তারিখ পর্যন্ত ভারতের লখনৌ এ অনুষ্ঠিত ' 4th International Convention on Students Quality Control Circle- 2001'এ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৪ জন ছাত্র ও ১জন শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল মোঃ মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করে। এ কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, জাপান সহ ১৭টি দেশের প্রায় ১৫০০ প্রতিযোগী ও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ৭টি বিষয়ের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ দল ৫টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে এবং ভাল ফলাফল করে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দল-

কর্নেল মোঃ মোশাররফ হোসেন	অধ্যক্ষ
মোঃ সুজা -উদ- দৌলা	সহকারী অধ্যাপক
মানজুর আল মতিন	একাদশ বিজ্ঞান
এস. এম. মিনহাজ উদ্দীন	একাদশ বিজ্ঞান
আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ	একাদশ বিজ্ঞান
আহসান হাবিব শাওন	একাদশ ব্যবসায় শিক্ষা

২১.১.২০০২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন মিলনায়তনে প্রীতি স্কুল বিতর্কের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়। এ প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় নির্ধারণের সুযোগ ছিল না, তবে ছাত্ররা সাবলীল বক্তব্য উপস্থাপন করে দর্শক সহ সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

প্রতিযোগী :

খালেদ মাহমুদুর রহমান (১০ম বিজ্ঞান)

অনিন্দ্য রহমান (১০ম বিজ্ঞান)

শাহরিয়ার মোঃ রোজেন (১০ম বিজ্ঞান) দিবা

মহান ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একুশে টেলিভিশন বাছাইকৃত ৯টি স্কুলের মধ্যে শব্দ জব্দ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। দুই রাউন্ডে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ থেকে নির্বাচিত ৯ম শ্রেণীর ছাত্র রাহাত করীম ও তার মা এ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক

মিসেস খালেদা জাহান এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ৩১.১.২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম রাউন্ডে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এর প্রতিযোগী ১ম স্থান অধিকার করে এবং ফাইনাল রাউন্ডে ২য় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করে।

০৮.৩.২০০২ তারিখে ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে, ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়োজিত ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বিতার্কিক দল, প্রতিপক্ষ সেন্ট জোসেফ স্কুল ও কলেজ বিতার্কিক দলকে পরাজিত করে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিতর্কের বিষয় ছিল "In near future paper will become obsolete as CD ROM Internet and Electronic media will take over." ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ দল প্রস্তাবনার পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে।

প্রতিযোগী :

মিহান ইসলাম কথন (১০ম বিজ্ঞান)

আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ (একাদশ বিজ্ঞান)

মানজুর আল মতিন (একাদশ বিজ্ঞান) দলনেতা

১৫.৩.২০০২ ও ১৬.৩.২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত JOSEPHITE FESTIVAL -2002 এর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ -এর প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ কলেজের একাদশ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আরিফ হোসেন নজরুল সংগীত গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে। স্কুল পর্যায়ের ছাত্রদের কুইজ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসি-ডেনসিয়াল মডেল কলেজ দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিযোগী :

তাসনিম ইবনে ফয়েজ (১০ম বিজ্ঞান)

ফাহমিদ উজ্জামান (১০ম বিজ্ঞান)

ইফতেখার -উল করীম (৯ম বিজ্ঞান)

১৬.৩.২০০২ তারিখে হলিক্রস কলেজের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে হলিক্রস বিজ্ঞান ক্লাব আয়োজিত সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ দল অংশগ্রহণ করে এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিযোগী :

এস. এম. মিনহাজ উদ্দীন (একাদশ বিজ্ঞান)

মানজুর আল মতিন (একাদশ বিজ্ঞান)

২০.৩.২০০২ ও ২২.৩.২০০২ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে স্বাধীনতা দিবস ২০০২ উদযাপন উপলক্ষে, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজিত রচনা লিখন, চিত্রাংকন ও উন্মুক্ত বক্তৃতা

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রচনা লিখন প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এর প্রতিযোগীরা ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে এবং উন্মুক্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করে।

ক. বিষয় : রচনা লিখন	স্থান
তাসনিম ইবনে ফয়েজ (১০ম বিজ্ঞান)	২য়
মিহান ইসলাম কথন (১০ম বিজ্ঞান)	৩য়
খ. বিষয় : উন্মুক্ত বক্তৃতা	**স্থান**
আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ (একাদশ বিজ্ঞান)	১ম

২৫.৫.২০০২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন মিলনায়তনে ৮ম জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্কের (১ম রাউন্ডের প্রতিযোগিতার) রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়। এ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এর বিতার্কিক দল তেজগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিযোগী :

ইফতেখার উল করীম (৯ম বিজ্ঞান)

খালেদ মাহমুদুর রহমান (১০ম বিজ্ঞান)

ইরতেজা আহমেদ (১০ম বিজ্ঞান) দলনেতা

বছরব্যাপী (কলেজের বাইরে অনুষ্ঠিত) বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য সফলতা লক্ষণীয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সহযোগিতা এবং প্রতিযোগীদের যথাযথ অনুশীলন ও পরিচর্যা এ বিজয়ের ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করবে। প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরতে, অর্জিত ফলাফল আগামী দিনে প্রতিযোগীদের দিকনির্দেশনা দান করবে এবং আরও ভাল ফলাফলে উৎসাহ যোগাবে বলে আশা করা যায়।

> "শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের মাঝে সুপ্ত ক্ষমতার বা সামর্থ্যের বিকাশ, জ্ঞানের পরিবর্তন ও উন্নয়ন।" —সক্রেটিস

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

মাধ্যমিক পরীক্ষা- ২০০০

শাখা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা			উত্তীর্ণের হার	লেটারের সংখ্যা
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ		
প্রভাতী	১৩১	১৩১	–	–	১০০%	৪৯৭
দিবা	৩৯	৩৯	–	–	১০০%	১৫১
মোটঃ	১৭০	১৭০	–	–	১০০%	৬৪৮

মাধ্যমিক পরীক্ষা- ২০০১

শাখা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা			উত্তীর্ণের হার
		এ +	এ	বি	
প্রভাতী	১২৯	০১	১১৬	১২	১০০%
দিবা	৩৯		৩৯	–	১০০%
মোটঃ	১৭০	০১	১৫৫	২২	১০০%

মাধ্যমিক পরীক্ষা- ২০০২

শাখা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা			উত্তীর্ণের হার
		এ +	এ	বি	
প্রভাতী	১২০	০২	১১০	০৮	১০০%
দিবা	৫৯	০১	৫১	০৬	৯৯%
মোটঃ	১৯৭	০৩	১৬১	১৪	৯৯.৮%

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা- ২০০০

শাখা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা		উত্তীর্ণের হার	লেটারের সংখ্যা
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ		
প্রভাতী	১৩২	১২৪	০৮	১০০%	৯৩
দিবা	১০৫	৮৪	১৫	৯৪%	৪৩
মোটঃ	২৩৭	২০৮	২৩	৯৭%	১৩৬

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা- ২০০১

শাখা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা		উত্তীর্ণের হার	লেটারের সংখ্যা
		১ম বিভাগ	২য় বিভাগ		
প্রভাতী	১২০	৯৬	১৮	৯৫%	৮৯
দিবা	১০০	৭৮	০৬	৮৪%	৭২
মোটঃ	২২০	১৭৪	২৪	৯০%	১৬১

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা- ২০০২

শাখা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	স্টার	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	উত্তীর্ণের হার	লেটারের সংখ্যা	মেধা তালিকায় স্থান
প্রভাতী	১২৫	৫৯	১১৩	১০	০১	৯৯.২%	১৫২	১৪তম (বিজ্ঞান) ১৬তম (মানবিক)
দিবা	১০৫	২৪	৯১	০৯	–	৯৬%	১১৬	–
মোটঃ	২৩০	৮৩	২০৪	১৯	০১	৯৭.৬%	২৬৮	০২

হাউস প্রতিবেদন

কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউস মাস্টার ঃ আব্দুল লতিফ
হাউস টিউটর ঃ মোঃ হায়দার আলী
হাউস এন্ডার ঃ কাজী মুক্তাদির হাসান
হাউস প্রিফেক্ট ঃ শাহ্ মোঃ মুকিতু মাহ্মুদ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ যে পাঁচটি আবাসিক ছাত্রাবাস নিয়ে তার গৌরবোজ্জ্বল যাত্রাকে আজও স্বমহিমায় ভাস্বর রেখেছে—কুদরত- ই- খুদা হাউস তাদের অন্যতম। সূচনাকালে এ হাউসটি "জিন্নাহ্ হাউস" নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হাউসটি দীর্ঘদিন '১ নম্বর হাউস' নামে পরিচিতি পায়। পরবর্তীকালে এ দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডক্টর কুদরত-ই-খুদার নামে হাউসটির নামকরণ করা হয় "কুদরত-ই-খুদা হাউস"।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও মনোরম। ছোট-বড় মোট তেরটি ছাত্রকক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল এ হাউসটিতে মোট ১৯০ জন ছাত্রের আবাসনের সুব্যবস্থা রয়েছে। হাউসের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি বর্গাকৃতির অপরূপ মোহনীয় বাগান। এছাড়া চারদিকে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য বৃক্ষের সবুজ পরিবেশ হাউসটিকে দিয়েছে নৈসর্গিক স্নিগ্ধতা। হাউসের সাথেই রয়েছে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটরের আবাসিক কোয়ার্টার। একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর ছাড়াও হাউস পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন একজন মেট্রন, দু'জন বাবুর্চি, দু'জন ম্যাট, তিনজন ওয়ার্ডবয়, তিনজন টেবিলবয়, একজন দারোয়ান, একজন মালী ও একজন সুইপার।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই এ হাউসের আবাসিক ছাত্র। হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং কর্মচারীদের সহায়তায় হাউসের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ভোরবেলার পিটি থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত হাউসের প্রতিটি কাজই সম্পন্ন হয় নিয়ম-রুটিন মাফিক। ছাত্রদের লেখাপড়া, সংস্কৃতিচর্চা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ব্যাপারে সচেতন ও সযত্ন দৃষ্টি রাখার ফলে এ হাউসের ছাত্ররা লেখাপড়া ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই অব্যাহতভাবে গৌরবময় কৃতিত্বের অধিকারী।

লেখাপড়ায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্ররা ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১ শিক্ষাবর্ষে চ্যাম্পিয়ন (Academic Best) হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও এ হাউসের ছাত্ররা সমান কৃতিত্বের অধিকারী। মহান বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার জন্মশতবর্ষে হাউসের ছাত্রদের নিবেদিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান "জ্যোতিষ্ক" উপস্থাপনার জন্য কলেজের পাঁচটি হাউসের মধ্যে এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০০১ সালের আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়ও এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া ক্রীড়া, সংস্কৃতি, হাউস-পরিচ্ছন্নতা, বাগান প্রদর্শনী ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য কলেজের পাঁচটি হাউসের মধ্যে কুদরত-ই-খুদা হাউস ২০০০ ও ২০০১ শিক্ষাবর্ষে "ALL ROUNDER" হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের উল্লিখিত কৃতিত্ব ও গৌরব অর্জন মূলত এ হাউসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফল। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই ধন্যবাদার্হ। কুদরত-ই-খুদা হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অক্ষুণ্ন থাকুক—এটাই প্রত্যাশা।

জয়নুল আবেদীন হাউস

হাউস মাস্টার	ঃ	খালেদুর রহমান
হাউস টিউটর	ঃ	সাবেরা সুলতানা
হাউস এল্ডার	ঃ	শাহীন রেজা
হাউস প্রিফেক্ট	ঃ	আব্দুল্লাহ আল মামুন

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৩য় থেকে ৭ম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য দুটি হাউসের একটি জয়নুল আবেদীন হাউস। দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের নামে নামকরণ করা হয়েছে এ হাউসের হাউসটি যাত্রা শুরু ১৯৬১ সালের ১মে থেকে। স্বাধীনতার পূর্বে এ হাউসের নাম ছিল আইয়ুব হাউস। স্বাধীনতা উত্তর এর নামকরণ করা হয় জয়নুল আবেদীন হাউস।

সম্প্রতি সমাপ্ত সম্প্রসারণের পর হাউসের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় দু'শত। ছাত্রদের থাকার জন্য রয়েছে বড় বড় আটটি কক্ষ এবং তিনটি ছোট ছোট বিশেষ কক্ষ। প্রতিটি কক্ষের আলাদা আলাদা নামকরণ করা হয়েছে নানা বর্ণের সুগন্ধিযুক্ত ফুল ও প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের নামে। গোলাপ সৌরভ, পলাশ কানন, কৃষ্ণচূড়া মেলা, কাশবন, পদ্ম পরশ, শিমুল সাথী, দ্যুলোক নীল, শৈল বিশাল, ভাস্কর দিগন্ত, সৃজন এবং সারথী। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য হাউসের সাথেই রয়েছে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটরের আবাসস্থল। এছাড়াও একজন মেট্রনসহ এগারজন কর্মচারী রয়েছেন ছাত্রদের খাওয়া ও অন্যান্য কাজে সহায়তার জন্য। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং একই সাথে ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত করার উদ্দেশ্যে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। প্রতিটি পদের জন্য রয়েছে একজন করে প্রিফেক্ট। তারা তাদের সহাযোগিতার হাত সর্বদা-ই বাড়িয়ে রাখে সতীর্থ সহপাঠী ও অনুজপ্রতিম ছোট ছাত্রদের উদ্দেশ্যে।

লেখাপড়ায় জয়নুল আবেদীন হাউসের ছাত্ররা বরাবরই বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে আসছে। ২০০১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় এ হাউসের ৩য় শ্রেণীর ছাত্র মেহেদী হাসান ১ম, আমিনুল ইসলাম ২য়, ৪র্থ শ্রেণীর মাহাদী আল মাসুদ ১ম, ৫ম শেণীর মেহেদী হাসান ১ম, ৭ম শ্রেণীর সৈয়দ আশফাকউদ্দীন ৩য় স্থান অর্জন করে।

শুধু পড়াশোনাই নয়, হাউসের ছাত্ররা আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাকেও সম গুরুত্বের সাথে নিয়ে থাকে। এ হাউসের ৩য় শ্রেণীর ক্ষুদে ছাত্র ইফতেখার বিন কায়সার দাবা খেলায় ৭ম শ্রেণীর ছাত্রকে হারিয়ে উইং বেষ্ট হবার গৌরব অর্জন করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ হাউস প্রতিদ্বন্দ্বী হাউসের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশী পেয়ে এগিয়ে থাকে। পরবর্তীতে দেয়াল পত্রিকার নম্বর যোগ হওয়ায় ১ পয়েন্টের ব্যবধানে এ হাউস রানার আপ হয়।

জয়নুল আবেদীন হাউসের সকল ছাত্র, সকল শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষ সর্বদাই সচেষ্ট হাউসটিকে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

জয়নুল আবেদীন হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

ফজলুল হক হাউজের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণী শিক্ষকবৃন্দ (দিবা শাখা)

৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণী শিক্ষকবৃন্দ (দিবা শাখা)

৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণী শিক্ষকবৃন্দ (দিবা শাখা)

৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণী শিক্ষকবৃন্দ (দিবা শাখা)

দ্বাদশ বিজ্ঞান ও দ্বাদশ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্রদের মাঝে শ্রেণী শিক্ষকবৃন্দ (দিবা শাখা)

পদার্থ বিজ্ঞান গবেষনাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

রসায়ন গবেষনাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

জীববিজ্ঞান গবেষনাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

ভূগোল গবেষনাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

গণিত গবেষনাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

পরিসংখ্যান গবেষনাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

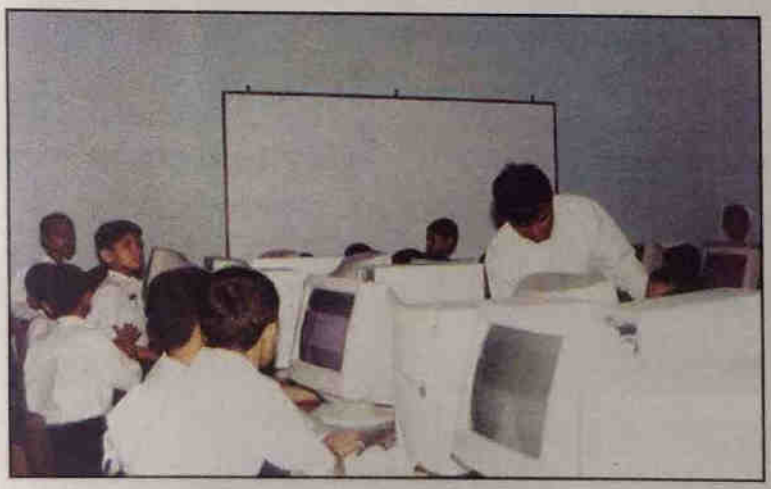

কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণরত জুনিয়র ছাত্রদের একাংশ

কলেজ গ্রন্থাগারে অধ্যয়নরত ছাত্রদের একাংশ

হাউস ডাইনিং হল

কলেজ হাসপাতাল

এস এসসি পরীক্ষা–২০০২ এ বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্রবৃন্দ
এরা সকলে জি.পি.এ–৫ (এ+) প্রাপ্ত

মোঃ তরিকুল ইসলাম
কলেজ নম্বর-৬৩৭০

রিয়াজ মাহমুদ
কলেজ নম্বর-৭৫৩৪

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
কলেজ নম্বর-১৩৭৩ (দিবা)

এইচ এস সি পরীক্ষা–২০০২ এ মেধা তালিকায়
স্থান পাওয়া ছাত্রবৃন্দ

মোঃ সাঈদ ইবনে ফয়েজ
কলেজ নম্বর-৫৭২৭
বিজ্ঞানে-১৪তম

মোঃ বাহাদুর আলম
কলেজ নম্বর-৮১১৯
মানবিকে-১৬তম

ফজলুল হক হাউস

হাউস মাস্টার ঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
হাউস টিউটর ঃ মোঃ মেসবাউল হক
হাউস এণ্ডার ঃ ফয়সাল হক
হাউস প্রিফেক্ট ঃ রাজীব আহসান

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে এ প্রতিষ্ঠানের হাউসগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফজলুল হক হাউস এ হাউসগুলোর অন্যতম। দেশপ্রেমিক, কৃষকদরদী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী ছাত্রদের মাঝে রূপায়িত করবার মহান আদর্শকে সামনে রেখে এ হাউসের নামকরণ করা হয়েছে ফজলুল হক হাউস। তাই এ নামের মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এ হাউসের ছাত্রবৃন্দ কলেজের সকল কর্মকাণ্ডে তাদের পারদর্শিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা এ হাউসে বসবাস করে। ছাত্রদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি, হাউসের কর্মচারীদের আন্তরিক সেবা-যত্ন এ হাউসে গৃহের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ হাউসের ছাত্ররা লেখাপড়ার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। ২০০১ সালের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সে কথা প্রমাণ করে। ২০০১ সালে একাডেমিক্স -এ ফজলুল হক হাউস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। ২০০১ সালে বার্ষিক দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায়ও এ হাউস প্রথম হবার গৌরব অর্জন করে। একই বছর ক্যারাম ও ভলিবল প্রতিযোগিতায়ও চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফজলুল হক হাউস নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। ২০০১ সালে টেলিভিশন বিতর্কে এ হাউসের দশম (বিজ্ঞান) শ্রেণীর ছাত্র কলেজ নং- ৮৩৪১ খালেদ মাহমুদুর রহমান শ্রেষ্ঠ বক্তা হবার গৌরব অর্জন করে।

বছরান্তে একদল নতুন ছাত্র আসছে এবং মেয়াদান্তে একদল বিদায়ও নিচ্ছে। এছাড়া কিছু অনাবাসিক ছাত্রও এ হাউসের সাথে সংযুক্ত আছে। আবাসিক-অনাবাসিক সব ছাত্রই হাউসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমানভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ হাউসের সুনাম ও ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে।

ছোটবড় সব ছাত্র, হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর এবং হাউস সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সবাইকে নিয়েই আমরা একটি পরিবার। স্নেহ ও প্রীতির অদৃশ্য ও অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ আমরা। বাংলার বাঘ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের মহান ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবীন প্রাণের উচ্ছলাবেগে সকল বাধা-বিপত্তিকে ভাসিয়ে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে'—এটাই আমাদের সকলের হৃদয়ের ঐকান্তিক কামনা।

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাস্টার ঃ ইরশাদ আহমেদ শাহীন
হাউস টিউটর ঃ শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
হউস এল্ডার ঃ এস,এম,মিনহাজ-উদ-দীন
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মঞ্জুরুল কবীর

১৯৬০সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচটি হাউস আছে। আর এই পাঁচটি হাউসের অন্যতম হাউস 'নজরুল ইসলাম হাউস'। জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের সকল ছাত্র তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাঁর গুণাবলী নিজেদের মধ্যে বিকশিত করার স্বপ্ন দেখে।

নজরুল ইসলাম হাউসের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আছেন একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর, একজন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালী ও বাবুর্চিসহ অন্যান্য কর্মচারী। ছাত্ররা চমৎকার পরিবেশে বিকশিত হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলা এবং সৌহার্দ্যের এক অনুপম সমন্বয় এ হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে মানবিক গুণাবলীর সামান্যতম ক্ষতি না করেও নিখুঁত, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম হাউসের প্রতিটি ছাত্র সর্বদা উৎকর্ষ অর্জন করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০২ সালে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্ররা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ক্রীড়াক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০০২ এ নজরুল ইসলাম হাউস অন্য সকল হাউসকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি লাভ করেছে। এসবই সম্ভব হয়েছে হাউসের প্রতি ছাত্রদের নিষ্ঠা ও গভীর ভালবাসার কারণে। এ হাউসের দেয়াল পত্রিকার নান্দনিক মান ও বিষয়বস্তু সমূহের গভীরতা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রতিযোগিতায় হাউস এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্ররা কলেজে প্রতিটি কর্মকান্ডে কঠোর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়ে থাকে। কখনও তারা অন্যের বন্ধু, অন্যের সহযোগী, অন্যের প্রতিযোগী। নজরুল ইসলামের আদর্শে তারা অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত। আকাশী নীল রঙের হাউস পতাকার নীচে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করে-

" মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল ।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল ॥"

লালন শাহ হাউস

হাউস মাস্টার	ঃ	মোঃ নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া
হাউস টিউটর	ঃ	মোঃ লোকমান হোসেন
হাউস এপ্তার	ঃ	আশিক এহসান
হাউস প্রিফেক্ট	ঃ	নিজামুদ্দিন শরীফ

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কলেজের ছাত্রাবাসের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। এই ছাত্রাবাসকে বলা হয় হাউস, ছাত্রদের কাছে তাদের আপন বাসগৃহের মত প্রিয়। এখানে অবস্থান কালে তারা এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে আগামী দিনের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযোগী পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠার শিক্ষা লাভ করে থাকে।

এ হাউসগুলোর মধ্যে নূতন সংযোজন লালন শাহ হাউস। ১৯৭৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ হাউসের উদ্বোধন করেন। সে সময় এ হাউস ৩ নং হাউস হিসাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে প্রয়াত অধ্যক্ষ লুৎফুল হায়দার চৌধুরী বিখ্যাত বাউল সম্রাট লালন শাহের নাম অনুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন "লালন শাহ হাউস"।

এ মহান কবির উদার ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবাদী মনোভাব ও অকুণ্ঠ মানবপ্রীতি এ হাউসের প্রতিটি ছাত্রকে করেছে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত। তাই পারিবারিক পরিবেশে আশ্রিত এ হাউসের প্রতিটি ছাত্র এক নিবিড় ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। জন্মলগ্ন থেকেই লালন শাহ হাউস তার স্বকীয়তা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে পূর্বের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে এগিয়ে চলেছে। লালন শাহ হাউস উজ্জ্বল বলিষ্ঠ সম্ভাবনাময় নাম। তাই লালন শাহ হাউস বলতে ছাত্রদের বুক ফুলে উঠে এক গভীর আবেগে।

বর্তমানে এ হাউসে নয়টি বিশেষ কক্ষসহ মোট ২৯টি কক্ষে সর্বমোট ১০২ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়াও বেশকিছু অনাবাসিক ছাত্র এ হাউসের সাথে যুক্ত আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনোরম পরিবেশে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা প্রতিটি মুহূর্তে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সাধনা নিয়ে, লেখাপড়া, প্রাতঃ কালীন শরীর চর্চা, বৈকালিক খেলাধুলা, নামায, নৈশকালীন পাঠ প্রস্তুতি প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করছে। এসব কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেই সকাল থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। কর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা এ হাউসের ছাত্রদের চরিত্রে আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

জন্মলগ্ন থেকেই এ হাউসের ছাত্ররা কলেজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নেতৃত্বদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ এ দুই বছর পরপর এ হাউসের ছাত্র মোঃ ওয়াজেদ সালাম কলেজ ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়ে অভিভাবক দিবসে বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সাথে কুচকাওয়াজ পরিচালনা করে এক সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারই ধারাবাহিকতা স্বরূপ রফিকুল ইসলাম, আরাফাত আলম, ইমরান আল সাবাহ কলেজ ক্যাপ্টেন ও কুদরত-ই-খুদা কলেজ প্রিফেক্ট হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে।

শুরু থেকেই এ হাউসের ছাত্ররা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে আসছে। ১৯৭৭ সালে মোঃ কামরুল ইসলাম এস, এস, সি পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৭৯ সালে মোঃ গোলাম সামদানী এইচ, এস, সি পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে ঢাকা বোর্ডে প্রথম এবং কামরুল ইসলাম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৮০ সালে মোঃ সুলতান আহমেদ এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম ও প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা ৫ম স্থান অধিকার করে দেশব্যাপী কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করে। ১৯৯৪ সালে পলাশ বসাক এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ২য় স্থান দখল করে। তারা সকলেই লালন শাহ হাউসের ছাত্র ছিল। ২০০০ সাল ও ২০০১ সালে এ হাউসের ছাত্ররা একাডেমিক্স এ চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করে। ২০০১ সালে এ হাউসের ছাত্র মোঃ কুদরত-ই-খুদা এবং সাঈদ ইবনে ফয়েজ শিক্ষা সফরে সিঙ্গাপুর যায়।

শুধু লেখাপড়া নয়, খেলাধুলাতেও এ হাউস পিছিয়ে নেই। ২০০০ সালে বাস্কেট বলে এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০০১ সালে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করে এবং বাস্কেটবল ও ভলিবলে রানার্স আপ হয়। ২০০১ সালে এ হাউসের ছাত্র নিজাম উদ্দিন শরীফ টেবিল টেনিসে Wing best হবার গৌরব অর্জন করে।

ছাত্রদের মননশীলতা বিকাশের জন্য হাউস থেকে প্রতি বছরই বার্ষিক দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। ১৯৯৯ সালে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশে লালন শাহ হাউস চ্যাম্পিয়ান ও ২০০১ ও ২০০২ সালে পরপর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

২০০১ সালে লালন শাহ হাউস ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ হাউসের ছাত্র আরাফাত উল্লাহ সবচেয়ে কম সময়ে ০৫ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ বিবেচিত হয়।

মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ হাউসের ছাত্ররা নিয়মিত নামাজ আদায়, আযান, ক্বিরাত, মিলাদ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আযান ও ক্বিরাত প্রতিযোগিতায় ২০০০ ও ২০০১ সালে পর পর দুবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বার্ষিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ২০০০ সালে লালন শাহ হাউস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। ২০০১ সালেও অনেক নম্বরের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয়।

চলার পথে নানা সমস্যা বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে, তবেই সাফল্য আসবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে এ হাউসের ছাত্ররা ফজরের নামাজ থেকে শুরু করে নৈশকালীন পাঠ প্রস্তুতি ও প্রদীপ নেভা পর্যন্ত হাউস পরিচালনার বিভিন্ন কাজে হাউস মাস্টার হাউস টিউটর ও স্টুয়ার্ডকে সাহায্য করছে।

সর্বোপরি কলেজ কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিক সহযোগিতা, সুবিবেচনা ও তাৎক্ষণিক কর্মতৎপরতার জন্য হাউসের অনেক সমস্যাই কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। ফলে হাউসের সুনাম ও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছড়া ও কবিতা

সূর্য মামা

সাকিব বিন আনোয়ার
কলেজ রোল : ৮৬৩০
শ্রেণী : তৃতীয়-খ

সূর্য মামা সূর্য মামা
ওঠো রোজ সকালে,
সারা দিন আলো দিয়ে
শুয়ে পড় বিকেলে।
সূর্য বলে ভাগনে আমার
বাতের ব্যথা তাই,
সন্ধ্যাবেলা না ঘুমালে
রক্ষা আমার নাই।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোঃ ফারদীন রহমান
কলেজ নম্বর : ৮৬৩৯
শ্রেণী : তৃতীয়-খ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
এইখানেতে পড়ি,
ভবিষ্যতের জীবনটাকে
এইখানেতে গড়ি।
মোদের ক্লাসের গণিত ম্যাডাম
পড়ান গণিত ভাল,
সমাজ টিচার দেখান মোদের
জীবনের আলো।
পড়ান তিনি মায়ের মত,
সমাজ, কারুকলা
ধন্য হোক, ধন্য হোক
মোদের এই পাঠশালা।

ক্রিকেট প্লেয়াররা

জুনায়েদ কিবরীয়া
কলেজ নম্বর : ৮২৩৪
শ্রেণী : চতুর্থ

শচীন খালি ছয় মারে
গাঙ্গুলি মারে চার,
সোয়েবের বলে আউট সবাই
জুড়ি নাই তার।
শেন ওয়ার্নের বল হলো স্পিন
ম্যাকগ্রার বল বাউন্স,
ওয়াসিম খালি পেস করে
ক্যালিসের বল সুইং।
সব প্লেয়ারের মার বুঝি না
বুঝি না তাদের বল
তবুও ক্রিকেট পছন্দ করি
বাংলদেশ আমার প্রিয় দল।

সবুজ বাংলাদেশ

ইব্রাহীম মারুফ
কলেজ নম্বর : ৮২১৭
শ্রেণী : চতুর্থ-খ

চার পাশের এই পরিবেশ
শ্যামল সবুজের সমাবেশ।
কোথায় এমন সবুজ দেশ?
মোদের প্রিয় বাংলাদেশ।
বাংলায় সবুজ সমাবেশ
হাজার যুগে অপরিশেষ।
সবুজ মাঠের সবুজ ঘাস
সময় সময় নানা বেশ।
সবুজ মাঠের ধানের শীষে
নানা কৃষক নানা বেশে।
সবুজ এই জন্মভূমি
মাতৃভূমি বাংলাদেশ।
ধানের শীষে, সবুজ ঘাসে
মোদের সবুজ বাংলাদেশ।

গরু সমাচার

মোঃ মাহমুদুল হাসান
কলেজ নম্বর : ৭৯৪০
শ্রেণী : পঞ্চম-খ

গরুকে বলো না 'গরু'
গরু বড় ধন,
গরুকে নিয়েই দেখি
যত আয়োজন।
আমাদের আছে কত
ভাল ভাল নাম
বড় কম মানুষের
জীবনের দাম।
কালো টাকা ভাল খুব
হাত খোলা থাকে,
ব্যাপারি গরুর মূল্য
লাখ টাকা হাঁকে।
কোরবানি হাটে গিয়ে
মানুষ পাগল
এরাদা কি আনার
গরু না ছাগল?
গরুকে বললে 'গরু'
মনে ব্যথা পাবে,
একূল ওকূল তুমি
দুকূল হারাবে।

জেলের ঘানি টানা

এ, আর মোঃ ফয়সাল
কলেজ নম্বর : ৭৯৮৩
শ্রেণী : পঞ্চম-খ

বাইরে থাকার চেষ্টা সবই
হইল বুঝি ফেল,
আসল কথা আব্দুল চাচার
ফুরিয়ে গেছে তেল!
তবু তারে নিয়েই যতো
চলছে টানাটানি,
তাইতো চাচার প্রস্তুতি শেষ
টানবে জেলের ঘানি।
ঘানির টানে তেল বেরুবে
তেলের আড়ত জেলে,
সুবিধা বুঝে তেল মর্দন
করবে নতুন তেলে।

শিয়াল রাজা

আবু হাসনাত মোঃ তানজীল
কলেজ নম্বর : ৮০৬৭
শ্রেণী : পঞ্চম-ক

বিড়াল বলে শিয়াল মামা
তুমিই বনের রাজা,
সিংহ এলে বুঝিয়ে দেব
ঘুম ভাঙ্গানোর সাজা।
হাতি ঘোড়া দলে দলে
ভেসে যাবে সাগর জলে,
বাঘের গলায় দড়ি দিয়ে
করব ইলিশ ভাজা।

ছাত্রজীবনই দামী

মুশফিক সরকার
কলেজ নম্বর : ৭৯৫৫
শ্রেণী : পঞ্চম-ক

আধুনিক এই বাংলাদেশে
যাঁরা হয়েছেন নামী,
সবাই বলেন একই কথা
ছাত্রজীবনই দামী।
ছাত্রজীবনে যে হয় ভাল
সেই হয় জগতের আলো।
যে করে ছাত্রজীবনকে
অহেতুক অবহেলা,
সে কখনো হবে না রে ভাই
জ্ঞানেরই পথগামী
তাইতো নামীগণ বলেন
ছাত্রজীবনই দামী।

উল্টো পেটুক

মোঃ আসিকুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৭৯৫৬
শ্রেণী : ষষ্ঠ-ক

এক যে ছিল উল্টো পেটুক
মন্টু মিঞা তারে কই,
ভাত খায় না, লুচি খায় না
খায় যে শুধু দই।
আঙ্গুর খায় না আপেল খায় না
মাঝে মধ্যে কই,
চমচম আর গোল্লা খাওয়ায়
আমরা অবাক হই।

ভেরি টাফ

মোঃ ফজলে রাব্বী
কলেজ নম্বর : ৭৬৬২
শ্রেণী : ষষ্ঠ-ক

আপা বলেন, ভাবীর দোষ
ভাবী বলেন, আপার
আমরা জানি দোষটা হল
দুই মহিলার চাপার।
ভাবী ভীষণ একগুঁয়ে
আপার মেজাজ ত্যাড়া
মধ্যে পড়ে আম জনতার
জীবন ছ্যাড়াব্যাড়া।
দুজন থাকে দুই মেরুতে
মুখটা দেখাও পাপ,
দুই মহিলার এক মোহনায়
মিলন ভেরি টাফ।

মাতৃভূমি বাংলাদেশ

মোঃ ইশতিয়াক হোসেন
রোল নম্বর : ৭৭১৩
শ্রেণী : ষষ্ঠ-ক

বাংলা আমার মাতৃভূমি
বাংলা আমার মা,
সকল দেশের সেরা এদেশ
তাকে ভুলো না।
বাংলা আমার মাতৃভাষা
মেটায় মনের আশা,
এই ভাষাতেই কথা বলে
গরীব, ধনী, চাষা।
এই আমার বাংলাদেশ
মধুর মাতৃভাষা।

ভেলকি

শামস্ তাবরীন
কলেজ নম্বর : ৭৭৮৯
শ্রেণী : ষষ্ঠ-খ

এই এল এই গেল
বিজলির ভেলকি,
মোমবাতি আছে আন
আনা আছে তেল কি?
বিজলির ভেলকিতে
জুয়েল আইচ ফেল কি?

বেশ বেশ বেশ

এস এম আতিকুর রহমান
কলেজ নম্বর :১২৩৪
ষষ্ঠ শ্রেণী, দিবা

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ,
আহা বেশ বেশ বেশ।
৭১ এর মুক্তির পর
নামল খুশির রেশ,
আহা বেশ বেশ বেশ।
চারদিকে সবুজ শ্যামল
যেন মেঘলা কালো কেশ
আহা বেশ বেশ বেশ।
আই .সি.সি জয় করে
বিশ্বকাপে নাম করল পেশ,
আহা বেশ বেশ বেশ
সম্মতিতে জিতে পেল

টেস্ট স্ট্যাটাস টেস্ট!
আহা বেশ বেশ বেশ।
টেস্ট যে ভাই হেরেও মোদের
নেই কো দুখের লেশ
আহা বেশ বেশ বেশ।
এত 'এশের' গল্প শেষ,
আহা বেশ বেশ বেশ।

গ্রামগুলোকে দেখে দেখে

আশফাক উদ্দিন
কলেজ নম্বর : ৭২২৩
শ্রেণী : অষ্টম

তোমরা করো ঘৃণা,
গ্রামগুলোকে দেখে দেখে মানুষকে যায় চেনা।
যশোহরের সাগরদাঁড়ি
বল তো কার দেশের বাড়ি,
আজও সেটি গ্রামই আছে;
দেখো, চেনো কিনা?

তোমরা করো ঘৃণা,
গ্রামগুলোকে দেখে দেখে মানুষকে যায় চেনা,
কলিকাতার জোড়াসাঁকো
তোমরা কি তার কাছেই থাকো?
একটু বসে গাছের ছায়ায়,
মনটি যেন হারিয়ে না যায়
আম্রমুকুল ভরা ভুঁয়ে
রবিরশ্মি পড়ে শুয়ে
দেখো, চেনো কিনা?

তোমরা করো ঘৃণা,
গ্রামগুলোকে দেখে দেখে মানুষকে যায় চেনা।
চুরুলিয়ার বুলবুলিটি
গাইতো যে গান, লিখতো চিঠি!
যাবে তোমরা সে গাঁয়েতে?
খেজুর রস আর পিঠে খেতে?
লেটোর দলের শুনতে পালা
বিষের বাঁশির সুর বেহালা
যে শোনাতো- মহাদ্রোহী
বাজিয়ে অগ্নিবীণা।
তোমরা করো ঘৃণা,
গ্রামগুলোকে দেখে দেখে মানুষকে যায় চেনা।
পল্লীমায়ের আঁচল তলে,
হাসি গান আর অশ্রুজলে,
বইছে জীবন, বইছে কথা
চিরন্তনের সেই বারতা
নকশীকাঁথায় গাঁয়ের ছবি
কে এঁকেছেন' পল্লীকবি?
গুবাক-তরুর খোল পাতাতে
কলমি ফুল আর পুঁই মাচাতে
চোখদুটো তার থাকতো লেগে
পলক-পড়া বীণা।

এমনিতরো হাজার গাঁয়ের
হাজার দেশের দল
ফুটিয়ে তোলেন প্রাণপ্রবাহের
লক্ষ শতদল।

বাংলা ভাষা

রকিবুজ্জামান মোঃ আল মাসুদ
কলেজ নম্বর : ৭৮৩২
শ্রেণী : সপ্তম-খ

বাংলা আমার, বাংলা তোমার
বাংলা সবার ইচ্ছা,
এই ভাষাতে দাদা-দাদী
শোনান নানা কেচ্ছা।
বাংলা ভাষায় কথা বলে
হলাম আমরা ধন্য,
অনেক বীর প্রাণ দিয়েছে

এই ভাষারই জন্য।
এই ভাষাতে বলব কথা
বাংলা মোর অধিকার,
এই ভাষাতেই বলব কথা
বাধা দেয়ার সাধ্য কার?
এই ভাষাতে খোকা-খুকী
পড়ালেখা করে,
এই ভাষাতেই কথা বলে
সর্বশেষে মরে।

আমাদের গ্রাম

তানভীর মাহমুদ
কলেজ নম্বার : ৭৪৪১
শ্রেণী : সপ্তম-খ

আমাদের গ্রামখানা
সবুজ শ্যামল,
বিলে ঝিলে দুলিতেছে
শাপলা কমল।

আমাদের গ্রামে আছে
চড়ুই দোয়েল
আর আছে ছোট পাখি
ছোট ছোট কোয়েল।

একুশ তুমি

আলভী শওকত
কলেজ নম্বর : ৭৫১৪
শ্রেণী : সপ্তম-ক

একুশ তুমি আমার গর্ব
একুশ তুমি প্রাণ,
একুশ তুমি সারা দুনিয়ায়
হয়ে আছো মহান।
একুশ তুমি লাখো মানুষের
একুশ তুমি আশা,
একুশ তুমি রক্তে রাঙানো
আমার বাংলা ভাষা।
একুশ তুমি ভাইয়ের রক্ত
একুশ তুমি আশা
একুশ তুমি শত কষ্টের
আমার মাতৃভাষা।

নতুন সাজে

ইভান বিন মোস্তফা
কলেজ নম্বর : ১০০২, (দিবা শাখা)
শ্রেণী : সপ্তম-খ

পলিথিন সব বন্ধ হল
কালু মিয়ার জ্বালা,
হোটেল থেকে ডাল আনতে
পাঠাতে হয় থালা।

কাঁচা বাজার করতে গিয়ে
কালু মিয়া বলে,
কি করে যে বাজার নেব
দাও না একটা থলে।

দোকানিরও মেজাজ গরম
লাফিয়ে ওঠে সে,
বিনা পয়সায় থলে পাওয়া
কার ভাগ্যে জোটে?

অবশেষে কালু মিয়া
তাকায় পথের মাঝে,
পলিথিন নেই পরিবেশ আজ
দেখায় নতুন সাজে।

আঁতেল

মোঃ তারেকুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১০১৯ (দিবা)
শ্রেণী : সপ্তম

আঁতেল আব্দুল
মাথা তেলে তুল তুল।
কোদালে চাঁছিলে মাথা
তেল পড়ে পোয়া পোয়া।
সেই তেলে ভাজিলে পিঠা
আঁতেল বলে বড়ই মিঠা।

মশার ডাক

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৭২১৮
শ্রেণী : অষ্টম-ক

মশা বলে আয়রে
মশারির বাইরে,
সোনামনি খোকা তোরে
দুটো চুমু খাইরে।
কী দারুণ গালরে
করে দেব লালরে,
আয় সোনা খোকা বাবু
পড়ি তোর পায়রে।
মশারিটা সরিয়ে
আয় খোকা গড়িয়ে,
আয় সোনা খোকা বাবু
আমি তোর ভাইরে।

বাংলাদেশ

বেনজামান
কলেজ নম্বর : ৮২৬
শ্রেণী : অষ্টম (দিবা)

মাঠ ফসলে ভরা সে দেশ
নদী দিয়ে ঘেরা,
গাছগাছালির স্নিগ্ধ ছায়ায়
আমার এ দেশ ভরা।
পাখির কুহু-কলগানে
আমার এ দেশ জাগে গানে,
বাতাসে ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণে
প্রাণ আসে এই দেহ মনে।
রক্ত দিয়ে গড়া সে দেশ
স্মৃতি দিয়ে ভরা,
মায়ের মত জড়িয়ে সে দেশ
মায়ের আশায় ঘেরা।
মায়ের মত আমরা
তাদের ভালবাসি
দেশের জন্য জীবন দিয়ে
যারা এনেছে দেশের হাসি।

পড়াশোনা

আলী এহ্সান সিফাত
কলেজ নম্বর : ৮৪৫
শ্রেণী : অষ্টম (দিবা)

পড়াশোনা বড্ড কঠিন
কি বলব ভাই?
হোমওয়ার্ক করতে গিয়ে
কষ্ট বড় পাই।
ভূগোলটা বুঝতে গিয়ে
লাগে গণ্ডগোল,
জ্যামিতির মারপ্যাঁচে
খাই শুধু ঘোল।
ইতিহাসে কেন শুধু
লাগে হাঁসফাঁস?
গণিতটা ধরতে গিয়ে
হয় প্রাণনাশ।
আব্বা-আম্মা চান শুধু
আরো বেশি পড়া,
আমার কেবল একটাই শখ
খেলাধুলা করা।

মায়ের অনুভব

মোঃ রিয়াদ আরেফিন
কলেজ নম্বর : ৮১৯
শ্রেণী : অষ্টম (দিবা)

মায়ের অনুভবটা হয় না মনে
আছে যখন মা কাছে।
মায়ের গুরুত্ব বুঝতে পারি
মা যখন যায় দূরে।
মায়ের হাতের আলতো পরশ
না পেলে নিশায় হয় না নিদ্রা
মনে হয় মা না থাকলে
জীবনটাই বৃথা।

মাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখলে
জড়িয়ে ধরি মাকে।
হয় যদি কোন ভুল তবে
পা ধরে মাফ চেয়ে নিই আগে।

তবে কেন নজরুল

মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল মুজাহিদ
কলেজ নম্বর : ৮৩৭
শ্রেণী : অষ্টম (দিবা)

ভোর হলে দোর খোলে
খুকুমনি জাগে না,
ঘুম থেকে ওঠে সে
দশটার আগে না।
ঝিঙে ফুল, লিচু চোর
এই সব পড়ে না।
ইংলিশ মিডিয়ামে
নজরুল ধরে না।
নজরুল উৎসব
শুধু হয় পালিত,
শিশুদের মন এখন
ডিশ দিয়ে লালিত।
নজরুল গান গেয়ে
ইংরেজ ভাগালো,
শোষিতের বুক জুড়ে
বিদ্রোহ জাগালো।
এ যুগের শিশুরাতো
এই সব জানে না।
স্বদেশের কালচার
ওদেরকে টানে না।
ইংরেজি সংস্কৃতি
দেশে থাবা বাড়ালো,
তবে কেন নজরুল
ইংরেজ তাড়ালো?

তৈলের গুণ

মোঃ খয়েরুল আলম
কলেজ নম্বর : ৮৫৫৮
শ্রেণী : নবম

তৈলের গুণে চাকা ঘুরে
তৈলে মাথা ঠাণ্ডা,
তৈলের গুণে রান্না ভাল
ভাজা হয় আণ্ডা।
দিলে তৈল যথারীতি
গাড়ি চলে ঠিক ঠিকই,
তৈলে পারে সবকিছু
পারে না যা ডাণ্ডা।
গায়ে চুলে দিলে তৈল
হয় বেশি ফিটফাট,
টাকায় যা না হয়
তৈলে সব মিটমাট।

স্বাধীনতার মুখ

মোঃ আরিফুল হক
কলেজ নম্বর : ৬৯৫০
শ্রেণী : নবম

একটি প্রভাতের একটি সূচনা
জন্ম দিতে পারে শত কল্পনা
সে কল্পনা হতে পারে
একটি ভালোলাগাকে ঘিরে
ভালোলাগা কোন ভূখণ্ডকে ঘিরে
সে মাটির আশ্রিত নীড়ে।
নয় কোন স্বপ্ন বিভোরে
শুধু একটি গানের সুরে
নেচে উঠেছিল এমন।
সে মনে ছিল না কোন ভয়
ছিল প্রত্যাশা, ছিল প্রত্যয়;
সেই প্রত্যয়ে বেঁধেছিনু
সাহসী সাত কোটি বুক,

সাহসের ঝুলি খালি করে
তিরিশ লক্ষ শহীদের ভীড়ে
সেদিন দেখেছিনু
স্বাধীনতার সে মুখ।

শিয়াল মশাই

শাইখ আল নোমান
কলেজ নম্বর : ৮৬৪৫
শ্রেণী : নবম-গ

শিয়াল মশাই চলছে দেখ
রাজার মত চালে,
এদিক তাকায় ওদিক তাকায়
শিকার যদি মেলে।
সারাটা দিন খায়নি কিছু
ভীষণ খিদে পেটে,
ঠোঁট দু'খানা ভেজায় কেবল
জিভটা দিয়ে চেটে।
হঠাৎ দেখে পথের ধারে
কালো কুকুর শুয়ে,
ভাবল বুঝি ছাগল পেল
ধরতে গেল নুয়ে।
হঠাৎ কুকুর উঠে দাঁড়ায়
মাছির জ্বালাতনে,
শিয়াল মশাই বিপদ বুঝে
ছুটে পালায় বনে।

ঢাকা

জুন্নুন শিকদার
কলেজ নম্বর : ৮২৩৩
শ্রেণী : দশম-খ

বাংলাদেশের রাজধানীর নামটি নাকি ঢাকা,
প্রতিদিন সেখানে হচ্ছে চুরি লক্ষ কোটি টাকা।
যতই যাচ্ছে দিন ঢাকারই যতই যাচ্ছে মাস,
চোর-ডাকাতেরা পাচ্ছে ততই বেকসুর খালাস।
রাস্তা তোমারি হয় যদিও প্রতিদিনই কাটা
দশ বছরেও হয়না তবু রাস্তাগুলো ঢাকা।
কত গাড়ি কত ঘোড়া চলে ঢাকার রাস্তায়,
বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির অভাবে সব মানুষই পস্তায়।
কত স্কুল কত কলেজই আছে নাকি ঢাকায়,
কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলো ভরছে টাকায় টাকায়।
টাকার জন্য এখানে মানুষ কত কি না করে,
ছিনতাইকারী ছিনতাই করে গণপিটুনিতে মরে।
শহর শহর আজব শহর সবাই বলে ঢাকা,
ডাস্টবিনের বাইরে ময়লা বেশি, ডাস্টবিন তো ফাঁকা।
ঢাকা শহরের কসাইখানার কসাইগুলো পাগল,
মহিষকে তারা বলে গরু, ভেড়াকে বলে ছাগল।
আরিচা ঘাটের হোটেলগুলোর রাঁধুনী জানে যাদু,
রাঁধছে কুকুর বলছে ছাগল, পাচ্ছে টাকা তবু।
শহর ঢাকায় প্রতিদিনই হচ্ছে কত বাড়ি,
তের বছরের ছেলে বলে, দাও মোবাইল, দাও গাড়ি।
এত সমস্যায় জর্জরিত ঢাকার সমাধান যদি চাও–
সকল মানুষ হাতে হাত রেখে ভাল কাজ করে যাও।

পর্বত তুমি

শাহ আলী রিয়াদ
কলেজ নম্বর : ৮২৪২
শ্রেণী : দশম

উচ্চ রহিও নবযুগ এলে বরণ করিও
তোমার সামনে গিয়াছে চলিয়া
দিন কাল মাস বছর ঘুরিয়া
এক যুগ তাকে বধ করিছে
নতুন যুগ আসিয়া।
নবযুগ কত বহিয়া গিয়াছে
কত বজ্র আঘাত হানিছে
কত বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িছে
তোমার চরণতলে।
নীলাকাশের হাতছানিতে
তুমি এগিয়ে শুধু চলছো
তুমি চলছো, তুমি চলছো
তোমার নেইকো কোন বিরতি

তবু যেন তুমি স্থির অতি
তব স্থিরতা, তব গতি
তোমার নেইকো কোন বিরতি।

তুমি তো কবির কল্পনা
তুমি চিত্রকরের আল্পনা
তুমি মহান ত্যাগের মহত্ত্ব
তুমি মহাবীরের বীরত্ব
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ীর অমরত্ব।
জানিনা তোমার ঠিকানা
কোথায় তোমার জন্ম
তবু ছিলে তুমি বহুকাল আগে
বাঁচিবে যে তুমি বহুকাল পরে
দেখিবে, শুনিবে, জানিবে
এই তো তোমার কর্ম
তুমি চির ভাস্বর
চির মৃন্ময়
চির গতিময়
তবু স্থিতিময়
সবুজে তোমার জন্ম
আজি ঠিকানা নীলাকাশে
হে মেঘের বন্ধু
আমি থাকবো তোমার পাশে
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে
সন্ধ্যারাতে সূর্য ডোবে
লালচে আভা নিয়ে
তোমারে রাঙায়
তোমারে সাজায়
থাকে তোমার পাশে
তুমি সূর্য রঙিন
চিত্রহরিণ
হরণ করেছো মোরে
গাঙ চিলেরও বন্ধু তুমি
বাতাস তোমার সাথী
ওগো শ্যামলের তরুবীথি
তুমি সুন্দর অতি।
পর্বত তুমি, বাঁধিও আমারে
তোমার সাথে,
তোমারি করে।

একটা ভয়

রাজীব দে সরকার
কলেজ নম্বর : ৫০৯ (দিবা)
শ্রেণী : দশম

অন্ত নীল আকাশের বুকে
দুটো ডানা-
শব্দবেগে তাল মেলাচ্ছে,
সাঁই-সাঁই, সাঁই-সাঁই,
বিচিত্র এক শব্দ করে ফেরে ঐ মুক্তো ডানা ঝাপটানো।

তবু মনে হয় তার গহীনে
কি যেন একটা আছে,
বিষণ্নতা বলব, নাকি পরাজয়
নাকি এক মহাভয়।
একটা ভয়, যেন তাড়া করে ফেরে ,
ঐ অবলা ডানা দুটোকে,
তাই ওরা ঝাপটায় আর পালিয়ে বেড়ায়
দিক থেকে দিগন্তে
সীমা থেকে অসীমের আবছায়ায়।
কিন্তু কেন এই ত্বরা করে চলা,
একি সত্যি নয় -
নাকি এক মহাভয়।
ওরা ছুটছে তো ছুটছেই- সাঁই -সাঁই করে,
থামবার পায়নি বিন্দুমাত্র অবকাশ,
হয়তো এই তাদের জীবনের প্রকাশ।
তবুও সন্দেহ প্রশ্ন করে,
আমি কি ভয়কে ভয় পাই-
এ কি বাস্তবতা নয়,
নাকি বাস্তব মূর্তির মহাভয়।
কালো রঙের ঐ ভয়টা
সব সময়ই তাড়া করে ফেরে
আমাদেরও।
তাই হয়তো বা জীবনের আশায়,
আমরা সবাই পালিয়ে বেড়াচ্ছি
এ দুটো ডানার মত
ছুটে চলেছি জীবন আর সময়ের দোহাই দিয়ে,
এই অনাদি অনন্তের কোন কি শেষ হয়?
নাকি চলবার পথেই লুকিয়ে রেখেছে
এই কালবৈশাখী ভয়,
এক মহাভয়॥

ফাঁকি

শোয়েব মোঃ ফয়সাল ভূইয়া
কলেজ নম্বর : ১৯৪৯ (দিবা)
শ্রেণী : দ্বাদশ

আমি যখন পড়তে বসি
লিখতে মনে কয়
লিখতে যখন বসি লেখা
বড্ড খারাপ হয়।
চুপটি করে বসে থাকি
সকল কাজই বাকী
সকাল বেলা শিখব বলে
রাত্রিরে দেই ফাঁকি।
এমন করে সময় আমার
অবহেলায় যায়,
পরীক্ষাটা সামনে এলেই
চিন্তা এসে যায়।

যদি

মোঃ রায়হান
কলেজ নম্বর : ১২০৭
শ্রেণী : ষষ্ঠ-খ

ল্যাং মেরে ঠ্যাং যদি
কেউ ভেঙে দাও
কোনখানে হেঁটে যেতে
লাঠি হবে পাও।
ঘুষি খেয়ে দাঁতগুলো
পড়ে যদি যায়
মাংস দিয়ে ভাত খেতে
হবে কি উপায়?
চুলগুলো ছিঁড়ে নিলে
হয়ে যায় টাক
মাথাটারে টয়লেট
বানাবে যে কাক।
চোখ দুটো তুলে নিলে
দুনিয়াটা অন্ধ
ঘরে বসে আমি একা
বাইরে যাওয়া বন্ধ।

শিয়াল

মোহাম্মদ আল হেলাল
কলেজ নম্বর : ৮৪৩৫
শ্রেণী : দ্বাদশ, মানবিক

শিয়াল এসে ঢাকায়,
জোরছে গাড়ি হাঁকায়।
যেই না গেল গুলিস্তানে,
ট্রাফিক পুলিশ ধরলো কানে।
ভাঙ্গলে কেন ট্রাফিক আইন,
পাঁচশ টাকা দাওতো ফাইন।
শিয়াল বলে ট্রাফিক ভাই,
আমার কাছে পয়সা নাই।
আছে মোট একশ টাকা,
দিলেই হবে পকেট ফাঁকা।
ছাড়া পেয়ে চললো আবার,
ধরলো পথে হাইজ্যাকার।
সব কিছু নিল কেড়ে,
শিয়াল পালায় ঢাকা ছেড়ে।

মুক্ত পাখি

এস.এম. নয়ন
কলেজ নম্বর : ৮৪৪৩
শ্রেণী : দ্বাদশ, মানবিক

আমি ছিলাম বন্দী পাখি
পাকিস্তানের পিঞ্জরে,
দিবানিশি কত যে ব্যথা
জ্বলত আমার অন্তরে।
কবে যে আমি মুক্তি পাব
এই ছিল মোর সাধনা
দিবানিশি মুক্তির আশা
করতাম শুধু ভালবাসা।
আমার ব্যথা বুঝেছিল
লক্ষ কোটি বঙ্গবীর,
ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বদলে
এনেছে আমার মুক্তি।
আমি এখন মুক্ত পাখি
আহা কি শান্তি।

মননে আমার কানন নিলয়

রিজওয়ান আহসান
কলেজ নম্বর : ২০৩০ (দিবা)
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

আমাকে একটি জোনাকীর স্বপ্ন এনে দাও,
স্পন্দনহীন জনপদের মাঝে আমি ছড়িয়ে দেব তার বীজ।
ধূসর প্লাবনে প্লাবিত বসুন্ধরা হয়ত আবার হাসবে
হাসবে অনুক্ষণের শত জীর্ণ স্বপ্ন তাও।

আমাকে এনে দাও একটি জ্যোৎস্নার প্রহর,
চাঁদোয়াস্নাত কুয়াশার আঁচলে করব তিমির ব্যবচ্ছেদ।
পল্লব মাল্যতে আঁকব ধূম্র কবর।
কষ্টের শিশির আর আনবেনা কল্প প্রভেদ।

আমাকে দাও একটি নীল গাঙচিল,
যার ছোঁয়ায় শুভ্র চাদরে সূর্য হাসে।
তার সিক্ত স্পর্শে মুছে দেব সকল মৌনতা
গ্লানিময় ব্যাপ্ত পবন ঝরবে অনন্ত আলোক বাসে।

আমাকে ফিরিয়ে দাও সেই রোদেলা শ্রাবণ,
যার শ্বেত বর্ষণে শ্যামলিত বসুন্ধরা।
আমাকে ফিরিয়ে দাও সেই হৃদয়ে নিলয়
যার মননে চির পুলকিত কানন আমার।

কিভাবে জানাই

মোঃ হোসেন রহমান
কলেজ নম্বর : ২০৪০ (দিবা)
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

কানা কানা জনম কানা
কানা আমার ভাই,
ভাল কাজে সবসময়
ভুল করে তাই ।
মাপতে দিলে একটা জিনিস
মাপে অন্য কিছু,
ভুল করে তাইতো সে
কাঁঠালরে কয় লিচু।
এক কাজে তার আছে ভাই
অনেক রকম বাঁধা
ছয় পাওয়ারের চশমা পরে
ভুল করে সদা।
এমন মগজের মানুষ তো
দুনিয়াতে নাই,
দুঃখের কথা তোমাদের
কিভাবে জানাই?

চারু কারু

জাহিন শাহরিয়ার
কলেজ নম্বর :১৮১২, (দিবা)
শ্রেণী : ৪র্থ

চারুতে আমি খুবই ভাল,
কারুতে মারি ডাব্বা,
কারু নিয়ে বকাবকি করে,
আমারই আব্বা।

আপু বলে, নিজে বল,
চারুতে খুবই ভাল।
চারু করতে গেলে তুমি,
বল নিয়ে খেল।

আব্বু বলে, ছাগল তুই,
কারু ত পারবিনা।
কারুর ছবি লাগাতে গেলে,
গাম বেশি মাখবিনা।

আব্বু বকে, আপু বকে,
আম্মুও বকে আবার।
এত বকা খেতে খেতে,
কম্ম আমার কাবার।

ব্রেন ঠাণ্ডা

মোঃ মোহাইমিনুল হক
কলেজ নম্বর :১৮০৮ (দিবা)
শ্রেণী : চতুর্থ, ক-শাখা

আব্বা বলেন অংকে দে মন
আম্মা বলেন বাংলা
ভাইয়া বলেন এসব ছেড়ে
ইংরেজীটা সামলা।
কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি
ব্রেন হল ঠাণ্ডা
পরীক্ষাতে পেলাম আমি
মস্ত বড় আণ্ডা।

পেটুক

রাকিব রাহমান
কলেজ নম্বর : ১৮৪৭ (দিবা)
শ্রেণী : চতুর্থ

কেজি দুই তেল খেয়ে,
গোটা চার বেল খেয়ে,
এক মগ ঘোল খেয়ে,
পুরো পাকা শোল খেয়ে,
তার সে কী লাফ।
ওমা তার পেট কী
যশোরের ভেটকী
মুখ ফোলা হাঁড়ি তার
খুব কাছে বাড়ি তার।

ক্রিকেট খেলা

মোঃ ইউসুফ আজাদ
কলেজ নম্বর :১৫৯২ (দিবা)
শ্রেণী : চতুর্থ, খ-শাখা

ক্রিকেট খেলা, ক্রিকেট খেলা
চারিদিকে একই মেলা।
এই খেলাটা সবাই খেলে
এই খেলাটা সবাই দেখে।
ক্রিকেট খেলা, ক্রিকেট খেলা
চারিদিকে একই মেলা।

মায়ের চিঠি

অলি হাসান
কলেজ নম্বর : ১৮২৫ (দিবা)
শ্রেণী : চতুর্থ, গ-শাখা

মাগো তোমায় চিঠি লিখেছি,
দোয়াটুকু চেয়ে।
সালাম খানি নিও তুমি,
স্নেহ টুকু দিয়ে।
অনেক দিন যে হয়ে গেল,
যাইনি তোমার কোলে।
মনটা শুধু কেঁদে মরে,
ডাকিনা মা বলে।
সেই যে মোরে বিদায় দিলে,
কান্না ভেজা আঁখি।
তোমায় ছেড়ে মাগো বলো,
কেমন করে থাকি?
স্নেহময়ী, আদরিনী,
ওগো প্রাণের মা।
তোমার পরশ না পেলে
জগৎ হাসে না।

রাজনীতি

মোঃ শাহ্‌নেওয়াজ (শুভ)
কলেজ নম্বর : ১৮২৪(দিবা)
শ্রেণী : চতুর্থ

আমাদের রাজনীতি চলে বাঁকে বাঁকে
প্রত্যেক মাসে তাই হরতাল থাকে।
পার হয়ে যায় দিন, পার হয় মাস
হরতালে জনপদ করে হাঁসফাঁস।
খিটি মিটি লাগে দলে নেই কোন মিল
প্রায়শই গোলাগুলি, চড়, ঘুষি, কিল
কিচি মিচি করে শুধু রাজাকারের ঝাঁক
রাজনীতি ভীতি আজ নেয় শুধু বাঁক।
আক্ষেপ করি আহা মরি মরি
এর নাম রাজনীতি? বল কি যে করি !

ম্যারাডোনা

আশরাফুর রহমান
কলেজ নম্বর : ১৫৫৮ (দিবা)
শ্রেণী : ৫ম, ক-শাখা

যত দিন থাকা
ততদিন ডাকা
ততদিন সকলের
মন জুড়ে থাকা।
যেই খেলা শেষ
থেকেই যায় রেশ
সান্ত্বনা দেয় লোকে
মন হয় ফ্রেশ।

জীবনের মিঠে পানি
হয়ে যায় লোনা
নিয়তির পরিহাস
হায় ম্যারাডোনা।
দর্শক হয়ে আজ
নিজ ঘরে বসে
অতীতের খেলা নিয়ে
অংকটা কষে।

পকেট হল ফাঁকা

শাফকাত রহমান
কলেজ নম্বর : ১৫২৯ (দিবা)
শ্রেণী : ৫ম, ক-শাখা

করিম মিয়া যাবে ঢাকায়,
মনে কত আশা
চাকর বাকর রাখবে সেথায়,
নিয়ে নতুন বাসা।
গাড়ি ঘোড়ায় চড়বে সে যে
কত বড় আশা,
গুলিস্তানে আসার পরে
পকেট হল ফাঁকা

ভাবছে বসে করিম মিয়া,
কেমন শহর ঢাকা?

এক থেকে বিশ

আহমেদ শওকী অর্ণব
কলেজ নম্বর : ১৫১৪ (দিবা)
শ্রেণী : ৫ম, ক-শাখা

এক শিখেছি সবার আগে
দুই শিখব সবার পরে,
তিন গিয়েছে মামার বাড়ি
চার পালাল ডরে।
পাঁচ ঘুরছে পিছে পিছে
ছয়ের দেখা নাই,
সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে
আটের বাড়ি যাই।
নয় যদি না থাকত ভাই
দশের হত কি?
এগার মিয়া বিক্রি করেন
বার টাকার ঘি।
তের গেছে ধান কাটিতে
চৌদ্দ নম্বর রোডে,
পনের সাহেব দিলেন টাকা
ষোল এল বোর্ডে।
সতের মিয়া ভারি দুষ্টু
যায়না বিদ্যালয়ে,
আঠার মিয়া ফেল করে
আবোল তাবোল কয়ে।
উনিশ করে তাড়াতাড়ি
যেতে বিশের বাড়ি
দুই এর পিঠে শূন্য দিলে
চলে যাব বাড়ি।

ছিনতাই

তামজীদুর রহমান
কলেজ নম্বর : ১৬০৫ (দিবা),
শ্রেণী : ৫ম, ক-শাখা

রিকশাটা ছুটছিলো বেশ জোরেসোরে
হঠাৎ থামাল কেউ গলিটার মোড়ে।
চমকেই চেয়ে দেখি ছিনতাইকারী,
গোঁফওয়ালা একজন গালে আছে দাড়ি।
যা আছে বের কর ধরে ছোরা উঁচিয়ে
না হলেতো ছোরা মেরে দেব সব ঘুচিয়ে
সাথে ছিল দশ টাকা রিকশার ভাড়া,
ওটা বের করতেই রেগে যায় তারা।
আমরা ফকির নাকি দিচ্ছ যে ভিক্ষা
দাঁড়াও দিচ্ছি আজ যথাযথ শিক্ষা।
এই বলে রেগে তারা খুব জোরে ঝাড়ল,
খুব জোরে ঘুষি আর চড় কিল মারল।

গল্প

বাদল

শুভ্রজ্যোতি কুন্ডু

কলেজ নম্বর : ৮৩৬৫

শ্রেণী : অষ্টম

তখন আমরা ঝিনাইদহের কালিগঞ্জে থাকি। বাবা থাকতেন বিদেশে। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। মা চাকরি করতেন কৃষি ব্যাংকে। আমার ছোট ভাই পড়ত ক্লাস টু-তে, আর আমরা থাকতাম ভাড়া বাড়িতে।

কামাল নামে আমাদের এক কর্মচারী ছিল। বয়সে বড় কিনা, তাই 'কামাল ভাই' বলে ডাকতাম। সেই আমাদের রান্নাবান্না করে দিত।

হঠাৎ দেখি, কামাল ভাই একটা ছাগল নিয়ে এল। "ব্যাপার কি? হঠাৎ একটা ছাগল?" বলে উঠলাম। মাকে কামাল ভাই বললেন, "একটা ছাগল কিনে নিয়া আসলাম খালাম্মা। দাম ১৩০০ টাকা। অসুবিধা নাই।" মা ও মেনে নিলেন ব্যাপারটা।

ছাগলটা যদিও পছন্দ হয়নি, তবুও আমাকে ছাগলের পছন্দ হল। সবাই মিলে ছাগলের নাম ঠিক করলাম। ছাগলটাকে কাছে এনে বললাম, "আজ থেকে তোর নাম হল বাদল।" ছাগলটা মাথা নাড়ল। আশ্চর্য! ছাগলটাকে "বাদল" ডাকার সাথে সাথেই ম্যা ম্যা ম্যা করে ডেকে উঠল।

বাদলের এখন খাওয়া দরকার। কাছে কিছু কাঁঠাল পাতা ছিল, ঝুড়িতে এনে দিলাম। সাথে সাথে খেয়ে নিল। বোধ হয় ক্ষুধাও লেগেছে। বাদলের কতগুলো দোষ ও গুণ ছিল। দোষগুলো সব ছাগলেই করে। পরের ঘরে গিয়ে কলা বা অন্যকিছু খেয়ে আসা এবং মলমূত্র ত্যাগ করা। আর গুণ হচ্ছে বাদল ভাত খেতে ভালবাসে। শুধু ভাত নয়, হতে হবে ঝোল মাখানো ভাত। আমার আঙ্গুলগুলোও খেতে চাইত। এভাবে দিন কেটে যেতে থাকে। যদিও সবাই বিরক্ত হত, তবুও কিছু বলত না। তবে আমার মাঝে মাঝে মনে হতো, ও আগে হয়তো বা আমাদেরই মত মানুষ ছিল। বাদলও বেড়ে উঠতে লাগল আমাদের সবার ভালবাসায়।

একদিন সন্ধ্যার পরে মাকে বলি, "মা, বাদলকে দেখছি না।" মা তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, "দেখ, কোথাও আছে"। কিন্তু কামাল ভাইকে বলে কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমার এক দুঃসম্পর্কের বড় ভাইকে আমি তরুণ দাদা বলে ডাকতাম। সেও গেল খুঁজতে। আমার কেঁদে ওঠার উপক্রম হল। "তবে কি বাদল..."

মা বলেন, "কেঁদো না, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।" কিন্তু তরুণ দাদা বলল, "নাহ্ মাসি, কোথাও নেই। 'কামাল ভাই বলল,' চল তরুণ, পাশের পাড়া যাই। 'তরুণ দাদা বলল,' চল, উঠ!" তাও গেল, অনেক খোঁজার পর পাড়ার শেষ বাড়িতে। 'বাদল,' বলে ডেকে ওঠার সাথে সাথেই "ম্যাম্যা" করে হেঁকে ওঠে। মনে হল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। জীবনের এক পুরানো আনন্দ যেন আবার জীবনে ফিরে এল। এভাবে আবার দিন কাটতে লাগল আগেরই মতন।

জীবনে সব সময় সুখ আসে না। এবার যা বলছি তাই হল গল্পের আসল কাহিনী।

সকালে প্রতিদিন উঠে প্রথমে বাদলের মুখদর্শন করতাম। কিন্তু এই আট মাসের মধ্যে আজকে প্রথম বাদলকে কেমন মনমরা দেখতে পেলাম। পাশেই শুনলাম কথাবার্তা। কামাল ভাই কার সাথে যেন দরদাম করছে। আমার বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠল। এ যে সিরাজ কসাই! মাকে অনেক বললাম, অনুরোধ করলাম, যেন বাদলকে যেন বেচে না দেয়। কামাল ভাই কিছুটা হাসি মুখ নিয়েই যেন বলল, "আইচ্ছা ঠিক আছে, বেচুম না।"

এতে কিছুটা হয়ত বিশ্বাস করেছি। কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে জীবনটা ছারখার হয়ে গেল। মনে হল যে, প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম মনে।

উফ্! বাদলের কথা শুনতেই মা বললেন, বাবা সোনা আমার, দুঃখ কোর না।

"বাদলকে বেচে দিয়েছি।"

এই কথার পর নিথর পাথরের মত হতভম্ব হয়ে বসে পড়লাম।

অনেক দিন, অনেক বছর হল ফেলে এসেছি সেই অশ্রুসজল অতীতকে। তবু এখনও কোন পোষা প্রাণীকে এবং তার বেচে দেওয়ার দৃশ্যটি দেখলে মনে পড়ে যায় সেই হতভাগা বাদলের কথা।

একটি ছেলে

সাজেদুল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ৭১৬৯
শ্রেণী : অষ্টম-ক

১৯৯৮ সালে চতুর্থ শ্রেণীতে কিছু নতুন ছাত্র ভর্তি হয়। তাদের মধ্যে একটি ছেলের নাম ছিল জিয়াউল হক। সে ভর্তি পরীক্ষায় অত্যন্ত গৌরবের সাথে ১ম স্থান অধিকার করে। কিন্ত স্কুলে এসে ১ম হওয়ার কোন নাম গন্ধই তার মধ্যে পাওয়া যায় নি। কারণ সে প্রত্যেক বছর ১ম ও ২য় পর্ব পরীক্ষায় কোন না কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হত। কিন্তু ৩য় পর্বশেষ পরীক্ষায় সে খুব কষ্টের সাথে কৃতকার্যতা লাভ করত। পাঠ্য বইয়ের চেয়ে গল্পের বই ছিল তার কাছে অধিকতর প্রিয়। গল্পের বইয়ের জায়গায় সে যদি পাঠ্য বই পড়ত তবে সে অবশ্যই কৃতকার্যতা লাভ করত এবং ভাল ফলাফল করত। হয়ত সে তা জানত। তবুও সে গল্পের বই পড়তে বেশি মনোযোগী ছিল। তার মা, বাবা তাকে অনেক বোঝাত, তারা তাকে সব সময় ভালভাবে পড়তে বলত। মা, বাবার সামনে সে ঠিকই জ্বি, জ্বি বলত। কিন্তু সে তার এই কর্মকে বাস্তবায়িত করত না। সে বইয়ের ধারে কাছেও আসত না। সে খুব অলস প্রকৃতির ছেলে ছিল। সব কাজে তার দেরী হত। সব শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ স্যারও তাকে সব কাজ দ্রুত করতে বলতেন। কিন্তু সে করতে পারত না। হয়তবা সে নিজের ইচ্ছায়ই এমন করত। খেলাধুলায় সে ভাল ছিল না। তাকে খেলাধুলার মাঠে দেখতে পাওয়া যেত না। সে খেলার সময় কোথায় কোথায় যেন হারিয়ে যেত। আবার খেলা শেষে সে ঠিক মতই হাউসে ফিরে আসত।

২০০১ সালের ১ম ও ২য় পর্ব পরীক্ষায় সে একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। এবং বার্ষিক পরীক্ষায় সে কষ্ট করেও কৃতকার্য হতে পারল না। তাই তাকে এই সুন্দর পরিবেশের কলেজ থেকে চলে যেতে হল।

আমার বন্ধু ও ভাইদের কাছে আমার একটি মাত্র অনুরোধ—আগামীতে আর কাউকে যেন জিয়ার মত চলে যেতে না হয়।

জন্মদিন

মোহাম্মদ সাইফুর রহমান
কলেজ নম্বর : ২১৯০
শ্রেণী : নবম (দিবা)

রাজু, দীপ ও কাউসার রংপুর গিয়েছে তাদের বন্ধু আসাদের কাছে। ওখানে ওর বোনের জন্মদিন আগামীকাল। তাই তারা আসাদের পিতামাতা দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছে। তবে ওদের একদিন পূর্বে যেতে বলেছে। আগামীকাল একসাথে দুটি আনন্দের দিন । এক, আগামীকাল আসাদের বোনের প্রথম জন্মদিন এবং দুই, আগামীকাল ১ জানুয়ারি। আগামীকাল ধুমধামের সাথে জন্মদিন পালিত হবে তাছাড়া ওরা খুবই ধনী, তাই ধুমধাম হওয়াটাই স্বাভাবিক। ওদের বাসে তুলে দিয়েছিল দীপের আব্বু। ঢাকা থেকে রংপুরে এসে "হানিফ এন্টারপ্রাইজের " বাসটি থামলে, ওরা নেমে দেখলো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে আসাদের আম্মু ও আসাদ। ওদের সাদরে অর্ভ্যথনা জানিয়ে গাড়িতে তোলা হলো। গাড়িতে করে ওদের বাসায় আসার পর ওরা ভিতরে ঢুকতেই বিস্মিত হলো। এতজন চাকর-চাকরানী অথচ কেউ বসে নেই সবাই ঘর সাজাতে ব্যস্ত।

কাউসার প্রস্তাব করলো–খালা, আমরাও কি সাহায্য করতে পারি না?

খালা বলল–অবশ্যই, তবে এখন নয় এখন তোমরা পরিশ্রান্ত । ঘুমাও এরপর খেয়ে কাজে হাত দিতে পারবে। ওদের মেহমানদের ঘরে আনা হলো। ওরা ঘরটার সাজানো গুছানো রূপ দেখে অভিভূত হলো। এরপর বিছানায় শুয়ে পড়লো। ওরা চোখ বুজল কিন্তু ওদের মনে হলো ৫ মিনিট না হতেই ওদের ডেকে দেয়া হয়েছে।

আসাদ বলল–পুরো ৪ ঘণ্টা ঘুমিয়েছিস, এখন মাগরিবের আযান দেবে উঠে পড় ।

ওরা কোন রকমে উঠল। আসাদের কোলে ওর বোন। বোনটিকে দীপের কোলে দিল। দীপের ঘুম কেটে গেল ওর বোনকে কোলে নেওয়ার পর। মেয়েটি সুন্দরী ও ভাগ্যবতী। বছরের ১ম দিন জন্ম নেয়া ভাগ্যের ব্যাপার! কাউসার বলল- ওর নামটা কি যেন.....কি যেন..... আসাদ বললো, বাবা এক নামে ডাকে, মা আরেক নামে ডাকে মা বলে মরিয়া খান অরিন এবং বাবা বলে জয়া। আমি বলি জয়া খান অরিন। আসাদ বলল খেয়ে নে তাড়াতাড়ি, কখন খেয়েছিস ঠিক নেই।

(২)

পরের দিন, সকাল বেলা.....

ওরা ঘুম থেকে উঠে দেখল সারা বাড়িতে গুঞ্জন ও মানুষের ভিড়। জন্মদিনের উৎসবের মেহমানরা হয়তো এসে গেছে। ওরা ঘুম থেকে উঠতেই আসাদ এসে ওদের তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে উৎসবে যোগদান করতে বলল। ওরা হাতমুখ ধুয়ে জামা পাল্টে এখন উৎসবে যোগদান করতে যাবে হঠাৎ খালা বলল- আচ্ছা দীপ তোমাদের তিনজনের একজনও কি রাতে দরজা খুলেছিলে? ওরা তিনজনেই এক সাথে বলল- না তো । কেন কি হয়েছে ? খালা বলল-"রাত্রে আমি নিজে দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়েছিলাম কিন্তু সকালে উঠে দরজা খুলে দিব ভেবেছি কিন্তু গিয়ে দেখি দরজা খোলা। এরপর চাকর–চাকরানীদের গিয়ে জিজ্ঞেস করি কিন্তু তারা সকলেই অস্বীকার করে এ ঘটনা। আবার সারা বাড়ি ঘুরে দেখি কোন কিছু হারিয়েছে কিনা কিন্তু কোন জিনিস হারানোও পেলাম না। এটা কি ঘটেছে বুঝতে পারলাম না, তবে আমার মনে হয় এটা একটা

সাধারণ ঘটনা।'

রাজু বলল – "আমার মনে হয় না এগুলো সাধারণ।" কাউসার বলল-কেমন যেন রহস্য মনে হচ্ছে।

দীপ বলল– খালা আমাদের কি এই রহস্যের সমাধান করার সুযোগ দিবেন? মিসেস সাদাদ বলল— তোমরা তো ঘরের ছেলে তোমরা চেষ্টা করতে পার। সারা বাড়ি খোঁজার দরকার নেই বাইরের রুমগুলো দেখ। নইলে এখানকার মেহমানরা সন্দেহ করবে। তবে আগে অরিনের জন্মদিনটা ভালভাবে যাক। ওরা জন্মদিনে উপস্থিত থেকে অরিনের মঙ্গল কামনা করলো। বিকেলে...

ওরা সারা বাড়ির সকল মেহমান বিদায় নেওয়ার পর আতসী কাঁচ, টর্চ হাতে নিয়ে খুঁজতে লাগল। প্রথমে বাড়ির বাগানে। এরপর যখন কিছু পেল না তখন বাড়িতে ঢোকার দরজাটার সামনে বসে পরীক্ষা করতে লাগল। একসময় দীপ রেগে বলল– চোর এসেছে কিনা এখনও আমরা নিশ্চিত না, শুধু শুধু কষ্ট করছি। এক সময় রাজু চিৎকার করে বলল– দেখো এ পায়ের ছাপটা বুটের। সবাই দেখলো। সম্ভবত প্রাচীর ডিঙিয়ে লাফ দিয়েছিল ফলে মাটির কিছুটা অংশ থেবড়ে গেছে। কাউসার জুতোর মাপটা নিয়ে সামনের পায়ের ছাপগুলোর সাথে মিলিয়ে আসতে লাগল। বাড়ির দরজার কাছে ওরা চলে এলো মাপতে মাপতে কিন্তু দরজা পর্যন্ত আসার পর আর সামনে যাওয়ার কোন চিহ্ন পেলনা ওরা বুটের । সন্ধ্যা ৭টার সময় ওরা সকল ঘর খুঁজেও আর কোন সূত্র পেল না । দীপ বলল– তবে একটা ব্যাপারে এখন আমরা নিশ্চিত যে রাতে কেউ বাসায় এসেছিল। কিন্তু ওরা রাজুকে দেখল গভীর চিন্তায় মগ্ন। ওরা ওকে কি ভাবছে জিজ্ঞেস করতে সে বলল– আচ্ছা পায়ের ছাপটা বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত এসেছিল এরপর তাকে দরজা খুলে দিল কে? নিশ্চয়ই এ বাড়ির কোন মানুষ। কাউসার বলল– তবে এপরিবারের কেউ নয়। তাহলে চাকর চাকরানী হতে পারে। এরপর ওরা আসাদের কাছে গিয়ে বলল– এ বাড়িতে কয়েকদিনের মধ্যে কোন চাকর এসেছে কিনা। আসাদ বলল– এসেছে তোমরা আসার আগের দিন বা পরশু। রাজু বলল— তাহলে ঠিক আছে।

আসাদ বলল– কি ঠিক আছে ? দীপ বলল তোকে পরে বলব। আসাদ আবার পড়ায় মন দিলো। রাজু দীপ ও কাউসার ঘরের এক কোণে আসার পর রাজু বলল আমার ধারণাটা শোন। এ বাড়িতে একটা কুটিল চক্রান্ত চলছে। যেমন : একজন লোক বুটপায়ে এ বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে আসে এই সদর দরজা পর্যন্ত, এরপর এ লোকটি এই দরজার সামনে দাঁড়ায় এরপর ঐ নতুন কাজের ছেলেটা দরজা খুলে দেয়। সে গিয়ে ঢুকে। এরপর এ বাড়িতে কিছু একটা দিয়ে যায় অথবা নিয়ে যায়। আমার ধারণা ভুল হতে পারে তবে একবার চেষ্টা করি এটা হয় নাকি দেখি। কাউসার বললো– আরো কথা আছে। লোকটার বুটের দাগ বাড়িতে পাওয়া যায়নি কারণ বাড়িতে যে ছাপ ছিল তা ঐ কাজের ছেলে মুছে ফেলেছে। দীপ বলল– আমার মনে হয়, এখন যদি কাজের ছেলেটাকে আমরা পালাতে দেখি তবে তাকে ধরতে হবে। এবং বুঝতে হবে এ বাড়িতে কোন মারণাস্ত্র আছে। ওরা ওদের ধারণা অনুযায়ী অপেক্ষা করতে লাগল।

(৩)

রাজু, দীপ ও কাউসার দেখল রাত সাড়ে ১১টার কোঠা যখন ঘড়ি ছুঁয়েছে তখন ওরা ঐ কাজের ছেলেকে ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হতে দেখল এবং সে এমনভাবে বেরোচ্ছে যে দেখেই বুঝা যাচ্ছে সে চোর। ওরা বাগানের ভিতর লুকিয়ে ছিল। লাফিয়ে তার সামনে দাঁড়াল ৩ জন। সে অন্যমনস্ক থাকায় ওদের

শরীরে ওর ধাক্কা লাগল। সে ভয়ে কুঁকড়ে উঠল। সে এতটা ভয় পেল যে বলল– তোমরা এখানে কেন ? দীপ বলল— তার আগে বল তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল— একটু বাইরে ঘুরতে যাব। কাউসার বলল– রাত সাড়ে ১১টায় ঘুরতে যাবে, না? ছেলেটা কিছু বলল না। রাজু বলল মারণাস্ত্রটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছো? ছেলেটা বলল– আমি জানি না। রাজু হঠাৎ দীপের চোখে চোখ মেরে বলল– দীপ পুলিশে ফোন করো, যেন তাড়াতাড়ি আসে। দীপ বাড়ির ভিতরে যাবে এমন সময় ছেলেটা বলল– পুলিশে ফোন করো না আমি বলছি। একটি সাহেব আমাকে ১০০ টাকা দেয় সকালে এবং বলে রাত্রে আসবে যেন আমি দরজা খুলে দেই। দরজা খুলে দেয়ার পর তিনি সাহেবের ও সাহেবার ঘরে যান এরপর কি করেন আর জানি না। আম-াকে ছেড়ে দাও। কাউসার বলল– তাহলে পালাতে চাচ্ছ কেন? সে এত ভয় পেল যে বলেই দিল– ঐ রুমে মনে হয় কোন বোম্ব রেখেছে তাই আমাকে রাত সাড়ে এগারটায় পালিয়ে যেতে বলেছে। এবার ওরা তিনজন হকচকিয়ে উঠল এবং ছেলেটাকে একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখে দিল। এরপর ভিতরে গেল দৌড়ে। অন্য ঘর থেকে আসাদকে নিয়ে সরাসরি আঙ্কেলের ঘরে গেল। দরজা টোকা দিল। আঙ্কেল বলল– কে? দীপ বলল– আমরা আঙ্কেল। আঙ্কেল বললেন– ভিতরে এসো। ওরা ভিতরে গিয়ে দেখল আন্টি দোলনা নাড়াচ্ছে আর আঙ্কেল শুয়ে রয়েছে। রাজু কোন ভূমিকা না করে বলল– আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। আশা করবো দ্বিধা না করে সঠিক উত্তর দিবেন। আঙ্কেল বলল– তাড়াতাড়ি বলো তোমাদের তো সিরিয়াস মনে হচ্ছে? রাজু বলল-আপনার অফিসে আপনার সাথে কারো গণ্ডগোল হয়েছে? বা বিদ্বেষ ভাব হয়েছে আঙ্কেল বলল– হ্যাঁ, মিঃ মৃধা নামের এক ব্যবসায়ী আমাকে ঘুষ দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি নেই নি বলে সে আমাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছে। রাজু বলল— তাহলে সব পরিষ্কার। আপনার ঘরটি আমরা দেখতে চাই। রাত ১১.৫২ মিনিটে ওরা অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর যখন কিছু পেল না তখন সবাই নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজু ও আসাদ তখনো খুঁজছে। এক সময় আসাদ তার বোন জয়াকে কোলে নিল দোলনা থেকে। রাজু লাফিয়ে দোলনাটায় খুঁজতে লাগল। একটা কাঁথার নিচে ওরা কাল একটা কি দেখতে পেল। রাজু সেটি উচুঁ করে সবার সামনে ধরলো। আঙ্কেল বললো– এটা একটা টাইম বোমা। মুহূর্তেই সবার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। আঙ্কেল পুলিশে ফোন করলো। তারা তাড়াতাড়ি আসবে কথা দিলে আঙ্কেল ফোন রাখল। আর মাত্র দুমিনিট বাকি। আসাদ সবার উদ্দেশ্যে বলল, বোমার গায়ে চারটে তার। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ চারটি রঙের তার। আঙ্কেল জয়াকে নিয়ে আন্টিকে বাড়ির সীমানার বাইরে যেতে বলল। তারা বাইরে চলে গেল। দীপ বলল– লাল তারটি কাট, কারণ বাংলাদেশের পতাকার লাল বৃত্তটি শহীদের মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। কাউসার বলল– সবুজ তার কাট, কারণ তা দেশে সবুজ গাছপালার বৈচিত্র্য রূপকিত করে। রাজু বলল-হলুদ তারটি কাট,কারণ এটা আমার প্রিয় রং। মিঃ সাদাদ বলল– নীল রঙেরটা কাট। কারণ এটা আমার বাড়ির রং। এরপর তিনি টাইম বোমের দিকে তাকিয়ে দেখেন আর মাত্র ১০ সেকেন্ড বাকি। কেমন যেন মনের ভিতর একটা শিহরণ দিয়ে ওঠে ওদের। আসাদ কোন তারটা কাটবে এ নিয়ে যখন ইতস্তত করতে লাগল তখন আঙ্কেল তার হাত থেকে চাকুটা নিয়ে নীল তারটা কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা অজানা আশঙ্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলল। ওরা ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখল টাইম বোমার সময় বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল। তখন বাইরে ওরা খালার ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পারছিল। ওরা গিয়ে দেখল খালা ওদের অক্ষত দেখে আনন্দিত হয়েছেন। বাইরে বেঁধে রাখা ছেলেটার নাম মিরান। ছেলেটা ভালই কিন্তু টাকার লোভ শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারেনি। সে পুলিশের কাছে স্বীকার করলো। যে লোক টাকা দিয়েছিল

তাকে বের করার জন্য মিঃ মৃধাকে তার সামনে আনার পর সে তাকেই চিহ্নিত করে ফলে তাকে হাজতে রাখা হয়। আর মিরানকে ছেড়ে দেয়া হয় সব স্বীকারোক্তির কারণে। মিঃ সাদাদ ছেলেদের বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগল। এরপর পুলিশ চলে গেলে সবাই ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে করে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন.....

পুলিশ অফিসার মিঃ সাঈদ বোমাটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল মিঃ জাহিদ সাদাদের সাথে। মিঃ সাঈদ বলল—সে বোমাটা ফাটলে এই বাড়িসহ আশেপাশের কয়েক বাড়িও ধ্বংস হতো। কারণ বোমাটা শক্তিশালী। মিঃ জাহিদ সাদাদ বলল- সবই ঐ ছেলেদের অবদান। এমন সময় রাজু, দীপ ও কাউসার তার সামনে এলো ব্যাগ নিয়ে এবং আঙ্কেলের কাছে বিদায় চাইল। সবাই চুপ হয়ে গেল যেন তাদের কথায়। আঙ্কেল বলল- আজ না গেলে হয় না। দীপ বলল- টিকেট কাটা আছে। আজই ১১.০০ টায় যেতে হবে ঢাকায়। আঙ্কেল বলল- আমি তোমাদের টিকেট কিনে দেব তোমরা এই টিকিটে যেয়ো না। কাউসার বলল- বাবামা চিন্তা করবে, আঙ্কেল। তিনি বললেন- তাদের আমি ফোনে বলে দেব। রাজু বলল- তা হয় না, আমরা আবার আসব, দোয়া করবেন। সবাই আঙ্কেলের বাড়িতে উঠল। আসাদের চোখে পানি, আন্টিও চুপ থাকতে পারল না। গাড়ি চলতে লাগল।

প্রদর্শনী নম্বর ১৯৯

সৈয়দ রাজাউল আকমল আল মাহমুদ
কলেজ নম্বর : ৮৩৯৮
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

৩১শে ডিসেম্বর, ৮৯৯৯ সাল। নতুন মিলেনিয়াম ৯০০০ সাল থেকে শুরু হবে, নাকি ৯০০১ সাল থেকে, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। তবে বিতর্কের অবসান না হলেও পাবলিক স্কোয়ারগুলিতে বিশাল ত্রিমাত্রিক স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে বিদায়ী মিলেনিয়ামের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রিতে দেয়া হচ্ছে বিশেষ মিলেনিয়াম ছাড়। সব মিলিয়ে সারা পৃথিবীতেই পড়ে গেছে সাজ সাজ রব।

অবশ্য এসব কিছুই সেভাবে স্পর্শ করছে না ফিন অ্যালসেসকে, তিনি কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানার সিনিয়র ডাক্তার, বিশ্বের বিরলতম প্রজাতির প্রাণীর শেষ কয়েকটি নমুনা ছিল কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানায়। গত মাস চারেকের মধ্যে দু'-টো বাদে বাকি সব মারা যাবার পর গতপরশু সকালে শেষ জোড়ার স্ত্রী প্রাণীটিকেও হারাতে হয়েছে। শেষ প্রাণীটিও যায় যায়। এসব নিয়ে ভীষণ চিন্তিত অ্যালসেস, আজ বিকেলে মহাপরিচালক চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে আসবেন। তাঁর সাথে ব্যাপারটা আলোচনা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানার মূল করিডোর ধরে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন মহাপরিচালক রূহর চেকো।

"প্রদর্শনী নম্বর ১৯৯ এর অবস্থা ভালো নয়, স্যার," তাঁর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন ডাক্তার অ্যালসেস।

"শুনেছি খবরটা," ডানে মোড় নিলেন চেকো, "ওর সমস্যাটা কি?"

"ফুসফুসে ক্যান্সার," সংক্ষেপে জবাব দিলেন ডাক্তার।

তাঁরা ততোক্ষণে পৌঁছে গেছেন প্রদর্শনী নম্বর ১৯৯ এর ক্যাপসুলের সামনে।

"এটাই তো এই প্রজাতির শেষ জীবিত নমুনা," প্রাণীটিকে ভালো ভাবে লক্ষ করতে করতে বললেন চেকো, "ও আমাদের চিড়িয়াখানার অমূল্য সম্পদ। ওকে বাঁচাতে এখন যা যা করা দরকার সব করবেন।"

"আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না, স্যার," রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন অ্যালসেস, কেমোথেরাপি চলছে। তবে কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না, আসলে জাতটাই দুর্বল। ওর সঙ্গিনীও তো রোগে ভুগে মারা গেল গতপরশু। অবশ্য জাতটা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও ওদের কাছে আমরা ঋণী। ওদের জিন সংক্রান্ত গবেষণা থেকেই তো আমাদের জন্ম।"

"আস্তে বলুন, ডাক্তার," কপট ভয়ে বললেন চেকো, "বামপন্থীরা শুনতে পেলে রক্ষে নেই।"

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন চেকো। ধীরে ধীরে তারা সরে গেলেন Homo sapiens লেখা ক্যাপসুলের সামনে থেকে।

রাত বারোটা এক মিনিটে মারা গেল সে, পৃথিবীর শেষ মানুষ। সেই মুহূর্তে পুরো পৃথিবী কি কেঁপে উঠল? ভূমিকম্পমাপক যন্ত্রগুলি হঠাৎ সচল হয়ে উঠল কেন?

ঈদের খাসি

আব্দুল্লাহ-আল-আমিন
কলেজ নম্বর : ৮৪৯১
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। আমি সবে ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করেছি। তখন রমজান মাস প্রায় শেষ পর্যায়ে। সামনেই রয়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। আমার আব্বু আবার প্রত্যেক রোজার ঈদেই একটি করে খাসি কিনে থাকেন। অবশ্য সেটি আমারই জন্য। কারণ খাসি না কেনা পর্যন্ত আমিই আব্বুকে জ্বালাতন করতাম। অন্য কোন কিছু হোক বা না-ই হোক রোজার ঈদে একটি করে জ্যান্ত খাসি আমার চা-ই চাই। আর আমার চাহিদা পূরণার্থে আব্বু প্রত্যেক ঈদে মুরগী ও অন্যান্য বাজারের সাথে সাথে একটি আস্ত জীবিত খাসি কিনে নিয়ে আসতেন। তারপর আমি সেটির দড়ি ধরে রাস্তায় হাঁটাতাম এবং স্কুল মাঠে নিয়ে গিয়ে ঘাস খাওয়াতাম। মাঝে মাঝে আমি ওর জন্য মাদার, মেহগনি, আমড়া প্রভৃতি গাছের পাতাও পেড়ে নিয়ে আসতাম। এতে করে আমি এক অজানা আনন্দ খুঁজে পেতাম।

তো সেবার কেন যেন আব্বু স্থির করলেন যে, ঈদে খাসি কেনা হবে না। কথাটা জানার পর আমার মন খুবই খারাপ হল। এক অনাকাঙ্ক্ষিত হাহাকারে ভরে উঠল অন্তর। আমার আচরণে পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করল। আমি আর আগের মত কথা বলি না, হাসি না এমনকি খাওয়া দাওয়ার প্রতিও তেমন খেয়াল রাখি না। ব্যাপারটি ধরা পড়ল আমার মমতাময়ী মায়ের চোখে। আমার মন খারাপ দেখে তিনি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। তিনি আব্বুকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঈদের ঠিক তিন দিন আগে খাসি কেনার ব্যাপারে রাজি করলেন। খবরটা জানতে পেরে আনন্দে লফিয়ে উঠল আমার হৃদয়। কিন্তু মাত্র তিন দিন আগে তো খাসি পাওয়া সম্ভব নয়। আব্বু শহরের প্রায় সকল কসাইয়ের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখলেন যে, এ সময় কোথাও জ্যান্ত খাসি মিলবে না– মিলতে পারে খাসির মাংস। আবার আমার মনে

দুঃখের ছোঁয়া লাগতে শুরু করল। এমন সময় দেশের বাড়ি থেকে আমার মেজো কাকার মেজো ছেলে আসল আমাদের বাসায়। নাম তার কুদ্দুস। সে এক সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী যুবক। যেকোন প্রকারের কঠিন কাজ তার দৃঢ় হাতের স্পর্শে খুব সহজ হয়ে উঠে। তো যাই হোক ঈদের তিন দিন আগে এমন দুঃসহ মুহূর্তে আমার সাহসী ভাইটিকে দেখে আমার মনে আশার আলো জ্বলে উঠল। আর যাই হোক কুদ্দুস ভাই আমার এ সমস্যার কথা শুনলে একটা না একটা সমাধান খুঁজে বের করবেনই। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি কুদ্দুস ভাইকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললাম। তিনি সব শুনে আমাকে একটা আশার কথা শুনালেন। বললেন গ্রামের বাড়িতে ঈদের একদিন আগেও খাসি পাওয়া সম্ভব। তিনি আমাকে পাখি ভাই নামে এক লোকের কথা জানালেন যিনি খাসির ব্যবসা করে। কথাটা শোনামাত্র আমার চোখে মুখে আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে মনে হল কুদ্দুস ভাই বুঝি আমার সমস্যার সমাধান দিতে ফেরেশতা হিসেবে স্বর্গ থেকে হাজির হয়েছেন। তো আমি আর দেরী না করে আম্মু আব্বুর মতামত নিয়ে ঐ দিন বিকেলেই কুদ্দুস ভাইয়ের সাথে দেশের বাড়ি রওনা করলাম। কিছু অংশ রিক্সায়, কিছুটা পথ ট্রলারে আর বাকিটা পায়ে হেঁটে অবশেষে পৌছলাম কুদ্দুস ভাইদের বাড়িতে। পথে আমাদের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কুদ্দুস ভাইয়ের আব্বা মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। তার বিধবা আম্মা, ছোট চার বোন, বড় এক ভাই ও তাকে নিয়ে তাদের পরিবার। আমাকে দেখে তাদের পরিবারের সবাই খুশি হল। পরের দিন সকালবেলা আমি ও কুদ্দুস ভাই রওনা করলাম পাখি ভাইদের বাড়ির উদ্দেশে। তাদের বাড়ি থেকে পাখি ভাইদের বাড়ি প্রায় ১০ মাইলের রাস্তা। ওখানে আবার রিক্সা চলে না– পায়ে হেঁটেই যেতে হয়। কি আর করা আমরা দুইজন হাঁটা শুরু করলাম এবং এক সময় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হাজির হলাম পাখি ভাইদের বাড়িতে। পাখি ভাইয়ের সাথে খাসি কেনার ব্যাপারে কথা হল কুদ্দুস ভাইয়ের। এক পর্যায়ে পাখি ভাই আমাকে ও কুদ্দুস ভাইকে মাঠে নিয়ে গেল খাসি দেখাতে। সবগুলো দেখে আমার একটা কালো রঙের খাসি পছন্দ হল। খাসিটা বেশ মোটাতাজা, শিং দু'টো বড় বড় এবং দেহটা লম্বাটে। এরপর শুরু হল দরদামের পালা। খাসিওয়ালা দাবি করছে সাড়ে তিন হাজার টাকা। কিন্তু আমরা তো এত দাম দিয়ে খাসি কিনব না। অবশেষে কুদ্দুস ভাই পাখি ভাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আড়াই হাজার টাকায় খাসিটা খরিদ করল। তখন আমার যে কি আনন্দ হচ্ছিল তা বুঝিয়ে বলা সত্যিই মুশকিল। আমি খাসির গলার দড়িটা ধরে একা একাই হাঁটা শুরু করলাম। যেন এটা কেনার ব্যাপারে সমস্ত কৃতিত্বটাই আমার। তো যাই হোক আমরা দুই ভাই খাসিটা নিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা শুরু করলাম। কিছু দূর আসার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলাম আমরা। তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় অপরাহ্ন। আমরা দু'জনই রোযা থাকায় খাওয়া-দাওয়ার কোন ঝামেলা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে আমরা যখন তালুকদার হাট নামক এক স্থানে পৌছলাম তখন মাগরিবের আযান শোনা যাচ্ছিল। এত হাঁটাহাটি, তার উপর আবার রোযা– সব মিলে আমাদের প্রাণ তখন যায় আর আসে। কুদ্দুস ভাই খাসিটাকে তাড়াতাড়ি একটা পুলের সাথে বেঁধে রেখে আমাকে নিয়ে ঢুকল ওখানকার একটি হোটেলে। হোটেলটি অল্পের মধ্যে গুছানো। সামনের দিকে রয়েছে গুটিকয়েক চেয়ার আর পেছনের দিকে রয়েছে পুরনো কয়েকটি টুল ও টেবিল। এই ইফতারের সময় হোটেলটিতে রয়েছে উপচে পড়া ভিড়। আমি কুদ্দুস ভাইয়ের পাশে কাঠের একটি টুলে বসলাম এবং পানি দিয়ে রোজা ছাড়লাম। কুদ্দুস ভাই দুই বাটি পিঁয়াজু আর মুড়ির অর্ডার দিলেন। পিঁয়াজুগুলো ছোট ছিল কিন্তু ওগুলোর স্বাদ আমার কাছে অসাধারণ লেগেছিল হয়ত পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকার কারণেই এমনটি ঘটেছিল। ইফতার শেষে আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম। আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে রাতের গভীরতা। চারিদিক একেবারে নীরব ও নিথর। আমরা হেঁটে চলেছি মাঠের পর মাঠ। ক্ষেতের পর ক্ষেত। দূরের ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গল থেকে ভেসে আসা বিচিত্র সব সুর আমার বুকে আত-

ঙ্কের কম্পন সৃষ্টি করছে। আমাদের কাছে কোন টর্চ লাইটও নেই যাতে একটু সাহায্য হতে পারে। ভয়ে আমার হার্টবিট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমস্ত দেহ শিরশির করে উঠছে। শরীরের সকল পশম দাঁড়িয়ে গিয়ে এক ভয়ার্ত অনুভূতি সৃষ্টি করছে। কুদ্দুস ভাই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি ভয় পাচ্ছি কারণ মাঝে মাঝে আমি তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছিলাম। কুদ্দুস ভাই তখন আমাকে কাঁধে চড়ালেন এবং হাতে তুলে নিলেন খাসির দড়িটা। তারপর কখন যে আমি বাড়ি চলে আসলাম তা বুঝে উঠতে পারলাম না কারণ কাঁধে ওঠার পর থেকে সমস্তটা পথ আমি ভয়ে চোখ বুজে ছিলাম। তো শেষমেষ খাসিটা নিয়ে তার পরের দিন সকালে আমরা দু'ভাই আমাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা করলাম এবং পৌছলাম ঠিক দুপুর বেলায়। আম্মু তো মাত্র আড়াই হাজার টাকায় এত বড় খাসি কিনেছি দেখে রীতিমত অবাক হলেন। অবশেষে বেশ আনন্দের মধ্যেই কাটালাম সেবারের ঈদুল ফিত্‌র। তার পরের ঈদগুলোতেও আমরা খাসি কিনেছিলাম কিন্তু গ্রামের বাড়িতে গিয়ে খাসি কিনে আনার সেই ঘটনাটি আমার হৃদয়ে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে যা আজও আমার মনকে নাড়া দেয়।

বুদ্ধির ঢেঁকি

সৈয়দ মাহমুদুল মুদ্দসির
কলেজ নম্বর : ৪৮৭
শ্রেণী : দশম (দিবা)

এখনি ২৪০৮ সাল চলছে। এই তো কিছুদিন আগে বাবার লাইব্রেরি রুমে একটা বই পেলাম। বইটি অনেক পুরানো। আমার বাবা খুব সৌখিন মানুষ। আমার মতই তার একটি প্রিয় শখ হল, পুরানো দিনের বই জমানো ও পড়া। বাবা তার বইয়ে কাউকে হাত দিতে দেন না। আজ বাবা বাড়ি নেই। অফিসের কাজে সিলেট গেছেন। ফিরতে দু' তিনদিন লাগবে। সে সুযোগে চলে এলাম বাবার লাইব্রেরিতে। খুঁজতে খুঁজতেই পেয়ে গেলাম বইটা। বইটির ছাপা খুব পুরানো, অনেক পুরানো অক্ষর, প্রায় কিছুই পড়া যায় না। বইটা নিয়ে চলে গেলাম স্টাডিরুমে। পাতা হলুদ হয়ে গেছে বইয়ের। রীজার মেশিনের নিচে বইটি রাখার পর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করল বইয়ের ছাপা। পড়তে শুরু করলাম বইটা। বইয়ের প্রকাশকাল লেখা রয়েছে আগস্ট, ২০০১ অর্থাৎ বইটি প্রায় ৩০০ বছর আগেকার। বইটির নাম "রবিন ও তার বিচ্ছু বন্ধুরা"। বইটির নাম পড়েই আমার কেমন খটকা লাগল। মানুষ কিভাবে বিচ্ছু হতে পারে? আর্শ্চয! বিচ্ছু ও মানুষের গড়ন ও আকৃতিতে অনেক ব্যবধান। তবে কি তখনকার মানুষ রূপ বদলাতে পারত? মানুষ থেকে বিচ্ছুতে রূপান্তর হওয়ার দৃশ্য কল্পনা করতেই গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। যা হোক, বইটা পড়ে জানতে পারলাম, রবিন ও তার বন্ধুরা একদল ডাকাতের কার্যকলাপ জানতে পারে। তারা ডাকাতদের অনুসরণ করে তাদের আস্তানা বের করে এবং শেষ পর্যায়ে ডাকাতদের ধরিয়ে দেয় পুলিশের কাছে। কিন্তু বইটির অনেক কিছু কেমন একটু-না-একটু নয় প্রচণ্ড অদ্ভুত মনে হল আমার কাছে। বইটির এক জায়গায় লেখা আছে জর্দাওয়ালা পান খেয়ে রবিনের বন্ধুর মাথা বনবন করে ঘুরতে লাগল। মানুষের মাথা কিভাবে বনবন করে ঘোরে, তা ভাবতেই নিজের অজান্তেই আমি শিউরে উঠলাম।

আর এক জায়গায় লেখা রয়েছে এবারও পরীক্ষায় রবিন ডাব্বা মেরেছে। এই ডাব্বা মারা আবার কি বস্তু? কবিতায় ডাব্বা হুঁকা সর্ম্পকে পড়েছি। এটি নারকেলের খোল দিয়ে তৈরী এক রকম হুঁকা যা দিয়ে নাকি তামাক সেবন করা যায়। কিন্তু পরীক্ষায় ডাব্বা মারা কি জিনিস তা আমি ভেবে পেলাম না। তবে যতদূর ভাবতে পেরেছি, তা থেকে মনে হয় পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করাই ডাব্বা মারা। গল্পের এক জায়গায় রয়েছে গণিতে ডাবল জিরো পাওয়ায় টিচার রবিনকে বলছে, "কত গাধা পিটিয়ে মানুষ করলাম, কিন্তু তবু তোকে পারলাম না"।

এই গাধা পিটিয়ে মানুষ করাটা অতি আশ্চর্যের ব্যাপার। গাধাকে পিটিয়ে তখনকার মানুষে মানুষ বানাতে পারত? বাহ, কি বুদ্ধি আর প্রযুক্তিই না ছিল তখনকার মানুষের। ভাবলাম, একটা গাধা কিনে আমিও পিটিয়ে মানুষ করাটা একবার ট্রাই করে দেখব। যাই হোক গল্পে পড়লাম রবিন তার বাবার চশমা ভেঙে ফেলায় বাবা তার দিকে চোখ পাকিয়ে বড় বড় করে তাকিয়ে বলেছিল কান টেনে দশ হাত লম্বা করে দিব। আবার বাবার কথা শুনে রবিন ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। মানুষ দু'চোখ পাকিয়ে কিভাবে তাকাতে পারে তা আমার মাথায় কিছুতেই এল না। আর কান টেনে দশ হাত লম্বা করাটাও খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। তাহলে কি তখনকার মানুষের কান রবারের তৈরী ছিল যে টানলেই দশ হাত লম্বা হয়ে যাবে? আবার আমি যতটুকু জানি ভয় পেলে মানুষের আকারের পরিব-তন ঘটে না। কিন্তু রবিন কিভাবে ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল? তাহলে কি ভয় পেলে তখনকার মানুষের ঠাণ্ডা লাগত আর তাপ অপসারণের ফলে তাদের আকৃতি ছোট হয়ে যেত? হতে পারে, ওগুলো ভাবা আমার কাজ নয়। গল্পে আরেক জায়গায় লেখা আছে, ডাকাতদের অনুসরণ করতে গিয়ে তারা (রবিন ও তার বন্ধুরা) ধরা পড়ে গেল। সে ছাড়া পাবার জন্য ডাকাতের হাতে কামড় দিলে ডাকাত ছেলেটার নাক বরাবর এক ঘুষি মারল। আমি বুঝতে পারলাম না যে ঐ বোম্বাই ঘুষিটা কি ধরনের ঘুষি। শুনেছি ইন্ডিয়াতে বোম্বে নামে এক শহর আছে। বোধহয় সেখানকার লোকেরাই এই ঘুষি মারে। আরও লেখা আছে যে, ঘুষি খেয়ে ছেলেটা চোখে সরষের ফুল দেখছিল। চোখে সরষের ফুল দেখা, তাও ঘুষি খাওয়ার পরই সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার। বনের মধ্যে সরষের ফুল এল কোথা থেকে? উল্লেখ্য ডাকাতদের আস্তানা ছিল বনের মধ্যে। তাহলে নিশ্চয়ই ঘুষি খাওয়ার পর তখনকার মানুষ এমনিতেই সরষের ফুল দেখতে থাকত।

এগুলো যতটা না অবাস্তব তার চেয়ে অনেক বেশি অবাস্তব লেগেছে আমার কাছে গল্পের শেষের একটি ঘটনা। গল্পের শেষে লেখা রয়েছে, ডাকাতদের পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিয়ে রবিন ও তার বন্ধুরা আনন্দে আটখানা হয়ে লাফাতে লাগল। একজন মানুষ দু'ভাগ হওয়াটাই অসম্ভব ব্যাপার , আর আট ভাগ হয়ে লাফানো তো কল্পনাও করা যায় না! রবিন ও তার বন্ধুরা কিভাবে এটাকে সম্ভব করল তা আমার মাথায় কোনভাবেই ঢুকল না। নিশ্চয়ই তারা কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। গল্পের বইটি শেষ করে আমি বাবার লাইব্রেরিতে রেখে ভাবলাম তখনকার মানুষের নিশ্চয়ই অনেক রকম অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তাদের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাই তার প্রমাণ। বন্ধুদের একথা বলব ভেবেও মাথা থেকে চিন্তাটা তাড়িয়ে দিলাম আমাকে পাগল বলতে পারে এই ভয়ে। তাই তোমাদের বললাম পাঠক ভাইয়েরা, দয়া করে তোমরা আমাকে পাগল ভেবো না!

অগস্ত্য যাত্রা

আবদুল্লাহ রুয়াঈম
কলেজ নম্বর : ৬৯১৫
শ্রেণী : নবম-বিজ্ঞান

তাকে আজ খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছে! সত্যিই তাকে আজ ভীষণ অদ্ভুত লাগছে! সেটা সে নিজেও বুঝতে পারছে। পরিচিত কেউ আজ তাকে দেখলে চিনতে পারবে না, চেনার কথাও নয়।

কোথায় তার সেভমণ্ডিত মুখমণ্ডল! দাড়ি গোঁফের জঙ্গল! আজ একেবারে সাফ। অর্থাৎ, ক্লীন শেভড। কাবলি, কোটি পায়জামা আর হাওয়াই স্যান্ডেলের বদলে আজ তার পরনে নীল ফ্লানেলের শার্ট, জিন্সের ফুলপ্যান্ট আর আগাগোড়া চকচকে দামী চকলেট রঙের জুতো। রং বেশ ফর্সা হওয়া সত্ত্বেও খাঁটি ইউরোপিয়ান ভেবে সবাই যেন ভুল করে। তার উপর চোখে আবার নীল লেন্স। ঠিক যেন হলিউডের নায়ক

মাইকেল ডগলাস! কে বুঝবে, লোকটা ছদ্মবেশী?

নিজের আসল নাম পাসপোর্টে লিখলে আর মার্কিন মুল্লুকে যাওয়া লাগতো না। কারণ এই পুলিশি রাষ্ট্রে কোন যাত্রীর পাসপোর্টে মুসলমানের নাম দেখলেই সন্ত্রাসী সন্দেহে তাকে আটকে দেয়া হয়। ভাবখানা এমন যে, দুনিয়াসুদ্ধ সব মুসলমানই সন্ত্রাসী! অগত্যা সাঈদ হুসেইন সমরুকে ওয়াল্ট রিচমন্ড নাম নিয়ে প্লেনে উঠতে হয়েছে। আজ সে অবশ্য সন্ত্রাস ঘটাতেই যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে মার্কিন দখলদারিত্ব মানুষ সইবে কেন? তাদের বিশ্ব সন্ত্রাসের দাঁতভাঙা জবাব দিতেই সমরুর এই মিশন।

আট সদস্যের দলে নেতৃত্ব দিচ্ছে সমরু। সে নিজে এবং আবদুল্লাহ্ নামে এক মিশরীয় পাইলট হিসেবে দলে রয়েছে। সমরু জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। সেখান থেকে চোখ সরিয়ে ঘড়ি দেখল। এখনও ঘন্টা খানেক বাকি। তাদের ওপর নির্দেশ আছে যে, আটলান্টিক পার হওয়া মাত্রই ককপিটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে হবে। ককপিটের দুই গার্ডকে ঘায়েল করার জন্য তাদের সাথে করমর্দন করতে বসে আছে দুজন আল-কায়েদা সদস্য। তাদের একজন হচ্ছে মিশরীয় বেদুঈন আবদুল্লাহ। তারা অবশ্য করমর্দন করতে আসেনি। ঐ দু'জনের কাছে রয়েছে দুটি বল পয়েন্ট কলম যার নিব অত্যন্ত সূঁচালো এবং বিষ মাখানো। সবাইকে জায়গামত দেখে রিলাক্সড মুডে চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিল সমরু। আটলান্টিক পার হয়েছে কিনা এটা বোঝার জন্য তাদেরকে যাতে কষ্ট করতে না হয় সে জন্য তাদের ঘড়িতে বিশেষ ওয়ারলেস লাগানো রয়েছে। আটলান্টিক পার হলেই সেটা বেজে উঠবে।

সমরু একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘড়ির মৃদু অ্যালার্ম শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই দেখল ককপিটের গার্ড দু'জন মাটিতে পড়ে আছে। তার দলের অন্য সবাই যার যার পজিশন নিয়ে নিয়েছে। সবার হাতেই তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি একটা করে বড়সড় বাঁশের কলম, ছুরি, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র! বাঁশের তৈরি বলেই বিমানবন্দরের চেকিং-এ ধরা পড়েনি। দেখতে অনেকটা বিশাল কলমের মত।

সমরু গলা খাঁকারি দিয়ে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে শুরু করল, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাদের জানানো যাচ্ছে যে, আমরা এই বিমানটি অর্থাৎ, ফ্লাইট নম্বর ০০৭৫৭ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি।' বলতে বলতেই ককপিট থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনা হল দুই পাইলটকে। সমরু আবার শুরু করল, 'আমাদের কাছে বিশেষভাবে তৈরি ১৭২টি প্যারাসুট আছে। বিমানের পাইলট, গার্ড এবং ক্রুসহ আপনারা মোট ১৭১ জন। শিগগিরই এগুলো আপনাদের পরিয়ে দেয়া হবে। আপনাদেরকে সানফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে নামিয়ে দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। কোন সমভূমির উপর আপনাদেরকে জাম্প করতে হবে। আশা করি, আপনারা সকলেই সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় নামতে পারবেন।' মৃদু গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। সমরু ফিরে ককপিটের দিকে হাঁটা দিতে যাবে, এমন সময় আরোহীদের একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল,'আপনারা কারা? আমাদের নামিয়ে দিতে চান কেন?' সমরু ঘুরে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'আমরা কারা তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে সব যাত্রীকে নামিয়ে দিতে হচ্ছে। আপনি বসুন।'

'না বসব না। আপনাকে বলতে হবে বিশেষ উদ্দেশ্যটা কি?' উদ্ধত কণ্ঠে বলল আরোহীটি।

'আপনাকে জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।' বিরক্ত হলেও শান্তকণ্ঠে জবাব দিল সমরু। তারপর অস্ত্রধারীদের একজনকে নির্দেশ দিল, 'ওনাকে ঘাড় ধরে বসাও আর সবাইকে প্যারাস্যুট পরিয়ে দাও।'

ককপিটের হাল ধরেছে সমরু আর আবদুল্লাহ। সমরু ককপিটে ঢোকার প্রায় আধাঘন্টা পর ঘড়িতে লাগানো ওয়্যারলেস বেজে উঠল। সেটা অন করতেই একটা গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কণ্ঠস্বরটা কমান্ডার আইমান আল জাওয়ারহির।

'চীফ কলিং। সবকিছু ঠিকঠাক? ওভার।'

"ইয়েস স্যার, এভরিথিং ইজ ওকে। ওভার। "সমরুর উত্তর" গুড। ঠিক পনের মিনিট পর তোমরা একটা সমভূমির ওপর আসবে। জায়গাটার নাম ল্যানোস। সেখানে সব যাত্রীকে নামিয়ে দাও। কানাডা-আমেরিকার বর্ডার পার হলে আমি আবার কল করব। ওভার অ্যান্ড আউট।'

পনের মিনিট পর সমরু ককপিট থেকে বেরিয়ে যাত্রীদের বলল,'আপনারা এখনই লাইন করুন। দরজা খোলামাত্র একে একে লাফ দেবেন। যত আগে নামবেন ততই ভাল। কিন্তু খবরদার, কেউ কোন চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। আমরা সবাইকেই অক্ষত রাখতে চাই, কিন্তু কেউ কিছু করলে আমরা অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব।'

আরো কিছুক্ষণ পর একজন অস্ত্রধারী এসে বলল, 'কমান্ডার, সবাইকে নামিয়ে দিয়েছি। ব্ল্যাক বক্সও নষ্ট করা হয়েছে। এখন আমরা কি করব?'

'আল্লাহ আল্লাহ কর। নিজের জন্য, বাবা-মা, আত্মীয় -স্বজনের জন্য দোয়া কর। আমাদের জন্য আরো বেশি করে কর, যেন পরকালে বেহেশতে দেখা হয়।' সমরুর নির্লিপ্ত জবাব।

লোকটা মাথা নিচু করে ফিরে গেল। সমরুর মনে হল যেন একটু কাঁদছে! কাঁদুক! কেঁদে যদি পৃথিবীর পাপগুলো ক্ষমা করিয়ে নেয়া যায় স্রষ্টার কাছ থেকে, তাহলে মন্দ কী? কাঁদুক।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতেই হুইল ঘোরাতে লাগল পাহাড়ী আফগান। মাথা ঠিক নেই, কী বিভীষিকাময়! জানে সে, এগিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে।

আফগানিস্তানে তথাকথিত 'অপারেশন ইনফিনিট জাস্টিস' নামে একটি সামরিক অভিযান চালানো হয়। যাতে ওসামা বিন লাদেন নামক কথিত 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী'কে ধরার নামে বোমা ফেলে হাজার খানেক নিরীহ মানুষের মরণ ঘটায়। যখন মানুষ মারার হিড়িক পড়ে গেল, তখন থেকে সেই 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী'! পৃথিবীর ছয় শ কোটি মানুষের রক্ত শুষে খাওয়া শোষক দেশটিকে হুমকি দিয়ে আসছিল যে, তাদের দেশে হামলা চালানো হবে, নিউক্লিয়ার বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে, এসব বলে। দেশটিতে তখন কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘুম হারাম করে দিনরাত পাহারা দেয় নিরাপত্তারক্ষীরা। কিন্তু তারা যন্ত্র নয়, মানুষ। তাদেরও ক্লান্তি আছে। অবিরতভাবে পাহারা দিয়ে তারা বিরক্ত হয়ে কাজে ঢিলা দিতে শুরু করল। সন্ত্রাসীরা সেই সুযোগ ছাড়বে কেন? 'Make hay while the sun shine' প্রবাদটি হল, 'ঝোপ বুঝে কোপ মার।' নিরাপত্তাকর্মীদের এসব হুমকিকে স্রেফ প্রপাগাণ্ডা ভাবাকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য সমরুদের মত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া আরেক দল সন্ত্রাসী পেন্টাগন ভবনের দিকে বিমান নিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে।

সমরুর গন্তব্য হোয়াইট হাউস। আর এক মিনিট দূর। মিশরীয় বেদুঈন আর পাহাড়ী আফগান বিমানের নাক ভবনটির দিকে ঘুরিয়ে নিতেই নিচ থেকে গোলাগুলি আরম্ভ হয়ে গেল। আবদুল্লাহ মুখ বাঁকিয়ে বলল, এই গর্দভরা এখন গোলাগুলি শুরু করেছে। আরে এতক্ষণ তোদের ফাঁকি দিয়ে আসলাম, ধরতে পারলি না। আর এখন এই ফুটুস ফাটুস করে দু চারটে গুলি মেরে থামিয়ে দিবি ভাবছিস! গোরুর দল!,

নিরাপত্তারক্ষীরা অল্পক্ষণের মধ্যে স্ট্রিংগার, কামান, ট্যাংক, মেশিনগান যা পারল বের করে এনে মারতে শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে।

অসম্ভব দক্ষতায় দুই বৈমানিক কানাডা ও আমেরিকা সীমান্ত নির্বিঘ্নে পেরিয়ে যায়। ওয়্যারলেসে নির্দেশনা দেয়া হল কোন দিকে কত ডিগ্রী ঘুরে কত গতিতে কীভাবে যেতে হবে। নিদের্শনা মোতাবেক কাজ করে তারা এখন কর্মফল ভোগ করার অপেক্ষায়। আরো অনেকখানি এগিয়ে গেল বিমান। বিমানের লেজ স্ট্রিংগারের গোলায় বিধ্বস্ত হয়েছে টের পেল সমরু। কিন্তু তাতে কী? আর কয়েক সেকেন্ড। তারপর কি হবে জানে না সে। শেষবারের মত সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করল সে। আবদুল্লাহর মুখে ক্রূর হাসি। দেয়াল স্পর্শ করল বিমানের নাক। এগিয়ে চলেছে লেজবিহীন বোয়িং-৭৫৭। এগিয়ে যাচ্ছে সাঈদ হুসেইন সমরু এক অনিশ্চিত, অন্তহীন, অন্ধকার জগতের পথে। প্রবেশ করতে চলেছে স্বর্গ অথবা নরকে।

২১ বছর পর

সিহাম বিন মোস্তাফিজ
কলেজ নম্বর : ৬৯৪৮
শ্রেণী : নবম, বিজ্ঞান

এখন ২০২৩ সাল, মানুষের জীবনকে একেবারেই সহজ করে দিয়েছে বিজ্ঞান। এখন বিজ্ঞানের এতটাই উন্নতি হয়েছে যে মানুষ টাইম মেশিনের[১] সাহায্যে অতীতে বিংবা ভবিষ্যতে খুব সহজেই পাড়ি জমাতে পারে। কিন্তু তবুও জ্ঞানপিপাসু মানুষের জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা এক বিন্দুও কমেনি। আর যারা দিনরাতই গবেষণা করেন তাদের তো নয়ই। এরকম এক মানুষ হলেন ডঃ রইসুল। তিনি হলেন বর্তমান বিশ্বের একজন নামী পুরকীর্তি গবেষক। তিনি বেশ কিছু দিন ধরে এক নতুন পুরাকীর্তি নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি পুরাকীর্তিটি খুঁজে পেয়েছেন বাংলাদেশের রাজেন্দ্রপুরে। এবং তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন যে, পুরাকীর্তিটি ১৯১৪ সালের মাঝামাঝি সময় ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ এখন থেকে বহু বছর আগেই কীর্তিটি মাটির নিচে চাপা পড়ে। ডঃ রইসুল সেই পুরাকীর্তির কাছেই একটি স্কেলে[২] থাকেন।

আজ ৩০.৯.৪৪৫৫ তারিখ। রইসুল পুরাকীর্তির ভেতর ১৯টি মানব কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছেন। এবং খুব ঘাবড়ে গেছেন। তিনি এই ১৯টি কঙ্কাল নিয়ে খুব চিন্তিত। তাঁর সাথে এ মুর্হূতে আরও আছে তার সেক্রেটারী ডঃ আলম। ডঃ আলম মোটামুটি ঘাবড়ে গেছেন। কারণ তিনি এর আগে এরকম পরিস্থিতিতে পড়েন নি। যাই হোক দুজনই কিছুক্ষণের মধ্যে সামলে উঠলেন। ডঃ রইসুল স্কেলিটন টেস্টার দ্বারা[৩] কঙ্কালগুলোকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে পরীক্ষা করার পর তিনি ডঃ আলমকে ডাকলেন।

আলম : জী, স্যার আমাকে ডেকেছেন?

রইসুল : হ্যাঁ, শোন, তোমাকে ডেকেছি কঙ্কালগুলো সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছি তা বলার জন্য। তুমি অবাক হবে যে, প্রতিটা কঙ্কাল অর্থাৎ মানুষগুলোর মৃত্যুর ব্যবধান ঠিক ২১ বছর এবং সবচেয়ে অবাক বিষয় হল শেষের কঙ্কালটা ডঃ জনসনের, যিনি পুরাকীর্তি গবেষক ছিলেন এবং ১৮৯২ সালে নিখোঁজ হন।

আলম : কী বলছেন স্যার?

রইসুল : তুমি কি জানো, উনি কোন একটি পুরাকীর্তি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন?

আলম : স্যার আমার খুব ভয় লাগছে। স্যার প্লিজ চলুন আমরা এখান থেকে চলে যাই।

রইসুল : ভীতুর মত কথা বলবে না। আমি একদম পছন্দ করিনা। তুমি এসটিতে[৪] একটা ইনফরমেশন দাও যে আমার একটা টাইম মেশিন লাগবে।

খবর দেয়ার ২৫ মিনিট পরেই রইসুলের কাছে চলে এলো টাইম মেশিন। রইসুল টাইম মেশিনের কম্পিউটারে ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। এবং মেশিনের ভেতর বসে অক্সিজেন মাস্ক পরে নিলেন।

আলম : স্যার আমি আপনার সাথে আসি? আমি আপনাকে একা ছাড়তে সাহস পাচ্ছি না।

রইসুল : দূর বোকা। আমি তো কালকের মধ্যেই ফিরে আসব। আর তুমি যেই ভীতু, তোমাকে নিয়ে গেলে তুমি আবার কোন ঝামেলা বাধাবে। তার চেয়ে তুমি এখানেই থাকো। দেখোতো আর একটু হলেই তো প্রায় থেমেই গিয়েছিলাম।

আলম : কেন স্যার? কী হয়েছে?

রইসুল : দেখোতে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাগটা তো বাইরেই আছে, জলদি ভেতরে দিয়ে যাও।

আলম ব্যাগ ভেতরে রেখে বাইরে বের হয়ে এল এবং রইসুলকে স্যালুট দিল, রইসুল মাথা নাড়লেন এবং টাইম মেশিনের দরজা বন্ধের জন্য বোতাম টিপলেন। আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আলম রইসুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। না জানি কোন অজানা কারণে আলমের চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করল। সে প্রায় এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে রইসুল টাইম মেশিনের ভেতর কম্পিউটারের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে, তিনি খুব দ্রুত একের পর এক বছর পার হয়ে যাচ্ছেন। প্রায় ৩০ সেকেন্ড পর রইসুল পৌছলেন ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসের ০১ তারিখে। রইসুল টাইম মেশিনের দরজা খুললেন। এবং তাঁর সামনে দেখতে পেলেন সেই পুরাকীর্তি, যেটা তিনি খুঁজে পেয়েছেন ২০২৩ সালে। কিন্তু সেই পুরাকীর্তি আর তার সামনের পুরাকীর্তির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। রইসুল কিছুক্ষণ বাড়িটার চারপাশে ঘুরলেন এবং কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে মনস্থ করলেন যে, টাইম মেশিনটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি তার টাইম মেশিনটাকে মেক স্মলার[৫] দ্বারা ছোট করে ফেললেন। এরপর টাইম মেশিনটাকে তার ব্যাগে ভরে নিলেন। কিন্তু ব্যাগে টাইম মেশিনটাকে ঢুকানোর সময় দেখলেন যে, তিনি ভুল করে তার এফ মেলটা[৬] নিয়ে এসেছেন। যাই হোক তিনি এবার কীর্তিটার ভেতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই আবিষ্কার করলেন এক অন্ধকার বিশ্ব যেখানে একটি মাত্র শব্দ হচ্ছে। আর সেটা হল তার নিশ্বাসের শব্দ। কিছুক্ষণ পর রইসুল তার ব্যাগ থেকে টর্চলাইট বের করলেন এবং তা জ্বেলে দিলেন। এরপর তিনি অগ্রসর হলেন। তিনি প্রায় পুরো বাড়িটাই ঘুরে দেখলেন, কিন্তু সেই কঙ্কালগুলোর কোন হদিসই পেলোন না । কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর তিনি দোতালার একটা ঘরে বসলেন এবং এই কীর্তির যে মালিক তাঁর নাম কিভাবে বের করা যায় তাই ভাবতে লাগলেন। বসে থাকতে থাকতে রইসুল ঘুমিয়ে পড়লেন। তার ঘুম ভাঙল এফমেলের শব্দে। তিনি ঘড়ি দেখলেন। ১২টা বেজে ১মিনিট। তার হঠাৎ করেই মনে হল এখানে কেমন করেই বা

এফমেলে কল আসবে। তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে এফমেলটা অন করে কানের কাছে ধরলেন। শুনতে পেলেন একটি ভারি কণ্ঠস্বর।

ঃ কেমন আছেন ডঃ রইসুল?

- ভাল আছি।

ঃ কেনই বা মিথ্যে বলছেন?

- কোথায়?

ঃ কেন আপনি কি ভয়ে ঘামছেন না?

- আচ্ছা বলুনতো, আপনি কে?

ঃ ভাবতে পারেন আমি একজন সাহায্যকারী। আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

- বোধহয় আপনার সাহায্য আমার দরকার নেই।

ঃ আছে ডঃ রইসুল। আপনি আপনার যন্ত্রপাতি দিয়ে যা জানতে পারেননি, আমি তার থেকেও বেশি জানি। আপনাকে কি বলব?

- প্লিজ বলুন তো আপনি কে? এই মধ্যরাতে.........!

ঃ হা.....হা....... । আপনি কি খেয়াল করেছেন আপনার পুরো শরীর ঘামে একেবারে ভিজে গেছে?

- আঃ, হ্যাঁ ......হ্যাঁ....... । কিন্তু কে আপনি?

ঃ আপনার বাঁ গালে একটা মশা রক্ত খাচ্ছে।

- ইয়ে....

ঃ পুরাতত্ত্ব নিয়ে আপনি গবেষণা করে যতই সাফল্য লাভ করুন না কেন, আপনি এই বিষয়ে আমার সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। কারণ এই পুরাকীর্তির সব কিছুই আমি জানি।

- আপনি কী কী জানেন?

ঃ অ-নে-ক কিছু। এ বাড়িটা কার জানেন? আপনার পেছনের দেয়ালে যার ছবি টাঙানো আছে তার।

রইসুল অবাক হয়ে দেখলেন তার পেছনের দেয়ালে একটি ছবি টাঙানো আছে। রইসুল একটু ঘাবড়ে গেলেন কারণ একটু আগেও সেটা ছিল না।

- এনার নাম কি?

ঃ সূর্যসেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

- ইনি কত বছর আগে মারা গেছেন?

ঃ ছয়শ পঁয়ত্রিশ বছর আগে।

- সত্যি?

ঃ অবশ্যই।

- আপনার কথা কীভাবে বিশ্বাস করি?

ঃ সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার।

- ধন্যবাদ।

ঃ রইসুল সাহেব, আপনি তো প্রায় আট ঘণ্টা হয় এই বাড়িতে আছেন? কিছু টের পেয়েছেন?

- হ্যাঁ প্রচুর ইঁদুর রয়েছে। সাপটাপও থাকতে পারে।

ঃ না, ওগুলো ইঁদুর নয়, একটু মনোযোগ দিন। কিছু শুনতে পাচ্ছেন?

- হ্যাঁ ,নূপুরের শব্দ।

ঃ আপনি একটু এগিয়ে যান। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠুন। বাম পাশের ঘরটা পার হয়ে আর একটু এগিয়ে যান। সামনের দিকে। তার পর একটা ঘর, আস্তে করে দরজাটা খুলে ফেলুন শোনা যাচ্ছে?

- জ্বী।

ঃ আরো একটু এগিয়ে যান, হ্যাঁ সামনে বড় ঘরটাই। এবার দরজাটা খুলে দেখুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

- প্রচুর ধোঁয়া ঘরের ভেতর।

ঃ হ্যাঁ, একটু ভালোভাবে তাকিয়ে থাকুন।

- হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, ও মাই গড। এত মেয়ে এলো কোথা থেকে। অদ্ভুত ভঙ্গীতে নাচছে সব।

ঃ এবার আপনি ডান দিকের পথটা ধরে এগিয়ে যান। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা কুঠুরি দেখতে পাবেন। দয়া করে কোন শব্দ করবেন না। কুঠুরির ছোট দরজাটা আপনা আপনি খুলে যাবে। হ্যাঁ, এগিয়ে যান।

- একি! এসব কেন কুঠুরির ভেতর?

ঃ সাতশ বছর ধরে জমিদারী করে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার যে সোনাদানা সঞ্চয় করেছিল, সব গচ্ছিত আছে ওখানে। এই কুঠুরি নেমে গেছে মাটির অনেক নিচ পর্যন্ত। আপনি ভাবতে পারেন ওখানে কত সোনা আছে?

- আইডিয়া করতে পারছি না।

ঃ এবার বলুন ডঃ রইসুল, যে দরজাটা প্রায় সাতশ' বছর ধরে কেউ খুলতে পারছে না, এ ঘরের ভেতর কী আছে জানতে পারছে না। তা আমি আপনাকে নিমেষেই দেখিয়ে দিলাম। এতে কি আপনার উপকার হলো না?

- ধন্যবাদ আপনাকে।

ঃ আপনার পেছনে যে ঘরটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা হলরুম। আপনি অবশ্য জানেন জমিদারী চালাতে হলে অনেক কিছু করতে হয়।

- এখানে কী হতো।

ঃ দরজাটা খুলেই দেখুন।

- দরজায় তো তালা লাগানো।

ঃ অন্য দরজাগুলোতেও তালা লাগানো ছিল, তবুও খুলে গেছে, আপনি দরজার সামনে দাঁড়ান। হ্যাঁ দরজা খুলে গেছে।

- আঃ এসব কী। এগুলো মানুষের মাথা।

ঃ হ্যাঁ, এগুলো তাদেরই মাথা, যারা জমিদারী হুকুম মানতে চাইত না।

- এ তো র্বরতা!

ঃ হ্যাঁ, আপনাদের আধুনিক যুগেও তো হত্যাকাণ্ড চলছে। তবে ঠিক এভাবে নয়। অন্যভাবে। না এগিয়ে যাবেন না। অসুবিধা হবে। আপনি এঘর থেকে বের হয়ে আরও একটু সামনের দিকে এগিয়ে যান। হ্যাঁ, আরো একটু সামনে, এবার বলুন আপনি কী কিছু শুনতে পাচ্ছেন?

- হ্যাঁ, কারা যেন কাঁদছে।

ঃ হ্যাঁ কাঁদছে। প্রতিটা শাসন আমলেই কিছু কিছু মানুষকে অবরুদ্ধ করা হয়। শুধু কাঁদা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না। এরাই তারা। কেন আপনাদের সেই আধুনিক সময়েও কি তা হচ্ছে না? ডঃ রইসুল এবার আপনি ঠিক আগের জায়গায় ফিরে যান।

- কিন্তু আমি তো যেতে পারছি না। কে যেন আমাকে টেনে ধরেছে।

ঃ পেছনে তাকিয়ে দেখুন।

- না।

ঃ একবার তাকিয়ে দেখুন।

-না।

ঃ ভয় পেলেন ডঃ?

- না.....না....।

ঃ ঠিক আছে আপনি আবার হাঁটতে শুরু করুন।

- সামনে যেন কে দাঁড়িয়ে আছে।

ঃ কথা বলুন।

- কি বলব সারা দেহ তো কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা।

ঃ কাপড়টা সরাতে বলুন।

- না।

ঃ আহা বলুন।

- না, ওতো এগিয়ে আসছে।

ঃ তাহলে আপনিও পিছাতে থাকুন।

- দৌড়ে আসছে ও।

ঃ আপনিও দৌড়াতে থাকুন।

- আহা! আমি আর পারছি না।

ঃ পারতে আপনাকে হবেই! ডঃ রইসুল অন্তত এই বাড়ির শেষ ইতিহাসটা আপনাকে জানতে হবে।

- না একে আর দেখা যাচ্ছে না।

ঃ সত্যি?

- হ্যাঁ।

ঃ আপনার সামনের দেয়ালটার দিকে তাকান।

- হ্যাঁ, ধূসর একটা দেয়াল।

ঃ একটু ডানে তাকান।

- দেয়ালের উপরের দিকে একটা ফাটল।

ঃ কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

-না।

ঃ ভালভাবে দেখুন।

- হায়! গল গল করে রক্ত ঝরছে।

ঃ ওসব কাদের রক্ত জানেন?

- না।

ঃ শোষিত মানুষের ঘামগুলোই রক্ত হয়ে গেছে।

- ঐ তো ও আবার দাঁড়িয়ে আছে।
ঃ ডঃ আপনি আর এক মুহূর্ত দেরী করবেন না। দৌড়াতে থাকুন। দৌড় দৌড়
- হাহ্ -হাহ্- হাহ্ আমি-হাহ্ -আর হাহ্ -পারছি না।
ঃ পারতেই হবে আপনাকে।
- এ নাহ.... নাহ.... !
ঃ এবার থামুন ডঃ আপনার গলায় হাত দিন।
- আঃ রক্ত।
ঃ হ্যা রক্ত, ব্যথা লাগছে?
- একটু একটু।
ঃ ডঃ এবার একটু ডানে তাকান। কিছু দেখতে পাচ্ছেন?
- হ্যাঁ কারা যেন সারিবদ্ধভাবে হেঁটে যাচ্ছে?
ঃ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সকল সদস্য ওরা।
- কিন্তু ওদের হাত পা বাঁধা কেন?
ঃ পাপ।
- আমি একটু কাছে যেয়ে দেখব?
ঃ খবরদার ওরা টের পেলে অসুবিধা হবে।
- আমি এখন কি করব?
ঃ দেখুন তো কোন শব্দ শোনা যায় কিনা?
- হ্যাঁ, কে যেন শিস বাজাচ্ছে।
ঃ একটু ঘুরে দাঁড়ান।
- সেই লোকটা।
ঃ আবার দৌড়াতে শুরু করুন ড ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, দৌড়ান।
- হা-হা-হাহ্-হাহ্-হুউ-হুউ আর পারছি না। বুক ফেটে যেতে চাচ্ছে। ওহ, আর পারছি না মিঃ.....।
ঃ সূর্যসেন বন্দ্যোপাধ্যায়।
- কে-কে?
ঃ সূর্যসেন বন্দ্যোপাধ্যায়।
- অসম্ভব, আপনিতো মারা গেছেন ছয় শ পঁয়ত্রিশ বছর আগে।
ঃ সত্যি কথা।
- তাহলে?
ঃ সামনে তাকান।
- লোকটা আবারো দাঁড়িয়ে আছে।
ঃ আর কিছু?
- ও ওর মুখের কাপড়টা সরাচ্ছে।
ঃ হ্যাঁ তাকিয়ে থাকুন।
- আঃ
ঃ চিনতে পেরেছেন?

- হ্যাঁ, হ্যাঁ, সূর্যসেন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঃ হ্যাঁ।

- তাহলে আপনি কে?

ঃ আমিও সূর্যসেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

- একি করে সম্ভব?

ঃ তাতো জানি না শুধু এটুকু জানি.....।

- কি.....কি.....?

ঃ আপনি জানেন ডঃ এ বাড়ির একটা বিশেষত্ব আছে?

- বিশেষত্ব আছে কিনা জানিনা। তবে গবেষণা করে যে কি একটা বের করেছিলাম, যা খুবই রহস্যজনক।

ঃ কি সেটা?

- এ মুর্হূতে মনে করতে পারছি না।

ঃ আমি বলে দিচ্ছি। প্রতি একুশ বছর পরপর এই বাড়িতে একটা বিশেষ দিনে কোন না কোন ব্যক্তি খুন হয়।

- হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তার মানে ঐ ১৯টি কঙ্কালই হল ঐ সব মানুষের, যারা ঐ বিশেষ দিনে খুন হয়েছিল।

ঃ গুড। আজ সেই দিন ডঃ, আর সময়টাও হয়ে গেছে। তবে দুঃখের বিষয় এবার খুন হবেন আপনি ডঃ রইসুল।

ও দিকে ২০০২ সাল। ডঃ আলম সকালে ঘুম থেকে উঠেই কেন জানি পুরাকীর্তির ভেতরে চলে গেলেন। ভেতরে গিয়ে ডঃ আলম হঠাৎ কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়লেন। এরপর ডঃ আলম নিজেকে সামলে নিয়ে কিসের ধাক্কা খেয়েছেন তা দেখার জন্য যখন পিছনে ফিরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন নতুন একটি কঙ্কাল।

পরিশিষ্ট

১. টাইম মেশিন ঃ এক ধরনের মেশিন যার সাহায্যে অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে যাওয়া যায়। (কাল্পনিক)

২. স্ক্রেল ঃ কাঁচের তৈরি ঘর। যেখানে শুধু অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হয়। সেই সাথে ঐ ঘরে যে থাকবে শুধু সেই বের হতে পারবে এবং শুধু সেই ঢুকতে পারবে। (কাল্পনিক)

৩. স্কেলিটন টেস্টার ঃ এ ধরনের বিশেষ যন্ত্র যার সাহায্যে যে কোন প্রাণীর বৃত্তান্ত জানা যায়, এর জন্য প্রাণীর কঙ্কালের উপর এই যন্ত্রটা স্থাপন করতে হয় এবং এর সাথে সংযুক্ত কম্পিউটারে প্রাণীটির বৃত্তান্ত ভেসে ওঠে। (কাল্পনিক)

৪. এসটি ঃ সুপার টেলিফোন বা .০০০১ সেকেন্ডে মেসেজ পাঠাতে সক্ষম। (কাল্পনিক)

৫. মেক স্মলার ঃ এক ধরনের যন্ত্র যা দ্বারা কোন বড় বস্তুর আকৃতিকে কমিয়ে সহজে বহনযোগ্য আকৃতি প্রদান করে। (কাল্পনিক)

৬. এক মেল ঃ বর্তমান মোবাইলের অত্যাধুনিক সংস্করণ যেখানে একই সাথে ফোন, টেলিভিশন, রেডিও, গান শোনা, ছবি, চলচ্চিত্র ধারণসহ বেশ কিছু কাজ করা যায়। (কাল্পনিক)

অনিকেত আলোর সন্ধানে

সোহানা বিলকিস
প্রভাষক, বাংল বিভাগ (দিবা)

দুপুরের পড়ন্ত রোদে চারিদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ। ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে পৃথিবীটা বসে আছে চুপটি করে। চৈত্র মাসের নিদাঘ দহনে তাই মীরবাড়ির অন্দর মহল সাংসারিক কাজকর্ম চুকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিথর। উঠোনে রোদ্দুরে শুকোতে দেয়া লাকড়ি, বরই আর পাকা পাকা কমলা রঙের সুপারি। পশ্চিম দিকে রান্নাঘর, তার দাওয়ার সামনে একটা ছোট পেয়ারা গাছ। তার ছায়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে লালরঙের মোটাসোটা একটা কুকুর। একপাশে মুরগীগুলোকে বড় একটা ঝাঁপি দিয়ে ঢাকা আছে। তাদের কলরব কুকুরটার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বলে মনে হয় না। রান্নাঘরের দাওয়ায় খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে শুয়ে আছে এ বাড়ির সার্বক্ষণিক কাজের মানুষ মন্তাজের মা। উঠোনে শুকোতে দেয়া জিনিসগুলো পাহারা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুপুরের ভাতঘুম সেরে নিচ্ছে। আজ খাওয়াটাও হয়েছে জম্পেশ। মীরবাড়ির অন্দর মহলের পিছন দিকে যে বিশাল পুকুর, তাতে আজ ভোরে জেলেরা এসে জাল ফেলেছিল । চার-পাঁচ কেজি ওজনের রুই, কাতলা, কালবাউসগুলো যখন লাফাচ্ছিল তখন কী যে চমৎকার দেখা যাচ্ছিল! তারই একটা মাছ আজ দুপুরে রান্না হয়েছিল। বাড়ির বড় বউ রান্না করে চমৎকার, মন্তাজের মা তাই বেশি খেয়ে ফেলেছিল। ঘুমটাও জমে উঠেছে ভাল। হা করে ঘুমাচ্ছে মন্তাজের মা, মৃদু মৃদু নাক ডাকছে। উঠোনের দক্ষিণদিকমুখী বড়ঘর, পাকা ঘরের উপরে টালি দেয়া ছাদ। উঠোন থেকে সারি সারি সিঁড়ি উঠে গেছে উঁচু বারান্দায়। এই বাড়ির ভিতর রয়েছে তিনটি ঘর। তিনটি ঘরের দরজাই এখন ভেজানো রয়েছে।বাঁ দিকের দরজাটা হঠাৎ করে আস্তে আস্তে খুলে গেল। ছোট টুলটুলে সুন্দর দুষ্টু একটি মেয়ের মুখ উঁকি দিল দরজার ওপাশে। এ বাড়ির মেজছেলের ছোট মেয়ে তুশি। ছয় বছর বয়স, পড়ে গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তার স্কুল ছুটি হয়েছে সাড়ে বারটায়। দুপুরে খাওয়ার পর রোজকার রুটিন দুই চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে থাকা। বড় বোন ঠিকই ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু ঘুম নেই তুশির চোখে। পুষি বিড়াল এসে লেজ দিয়ে পায়ে সুড়সুড়ি দিলে তুশির মন আরো আনচান করতে শুরু করে। উদাস ঝিম ধরা দুপুর তার সমস্ত শরীরে কেমন শিহরণ তোলে। বাইরে যেতে ভীষণ আকুলি বিকুলি করে মন। মার হাতের পিটুনি খেয়েও কিছুতেই এ স্বভাব কমে না। বাবা শহরে চাকুরি করেন বলে দাদীর আশ্কারা পেয়েছে বেশি করে। মার শাসন তাই তুশি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। যথারীতি পা টিপে টিপে বারান্দায় পৌঁছে যায় সে। দাদী, মা, বড় কাকী সবাই ঘুমোচ্ছে।

'যাই, বনজরে ডাকে তুলি', আপন মনে বলে তুশি যায় পাশের জানালায় ওপাশের ঘরে বড়কাকীর পাশে শুয়ে আছে পাঁচ বছরের বনজ। তুশির এক নম্বরের সাগরেদ। বড়কাকীর কান বাঁচিয়ে চাপাগলায় ডাক দেয় তুশি-

-'বনজ! -এই বনজ!'

চোখ পিট্ পিট্ করে ওঠে বনজ। পা টিপে টিপে সেও বাইরে।

-'তুশি বু!''চল্ মাছ বানাই পাটকাঠি দিয়ে।'

-'মা মারবে নে! আমার ভয় করে!'

-'আরে না! চল্ তো তুই!'

দু'জনে নেমে আসে উঠোনে। পিছন পিছন পুষি বিড়াল আসে মিউ্ মিউ্ করতে করতে। বিকেলের হালকা রোদেলা ছোঁয়া চারিদিকে, রোদ্দুরের তেজ কমে আসছে। বাড়ির ছাদের শ্যামল ছায়ায় ঘুমমাখা পরিবেশে রূপকথার দেশের মত সবকিছু যেন ওদের ছোট্ট মনে অদ্ভুত প্রলেপ ফেলে। উঠোনের এক কোণে গাদা করা পাটকাঠি, তার থেকে দুটো নিয়ে দুই কোণায় দড়ির গিট দিয়ে ওরা বিশাল মাছ বানায়। বনজের হাত ধরে সেই

মাছ উঠোনের মাটিতে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে তুশি। হঠাৎ রান্না ঘরের বারান্দায় মন্তাজের মার হা করে ঘুমানো রূপ দেখে খিল্ খিল্ করে হেসে ফেলে তুশি। মন্তাজের মা নড়ে চড়ে ওঠে; কিন্তু হা বন্ধ হয় না। তুশির মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি গজায়। ইতিউতি চেয়ে দেখে– না, কেউ কোথাও নেই। রান্নাঘরের বারান্দায় এক কাঁদি বীচিকলা রাখা আছে। তারই একটা ছিঁড়ে নেয় সে। এবার পা টিপে টিপে এগোয় মন্তাজের মার দিকে। বনজ মতলব টের পেয়ে পিছন থেকে ওর ফ্রক টেনে ধরে–

'তুশি বু! জাগে যাবে তো!'

তুশি ইশারা করে চুপ থাকার জন্য। তারপর এক পা, দুই পা করে এগিয়ে গিয়ে কলাটার মাথা ঢুকিয়ে দেয় মন্তাজের মার মুখে। অদ্ভুত জরদ্‌গব আওয়াজ করে ধড়মড় করে জেগে ওঠে মন্তাজের মা– 'কি-ডা রে?'

ওদের দেখে চোখ বড় হয়ে যায় তার। আবার চিৎকার করার আগেই বনজের হাত ধরে পাটকাঠির মাছ নিয়ে পড়িমড়ি করে দৌড় লাগায়। কী কপাল! দৌড়াতে গিয়ে বনজের পা গিয়ে পড়ে পিছনে বসে থাকা পুষির লেজে। 'মিঁয়াও!!!' পুষির বিকট চিৎকার । সেই সাথে কট্ কট্ কট্ করে ওঠে খাঁচার মুরগিগুলো। লাল কুকুরটা ঘুম ভেঙে পরিত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল। সে এক ভয়াবহ হৈ চৈ। মা'র ভয়ে পালানোর গতি আরো বেড়ে যায় তুশি আর বনজের। দৌড়- দৌড় -দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে, হাঁফাতে হাঁফাতে অবশেষে বকুল তলায় এসে থামা।

-'আজকে বাড়ি ফিরলি দেহা যাবে নে, আমাগে দুই জনিরই খবর আছে।' বনজ বলে।

-'আরে যা, যা! দেখা যাবে নে আব্বা বাড়ি ফিরবি না আজকে? কেউ চান্সই পাবে না। এহন চল যাই বিনতিগো বাগানে। ওগো বাড়ির পাশের জঙ্গলে কুঁচ ফল আছে। আমরা কুঁচ ফল কুড়াব।'

-'ওই হানে গিলি কিন্তু আমারে স্বর্ণলতা তুলি দিতি হবে নে।'

-'স্বর্ণলতা গায় লাগলি জ্বর হয়। দেহিস নি? ঐ দিন আমার জ্বর অইল।' আইচ্ছা, চল তো, তারপরে দেহা যাবে নে।' বকুলতলা পেরিয়ে মাটির চওড়া রাস্তা সটান চলে গেছে সামনে, বড় এক বটগাছের কাছে গিয়ে দুই ভাগ হয়েছে। দুপুরের রোদের আভা তখনো শেষ হয়নি–ওরা মেঠো পথ দিয়ে সামনে এগোয়, দুই পা ধুলোয় মাখামাখি। রাস্তার দু'পাশে ভাঁট ফুলের সমারোহ–মৌ মৌ গন্ধে ভরপুর বাতাস। হাঁটতে হাঁটতে স্কুলের মাঠের কাছে পৌঁছলো ওরা । মাঠ তখন গরু বাছুর, ছাগলের চারণ ক্ষেত্র। এ বাড়ি -ও বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েরা গরু-ছাগল চরাতে নিয়ে এসেছে মাঠে। বনজ আর তুশিকে দেখে ওদেরই কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে-

-অ্যাই তুমাগো খুঁজতি বেরইছে মন্তাজের মা, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও।' ওরা সেদিকে দৃকপাতও করলো না। বট গাছের কাছে গিয়ে ওরা অবাক হয়ে দেখে ন্যাড়া বটগাছ জুড়ে গজিয়েছে অসংখ্য কচি পাতা, তার মধ্যে ছোট লাল লাল মুকুল উঁকি দিচ্ছে। ছোট ছোট কী পাখি যেন ওড়াওড়ি করছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে। তুশি আর বনজ মজা পেয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে যায়। বনজ হঠাৎ করে বটগাছের কোটরে আবিষ্কার করে কাঠবেড়ালীর বাসা। ছোট ছোট ডাল আর খড়কুটো দিয়ে তৈরী, তার মধ্যে ছোট ইটের টুকরো, সুতা এইসব আজেবাজে জিনিসও দেখা যাচ্ছে। বনজ কাছে যেতেই লাফ দিয়ে বের হয়ে গেল একটা মোটাসোটা লেজ ফুলানো গায়ে ডোরা দেয়া ধূসর কাঠবেড়ালী।

-'তুশি বু, তাড়াতাড়ি আসো, দেহে যাও কী পাইছি!' তুশি ওখানেই পেয়েছিল ঝুমকো লতার ঝোপ, ফ্রকের কোঁচড় ভরে তুলেছিল ফুলে; বনজের চিৎকার শুনে কোঁচড় সামলে দৌড়ে এল। আরে, কী অবাক কাণ্ড বাসার মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একটা ছোট্ট ছানা, এখনও চোখ ভাল করে ফোটেনি, ভয় পেয়ে গলা দিয়ে কেমন অদ্ভুত আওয়াজ করছে। বনজ হাতে তুলে নিল ছানাটা, সেটা একটু একটু করে লেজ নাড়ছে, গায়ে তুলোর মত

নরম ফুরফুরে লোম তির্‌তির্‌ করে কাঁপছে। তুশিও হাতে নিল। এদিকে বনজ বায়না জুড়েছে ওটা বাড়ি নিয়ে যাবে বলে। তুশিরও তাই ইচ্ছে। কিন্তু বাচ্চাটা ভয় পেয়েই বোধহয় তুশির হাতের তালুর ওপর জলবিয়োগ করে ফেলল।

-'এমা, এখন কী হবে? বনজ রে তাড়াতাড়ি ধর, আমার হাত একদম ময়লা হয়ে গেছে।' তাড়াতাড়ি ওটাকে বনজের হাতে চালান দিয়ে তুশি ফুলগুলো মাটিতে ঢেলে ফেলল। তারপর ঝোপ থেকে পাতা ছিঁড়ে হাত পরিষ্কার করল। হঠাৎ, তুশির চোখ চলে গেলে বটগাছের গুঁড়ির দিকে। মা কাঠবিড়ালীটা জুলজুল করে চেয়ে আছে ওদের দিকে, মনে হয় কী যেন বলবে।

-'আহারে বনজ, ঐ দ্যাখ বাচ্চাটার মা আইছে। থাক্‌ রাইখে দি ওরে।'

বনজও ঐদিকে তাকিয়ে রাজি হয়ে যায়। আস্তে আস্তে যত্ন করে ওরা বাচ্চাটাকে বাসায় রেখে দেয়।

-'নাহ্‌! আজকে আর বিন্‌তিগে বাগানে যাব না, রোদ চলে গেছে, খানিক পরে মাগরিবের আযান দিয়ে দেবে। চল্‌ বনজ বাড়ি যাই গে।' বনজও তাকিয়ে দেখে সত্যিই বটগাছের পিছনে দূরে দিগন্ত রেখায় সূর্য হেলে পড়েছে।

বাড়ি ফিরে দেখে কর্মমুখর পরিবেশ। মন্তাজের মা, কামলা রকিব -সবাই ব্যস্ত নানান কাজে। মা, কাকী দুজনেই রান্না ঘরে পিঠা বানানোর আয়োজনে মগ্ন। দাদী উঠোনে মোড়া পেতে বসা। ওদের দেখেই হাসলেন-

ওই যে আইছে দস্যি দুডো, কোনহানে গেছিলি তোরা? খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান। যা শীগ্‌গিরি হাত পা ধুয়ে চুল আঁচড়া।' বাধ্য ছেলে মেয়ের মত ওরা দু'জন কলপাড়ে যায়। সন্ধ্যার আঁধার নামতেই বই খাতা পেন্সিল নিয়ে বড় ঘরের বারান্দায় ওরা পাটি পেতে বসে। মন্তাজের মা ঘরে ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দেয়। পড়তে বসে একটু পরে ঢুলুনি আসে দু'জনের । দাদী রান্না ঘরের বারান্দা থেকে চিৎকার দিয়ে বলেন-'জোরে জোরে পড় তোরা! ঐ পাড়ার হাসুগের বাড়ির তে যেন শুনতি পায়।' মুখর হয়ে ওঠে তুশি'র কন্ঠ, ঢুলে ঢুলে সুর করে পড়ে-

'রাত হল নিজ্‌ঝুম-

চোখ জুড়ে আয় ঘুম

ফুটফুটে জোছনায়

জোনাকীরা উড়ে যায়-

আলো ছায়া নেচে যায় পাতায় পাতায় ....

পড়তে পড়তে তুশির চোখ চলে যায় উঠোনের অন্ধকারে। উঠোনের ওই পাশে নারকেল আর কাঁঠাল গাছের ঝুপসি অন্ধকারে ঝিক্‌মিক্‌ করছে জোনাকী। উপরে উঠছে, ঘুরে ঘুরে আবার নিচে নামছে। কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না গাছের পাতার আড়াল থেকে উঠোনের অন্ধকারে ঝিলিমিলি আলোর নক্‌শা তৈরি করেছে। রান্নাঘর থেকে পিঠে বানানোর ধোঁয়া মনকে উন্মনা করে তুলছে। বই এর ছবির দিকে তাকিয়ে তুশির ঘুম আসে। আবু আর আনু দুই ভাই-বোন কেমন সুন্দর কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। মাথার পিছনে জানালা, তার শিকের ওপাশে উঁকি দিচ্ছে ঝোপঝাড় আর তার উপরে চাঁদ। 'আব্বা কখন আসবে'? তুশি ভাবে, এখনও এল না। ওর জন্য চয়নিকা বই নিয়ে আসার কথা আছে। সেই কবে থেকে অপেক্ষায় আছে। বিনতির বইয়ে দেখেছে রাজকন্যা কঙ্কাবতীর একটা গল্প আছে। বনজ তো ওদিকে ঘুমিয়ে কাদা। তুশিরও হাই ওঠে। দাদী ওদিক থেকে মাকে বলেন- 'তুশি আর বনজ রে খাওয়ায়ে দেও। ওরা তো ঘুমোয় গেল। রাত হয়ে যাচ্ছে।' তুশি আর অপেক্ষা করতে পারে না, কখন যে ঘুমিয়ে গেল টেরই পেল না। অনেক রাতে একটু কোলাহল কানে এল।

-'থাক না, মেয়েটারে জাগাতে হবে না। সকালে দেখবে।' মার গলা শুনল। এর উত্তরে মনে হল আব্বার

গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তুশি এক লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। 'আব্বা আইছে!' বলে চিৎকার দিল। আব্বা কোলে তুলে নিলেন ওকে। হঠাৎ বালিশের কিনারে কী যেন দেখে তুশি। আরে! চয়নিকা বই। কমলা রঙের বইয়ের মলাটে হাসিখুশী দুই ভাইবোনের ছবি আর গাছপালা।

-'আমার চয়নিকা বই আনছ? ' বাবার কোল থেকে নেমে বই ধরে তুশি গন্ধ শোঁকে নতুন বইয়ের। কাল সকালে বনজ, দাদু আর পাড়ার সবাইকে ওর নতুন বই দেখাতে হবে। তুশির দুই চোখ অন্য রকম আলোয় চক্‌চক্ করে ওঠে। আর বাবা তাই দেখে হেসে ওঠেন খুশিতে।

"-'দাদুমণি!' ও' দাদুমণি! তুমি হাসছ কেন?" ধড়মড় করে উঠে বসেন বৃদ্ধা মনজিলা বেগম। নাতনি পারিসার ডাকে চমকে বাস্তবে আসেন। বড্ড অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত কী যে স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। মাগরিবের নামাজ শেষ করে কখন যেন দুই চোখ জড়িয়ে এসেছিল। চোখ মেলে দেখেন পারিসা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"তুমি না দাদু, কেমন ফোৎ শব্দ করে ঘুমের মধ্যে হাসছিলে! স্বপ্ন দেখছিলে নাকি? কী দেখছিলে, বল না দাদু! প্রিন্স অব পারসিয়ার স্বপ্ন নাকি?"

-" পারসিয়া? সে আবার কী গল্প রে ? আমরা তো কঙ্কাবতী, ডালিম কুমার, মধুমালার গল্প জানি। তুই আবার কোন গল্পের কথা বললি রে বু?"

-"তুমি দেখনি? ঐ তো যে সিডিটা আজকে আব্বাই এনেছিল। কম্পিউটার গেমসটা কী মজার। শয়তান জাদুকর জাফরের কাছ থেকে রাজকুমার উদ্ধার করে রাজকুমারীকে। অস্ত্র হলো তলোয়ার। শত্রুর সাথে ফাটাফাটি লড়াই করে রাজকুমারীকে উদ্ধার করেছি আমি। আমি ছিলাম প্রিন্স অব পারসিয়া।"

-"তাই নাকি রে বু, আমরা তো কম্পিউটারে গেমস্ নিয়ে বসিনি, তাই জানিনে। আসলে বু, আমি রাজকন্যা তুশির স্বপ্ন দেখছিলাম।"

-"তুশি" কে দাদুমণি? ওহো, তাই তো ওটা তো তোমার নাম! তুমি বুঝি রাজকন্যা ছিলে? তোমার পঙ্খিরাজ ঘোড়া আর জাদুর প্রদীপ ছিল"? নাতনীর কথায় মনজিলা বেগম হাসেন। ওর ছোট হাত দুটো ধরে নিয়ে যান ব্যালকনিতে। চাঁদের আলোর বদলে সেখানে বিদ্যুৎ বাতির আভা মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। সাত তলার এই ফ্ল্যাট বাড়িতে খোলা আকাশ ঘরের লগোয়া ব্যালকনিটুকু। সেখানে টবে বনসাই বৃক্ষ ফুলে ফুলে রঙিন। অনেক যত্নে সৌখিন আদরে তৈরি বনসাই এর টবের দিকে দেখিয়ে নাতনিকে বলেন -

-"এই গাছ ছিল আমাগো পুরনো ভিটেয়। বিরাট গাছ, ফাল্গুন মাসে ওতে ফুল ধরতো লাল লাল। কতদিন মালা গাঁথিছি ফুলির।"

পারিসা অবাক হয়ে তার দাদুর স্বপ্নের পঙ্খিরাজ ঘোড়ার কথা শোনে। জোনাক জ্বলা রাতের সেই স্বপ্ন প্রিন্স অব পারসিয়ার স্বপ্নের সাথে মিলে মিশে দুই চোখে অন্য আলোর ঝলক নিয়ে আসে। বৃদ্ধা মনজিলা বেগম অপার আনন্দে ওই চোখে তাকিয়ে থাকেন।

> "সত্যিকারের শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পাদিত কাজের সমন্বয় সাধন"
> —প্লেটো

ভ্র ম ণ কা হি নী

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ

আতিকুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৭১৩৪
শ্রেণী : অষ্টম-ক

আমাদের দেশের অনেক জায়গা আছে, যার সৌন্দর্য আমরা কখনো উপলব্ধি করতে পারি না। যদিও শিক্ষাসফরে এর চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ হয়, তবুও সৌন্দর্য-পিপাসা মনে থেকেই যায়। তাই এ পিপাসা মেটানোর জন্য এবারের ছুটিতে আমি গিয়েছিলাম সেন্ট মার্টিন দ্বীপে।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যেতে হলে প্রথমে ঢাকা থেকে গাড়িতে করে টেকনাফ যেতে হয়। সেখান থেকে নৌকা ভাড়া করে স্বপ্নিল সেই নাফ নদী ও সাগরের মোহনা পেরিয়ে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যেতে হয়।

আমি প্রথমে গাড়িতে ঢাকা থেকে টেকনাফ গেলাম। এরপর সেখান থেকে নৌকা ভাড়া করে সেই নাফ নদী ও অশান্ত সমুদ্র পেরিয়ে সেন্ট মার্টিন গিয়ে পৌছলাম। সেখানে যাওয়ার পর এক অনাবিল আনন্দ আমাকে ঘিরে রাখল। সেখানে পা দেওয়ার পর প্রথমেই দেখতে পেলাম, সেই বালুচরে একটি অতি আকর্ষণীয় মেলা। সেটা দেখে আমার মন আনন্দে ভরে গেল। আমি মেলায় গিয়ে প্রথমে অতি সুন্দর কিছু প্রবাল কিনলাম। এরপর আমি মেলার অন্যান্য আকর্ষণীয় ও পুরনো দিনের জিনিসপত্র দেখ-লাম। এই দ্বীপে ছিল অনেক নারিকেল গাছ। এখানকার অধিকাংশ মানুষ নারিকেল ও মাছ বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করে। যেহেতু এই দ্বীপে প্রচুর নারকেল পাওয়া যায় তাই এ দ্বীপকে "নারিকেল জিঞ্জিরা" বলা হয়। এখানকার অনেক মানুষ শুঁটকি মাছ ও প্রবাল বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করে। এখানকার মানুষ অতি সহজ সরল জীবন যাপন করে। এখানে আমি আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, এখানে মসজিদের সংখ্যা প্রচুর। এখানে আমি এই দ্বীপের অধিবাসীদের মুখে শুনতে পাই যে, এতটুকু দ্বীপে ১৪টি মসজিদ রয়েছে। এই তথ্যে আমি প্রমাণ পাই এখানকার এই সহজ সরল মানুষগুলো অতি ধর্মভীরু। আমি সেখানকার হোটেলে দুপুরের খাবার খাই। সেখানকার মাছ খুব বিখ্যাত। তাই আমি দুপুরে রূপচাঁদা মাছ দিয়ে ভাত খাই। দুপুরের খাবার শেষ করে আমি এই দ্বীপের সৌন্দর্য দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ি। আমি ঘুরতে ঘুরতে একটি সাইক্লোন কেন্দ্র দেখতে পাই। এই দ্বীপে কোন জলোচ্ছ্বাস বা ঘূর্ণিঝড় হলে এখানে মানুষ আশ্রয় নেয়। এটি দেখে আমি আবার আমার জায়গায় এসে উপস্থিত হই। এখানে এসে অনেক পর্যটকের সাথে দেখা হয়।

এসব দেখতে দেখতে আমার গন্তব্যস্থল অর্থাৎ ঢাকায় যাবার সময় হয়ে এল। এত সৌন্দর্য উপভোগ করার পর আমার আর ফিরে যেতে মন চাইছিল না। কেবলই মনে হতে লাগল আমি যদি এখানেই থেকে যেতে পারতাম এই সহজ সরল মানুষদের ভেতরে। কিন্তু বাস্তব বড়ই কঠিন। আমাকে আমার গন্তব্যে ফিরে যেতেই হবে। এমন কথা মনে করে নৌকায় উঠলাম। নৌকায় ওঠার পর আমার চোখ সজল হয়ে এল। আবার সেই সাগর আর নাফ নদী পেরিয়ে টেকনাফ পার হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কিন্তু এ স্মৃতি আমি কোনদিনও ভুলব না। আর তা ভোলার মত নয়। এই দ্বীপ আমায় বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

একটি ভ্রমণকাহিনী

মোঃ আল মুবীন সুলতান
কলেজ নম্বর : ৮৪৯৮
শ্রেণী : নবম-গ

গত শতাব্দীর কথা। ১৯৯৯ সালের ১৩ই আগস্ট। আমি, আমার বোন, আম্মু, ছোট মামা, ছোট কাকু এবং হায়দার কাকুকে নিয়ে সিলেট যাব ঠিক করলাম।

সেদিন রাতে সবাই মিলে ফার্মগেট থেকে দু'টি বেবীতে করে কমলাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। কিন্তু ভাগ্য বোধহয় সেদিন সহায় ছিল না। ট্রেন মিস করলাম। সেখান থেকে N.P. বাসের কাউন্টারে গেলাম। কিন্তু হায়! বাসের টিকিট নেই। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি বাসে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ৬টি সিট পেলাম। কিন্তু তাও আবার একদম পিছনে।

সারা রাস্তা আধো ঘুমে, আধো জাগরণে কাটল। মেঘনা নদীর তীরে এসে আমাদের বাস থামল। অবশেষে রাত ১২.৩০মি. আমাদের বাস ফেরীতে উঠল। আমরা সবাই মিলে হালকা কিছু খাবার খেয়ে নিলাম। নদী পার হতে হতে দেখলাম ঐতিহাসিক ভৈরব ব্রিজ। এরপর আবার আধো ঘুমে, আধো জাগরণে এবং গল্প করে সময় কাটতে লাগল। অবশেষে সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সকাল ৬.০২মি. আমরা সবুজ আর পাহাড়ের শহর মনোরম সিলেটে এলাম। সেখান থেকে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক আমার চাচা জনাব আবদুল্লাহ আল মামুনের বাসায় গিয়ে উঠলাম।

সেদিন বিকালে সবাই মিলে হযরত শাহজালাল (রঃ) এর মাজার ও হযরত শাহ পরান (রঃ)-এর মাজারে গেলাম। এরপর রাতে সিলেট শহর ঘুরে বাসায় ফিরে এলাম।

পরদিন আমরা সিলেটের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখলাম। এর ৩ দিন পর আমরা জাফলং রওয়ানা হলাম। জাফলং যেতে পথে রাস্তার দু'ধারে যে কত গাছ দেখলাম, তা গুণে শেষ করা যাবে না। আমরা সকাল ১১.৩০ মিনিটে জাফলং পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে আমরা একটি নৌকা ভাড়া করে নদী পার হলাম।

নদী পার হয়ে আমরা জাফলং ঘুরতে লাগলাম। আমরা ভারতের উঁচু উঁচু পাহাড় আর ঝুলন্ত ব্রিজ দেখতে পেলাম। বিকাল ৪.২৫ মিঃ এর দিকে আমরা গাড়িতে এসে খাবার খেয়ে নিলাম।

এরপর আমরা শ্রীপুর পিকনিক স্পটে গেলাম। সেখান থেকে রাত প্রায় ৯ টায় বাসায় ফিরে এলাম।

আমার ক্ষুদ্র জীবনের ছোট পরিসরে এ ভ্রমণটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আমার কাছে বাইরের সুন্দর প্রকৃতি অতি আপন হয়ে ওঠে। আমি বুঝতে পারলাম, ভ্রমণ সবার জন্য কত প্রয়োজন।

এক অমর স্রষ্টার জীবনী
'চার্লস ডিকেন্স'

আবু সালেহ্ মোঃ ইয়াহিয়া
কলেজ নম্বর : ১২৬২ (দিবা)
শ্রেণী : ষষ্ঠ-খ

'পাছে লোকে উপহাস করে', এই ভয় পেয়ে বসেছিল তাঁকে।আর তাই এক কলম লিখতেন, তো চিন্তা করতেন দশবার। লেখাটি কতটা মানসম্পন্ন হল, পাঠক কিভাবে লেখাটি'র ধারণা নেয়, উপহাস করবে না তো। এসব বিষয়ে প্রচণ্ড সচেতন ও ভয়ার্ত ছিলেন তিনি। এসব নানা বিষয় নিয়ে এত চিন্তা করতেন বলেই হয়তোবা তিনি অমর লেখক হতে পেরেছিলেন। হতে পেরেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে আলোচিত, প্রশংসিত ও সর্বাধিক গ্রন্থের প্রণেতা।

নাম তাঁর 'চার্লস্ ডিকেন্স'। জন্ম ১৮১২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি, হ্যামশায়ারের পোর্টসমাউথে। তাঁর বাবা ছিলেন নৌবাহিনীর কেরানি। অত্যন্ত টানাটানির সংসার ছিল তাঁর বাবার। এতটাই গরীব ছিলেন তাঁরা যে, ছেলেমেয়ের মুখে দু'বেলা অন্ন যোগাতে পারতেন না। এ বেলা খেল তো ও বেলা জোটে না। বেড়েই চলল দেনা। একেই বলে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'- শেষে দেনার বোঝায় জেলে যেতে হয় তাঁর বাবাকে। শেষে উপায়ান্তর না দেখে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন ডিকেন্সের মা ও তিনি এবং তাঁর ভাই -বোনেরা। ডিকেন্স সারাদিন জেলে থেকে রাতে বাসায় ফেরেন। আর তখন থেকেই তাঁকে অর্থোপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে জড়িত হতে হয়। প্রথমে কাজ করেন এক রুটির দোকানে, তারপরে এক রঙের দোকানে, এরপর কাজ পান এক আইনজ্ঞের দপ্তরে। সেখান থেকে স্কুলে যেয়ে লেখাপড়া শেখেন। স্কুলজীবন শেষে সাংবাদিকতার পেশা নেন তিনি।

১৮৩৩ সাল থেকে 'বয' ছদ্মনামে উপন্যাস লেখা শুরু করেন তান। ১৮৩৬ সালে তার 'পকউইক পেপাস' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় পত্রিকায়। তবে তাঁর প্রথম দু'টি গল্প প্রকাশিত হবার পর কোন পারিশ্রমিক পাননি তিনি। কিন্তু শেষে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার কারণে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রতিটি শব্দের জন্য ১৫ ডলার পেতেন তিনি। সর্বকালের সকল লেখকের মাঝে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের রেকর্ড এটি। ইংরেজি ভাষার বাইবেল ও শেক্সপীয়ারের বইয়ের পরই ডিকেন্সের বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।

বাল্যজীবনের দারিদ্র্য শেষ জীবনে দূর হলেও মনোকষ্ট দূর হয়নি। ১৮৩৬ সালে বিয়ে করেন তিনি, কিন্তু স্ত্রীর সাথে প্রায়শই তাঁর খিটিমিটি লেগে থাকত। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার আমেরিকায় যান তিনি। জীবনের শেষ কয়েক বছর সেখানেই কাটান তিনি।

তাঁর বিখ্যাত রচনাবলীর মাঝে 'অলিভার টুইস্ট, 'ও কিউরিসিটি শপ' 'আ ক্রিসমাস ক্যারল'; 'নিকোলাস নিকল্‌বি'; 'ডেভিড কপারফিল্ড; 'আ টেল অফ টু সিটিজ'; ' গ্রেট এক্সপেক্টটেশানস'; প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় এ লেখক ১৮৭০ সালে দেহত্যাগ করেন।

ইন্টারনেটের বিশ্ব

এ.এইচ. এম আবদুল্লাহ্
কলেজ নম্বর : ৭১১৬
শ্রেণী : অষ্টম

সৃষ্টির আদিকাল হতে মানুষকে ঘরে-বাইরে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। সংগ্রামই মানবজীবনের ধর্ম। এ জীবন সংগ্রামের যাত্রাপথে বিজ্ঞান হল মানুষের হাতিয়ার। বিজ্ঞান মানুষকে জীবনযাত্রার সুকঠিন নিগড় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। মানুষকে মানবিক চেতনা ও গুণে উন্নত করে প্রেরণা দিয়েছে উন্নত সমাজ গড়ার। বিংশ শতাব্দী জ্ঞান বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষের শতাব্দী। এ শতকেই মানুষ তার আপন প্রচেষ্টায় বিশ্বকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার কম্পিউটার। আর স্যাটেলাইট প্রযুক্তিও সাথে কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়ে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থাটিকে বলা হয়ে থাকে ইন্টারনেট।

তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক সফলতার অপর নাম ইন্টারনেট। ইন্টারনেট হল নেটওয়ার্কসমূহের নেটওয়ার্ক। এরই মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্তের কম্পিউটার থেকে আরেক প্রান্তের আর একটি কম্পিউটারের সাহায্যে ছবিসহ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করা সম্ভব। একটি মূল কম্পিউটারের সাথে অনেকগুলো টার্মিনাল যোগ করে তথ্য সংগ্রহও করতে পারেন একাধিক ব্যক্তি। ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে গবেষণার জন্য সংগ্রহও করা যায় নতুন নতুন তথ্য। শিক্ষার্থীরা জেনে নিতে পারে তার সমস্যার সমাধান। অন্যদিকে এর বদৌলতেই চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার।

ইন্টারনেটের জন্ম-ইতিহাস প্রাচীন নয়। এর উদ্ভাবনের প্রাথমিক কারণ ছিল সামরিক। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার করে। প্রতিরক্ষা বিভাগের কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা চারটি কম্পিউটারের মধ্যে গড়ে তোলে প্রথম অভ্যন্তরীণ এক নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার নাম ছিল "ডার্পানেট"। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে ডার্পানেটের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "আর্পানেট"। ক্রমশ চাহিদার উপর নির্ভর করে ১৯৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন সর্বসাধারণের জন্য এরকম একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে। এর নাম রাখা হয় "নেস্ফোনেট"। তিন বছরের মধ্যে এর বিস্তার ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। এরই মধ্যে গড়ে ওঠে আরো অনেক বড় ছোট ও মাঝারি নেটওয়ার্ক। ফলে এ ব্যবস্থাপনায় কিছুটা হলেও অরাজকতা দেখা দেয়। এ অরাজকতা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজনেই গড়ে তোলা হয় ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে গড়ে তোলা হয় এই নেটওয়ার্ক। আর তখন থেকেই বিশ্ববাসী পরিচিত হল ইন্টারনেট নামের এক বিস্ময়কর ধারণার সঙ্গে।

ব্যবহারকারীগণ দুভাবে ইন্টারনেটের গ্রাহক হতে পারেন। প্রথমটি হল অনলাইন ইন্টারনেট আর দ্বিতীয়টি হল অফলাইন ইন্টারনেট। টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে অন্য যে কোন সার্ভিস প্রভাইডারের সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতিকে অনলাইন বলা হয়। দ্বিতীয়টি অফ লাইন ইন্টারনেট বা ই-মেইল নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ায় গ্রাহকগণ নিকটবর্তী কোন সার্ভারকে কেন্দ্র করে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে বলেই এটাকে অফলাইন বা ই-মেইল বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে গ্রাহকগণ কম খরচে যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের যেখানে জয় জয়কার সেখানে বাংলাদেশও কার্পণ্য করেনি এ সুযোগ গ্রহণ থেকে। ১১ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়। আন্তর্জাতিক তথ্য প্রবাহের সাম্রাজ্য ইন্টারনেটের সংগে সম্পৃক্ত হয়ে যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বর্তমানে বিশ্বের অনলাইন ইন্টারনেট সার্ভিসের বিশাল জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে টিএন্ডটিবোর্ড পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে ভিস্যাট বসানোর অনুমতি দিয়েছে। ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংক মিশন,

রয়টার, সাইটেক, আই এস এন ও বেক্সিমকোসহ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে ভিস্যাট বসানো হয়েছে। অন্যদিকে পরিকল্পনা রয়েছে অদূর ভবিষ্যতে সরাসরি রেডিও তরংগের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের।

মানবজীবনের এমন কোন স্তর নেই যেখানে ছোঁয়া লাগেনি ইন্টারনেটের। বিশ্বের দরবারে ইন্টারনেটের সক্রিয়তার মূলে রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অদ্ভূতপূর্ব সাফল্য। সত্য বলতে যোগাযোগের ইতিহাসে ইন্টারনেট নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে। একদিকে যেমন সময় লাগে কম অন্যদিকে সাশ্রয় হয় টাকার। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তথ্য পাঠান যায়। খরচের পরিমাণ খুবই সামান্য। বাংলাদেশের একজন মানুষ ঘরে বসেই লন্ডনের যে কোন লাইব্রেরীতে লেখাপড়া করতে পারে। ইচ্ছামত বই বাছাই করা যায় ক্যাটালগ দেখে। এমনকি প্রয়োজনীয় কয়েক পৃষ্ঠা প্রিন্টও করে নেয়। চাকরির বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের অবদান অতুলনীয়। বিজ্ঞাপন দেখেই যোগাযোগ করা যায় বিজ্ঞাপন দাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে। বিশ্বের যে কোন দেশের মানুষ অন্য কোন দেশের পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়তে চাইলে অনায়াসে ইন্টারনেটের সাহায্যে তা কম্পিউটারের পর্দায় পড়তে পারবে। ইন্টারনেটের সাহায্যে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ করা যায়।

ইন্টারনেট আধুনিক প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ইন্টারনেটের বহুমুখী সুবিধা আজ মানুষের জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। জীবনকে করেছে স্বাচ্ছন্দ্যময়। পৃথিবীকে করেছে ছোট থেকে ছোটতর। আজ ইন্টারনেট অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জয়মাল্য পরে ক্রমশ এগিয়ে চলছে সামনের দিকে।

তারুণ্যের স্বপ্ন হোক

খালেদ মাহমুদুর রহমান [আদনান]
কলেজ নম্বর : ৮৩৪১
শ্রেণী : দশম (বিজ্ঞান)

বিখ্যাত ইংরেজ কবি সুইনবার্ন বলেছেন- "This life is vision or a watch beteen asleep and a sleep" অর্থাৎ দুই পাশেই ঘুম ঘুমের মতো অন্ধকার মাঝখানে শুধু একটুখানি চোখ মেলে থাকাটাই হচ্ছে জীবন। আর এ জীবনেরই একটি অংশ তারুণ্য। তারুণ্য হচ্ছে মানুষের জীবনের তরুণ অবস্থা।

তরুণরা নানারকম স্বপ্ন দেখে, কেউ কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে, কেউ কেউ দেখে খারাপ স্বপ্ন। কারও কারও স্বপ্ন হয় দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক। কারও কারও স্বপ্ন হয় দেশের জন্য অমঙ্গলজনক।

তরুণদের স্বপ্ন দেখতে হবে নিজেকে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী করে তোলার। এ প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার স্বপ্নই দেখতে হবে তাদের।

তরুণ সমাজকে স্বপ্ন দেখতে হবে ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য অর্জনের, কারণ কোন ব্যক্তি যখন নিজ অবস্থানে সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারে তখনই সে কেবল ভাবতে পারে রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করার কথা। বর্তমান বিশ্বে দেখা যায় যে, যারা মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করছেন তারা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে সুদৃঢ়।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলো দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে, Information technology জড়িয়ে পড়ছে প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের সাথে। আজ বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের অস্তিত্বকে কল্পনা করা যায় না। বিজ্ঞান জড়িয়ে আছে প্রতিদিনের জীবনের সাথে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে স্বদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন হবে তরুণের।

তরুণ সমাজের স্বপ্ন হবে সুশিক্ষিত হওয়ার। তরুণ সমাজকে এমন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে-যে শিক্ষা আলোকিত মানুষ তৈরি করে।

তরুণদের স্বপ্ন হবে পুরোনো মোহকে কাটিয়ে ওঠা। পুরোনো সকল কুসংস্কারকে ভুলে যেতে হবে তাদের। কারণ, মিথ্যা–কুসংস্কার যারা আঁকড়ে থাকেনা, তারাই তরুণ। নতুন সূর্যের দিগন্তপ্লাবী আলোকে যারা ভয় পায়না তারাই তরুণ।

তরুণদের স্বপ্ন হবে মানুষকে আশ্বাসের বাণী শোনানো তারা মানুষকে অবহেলা করবেনা প্রতিষ্ঠা করবে সুন্দর ও কল্যাণের। তরুণদের ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কারণ, যৌবনশক্তিতে বলীয়ান তরুণ যেমন নতুন আবিষ্কারের নেশায় মাতে, তেমনি দাঁড়ায় দুর্গত মানুষের পাশে। দুর্গত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহের স্বপ্ন দেখতে হবে তরুণদের। হতাশের বুকে আশা জাগানো, দুর্বলকে বল যোগানোর স্বপ্ন দেখাতে হবে তাদেরকে। তরুণদের স্বপ্ন দেখতে হবে জীবনকে সুন্দর করবার সাধনায় মেতে ওঠার। তরুণদের জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সবার উপকারে নিয়োজিত হতে হবে।

কারণ, পৃথিবীতে আজও যারা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার উপকারে কাজ করে গেছেন।

তরুণদের স্বপ্ন হবে সবাই যেন মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলে গিয়ে একাত্ম হয়। সবাই একসাথে গেয়ে উঠবে সাম্যের গান "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান"।

তরুণদের স্বপ্ন হবে আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়া। তাদের যেন বিলাস স্পর্শ করতে না পারে। কেননা তাদের বাইরের জীবনের সাথে মিশতে হবে। ঘরে বসে থাকলে চলবেনা। তাদের স্বপ্ন হবে অজানার উদ্দেশে হারিয়ে যাওয়ার, আর তাই-

"গৃহবাসী স্বপ্নরা দূরে থাক
বিলাসের স্বপ্নরা দূরে থাক,
ঘরপোড়া স্বপ্নরা আয় আয়
তরুণেরা হাত ধরি অজানায়"।

কারণ, তরুণ "ভেঙে আবার গড়তে জানে যে চিরসুন্দর।"

দাও ফিরে সে অরণ্য

অনিন্দ্য রহমান
কলেজ নম্বর : ৬৬১১
শ্রেণী : দশম-খ

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহবান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ;
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসার নিষ্ঠুর মরুস্থলে।"

মানব জীবন আর উদ্ভিদ জীবন—প্রাণের এ দুই মহান প্রকাশের মাঝে বাজে একটি মাত্র ছন্দ। বসন্তের দখিন বাতাসে মানুষ তার হৃদয়ের আনন্দানুভূতিকে চিত্রে-সংগীতে কিংবা কবিতায় প্রকাশ করে। আর বৃক্ষ তার বাসন্তী বেদনাকে প্রকাশ করে অশোক পলাশ কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম প্রগলভতায়। উভয়ের আদান-প্রদানের সম্পর্ক

অতি নিবিড়। এক বিপুল ভ্রান্তিবিলাসের জন্য মানুষ তার পরম বন্ধুকে নির্বোধ ঘাতকের মতো হত্যার পৈশাচিক লীলায় মেতে উঠেছে। যার ফলে ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য আর অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন।

প্রাণীর জীবনচক্রে বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। গাছ-গাছালিহীন পৃথিবীতে বৃক্ষের ভূমিকা কল্পনাও করা যায় না। সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কথা। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরির সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। অক্সিজেন জীবের প্রাণ-ধাত্রী, ফলে প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় এক নির্মল, সুন্দর পরিবেশ।

সমসাময়িক বিশ্বে বহুমাত্রিক সমস্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সমস্যা হচ্ছে পরিবেশ বির্পযয়। পরিবেশ বির্পযয় রোধ তথা এর ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী বলেছিলেন "যে ব্যক্তি পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন নয় সে সুনাগরিক হতে পারেনা।

১৯৭০ সালে বিজ্ঞানীরা"গ্রীন হাউস অ্যাফেক্ট" নিয়ে গবেষণা করেন। গ্রীন হাউস অ্যাফেক্ট হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া, শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে বিভিন্ন গ্রীন হাউস গ্যাসের কার্য-কারিতায় পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৪ হতে ৪.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এতে মেরু অঞ্চলের জমাট বাঁধা বরফ গলে যাবে।

ফলে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপসহ অন্যান্য উপকূলীয় দেশের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবে। যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ–এর মাধ্যমেই এই ভয়াবহ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

আমরা যদি আমাদের দেশের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই আমাদের দেশে বনভূমির অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশের বিখ্যাত সুন্দরবন ঐতিহ্যের অধিকারী। ভাওয়াল, মধুপুর সিলেটেও বনাঞ্চল রয়েছে। কিন্তু এগুলোর অবস্থা খুবই ভয়াবহ। ব্যাপকভাবে ও অপরিকল্পিত পন্থায় গাছপালা কেটে ফেলায় দেশের সামগ্রিক বনাঞ্চল কমে যাচ্ছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের যেখানে অন্তত ২৫% বনভূমি প্রয়োজন, সেখানে আমাদের দেশে বনভূমি রয়েছে মাত্র ৮%। তা ছাড়া প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণ বনজ সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে। ফলে এখন গাছের অভাব হচ্ছে, বনাঞ্চল কমে যাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে দেশের প্রকৃতির ভারসাম্য। এভাবে গাছের অবসান ঘটলে দেশের যে কি ভয়াবহ পরিণাম নেমে আসবে তা আমরা চিন্তাও করতে পারছি না।

এছাড়া এই পৃথিবীর আবহাওয়ায়ও ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি যত সহজে প্রবেশ করে, তা দূষণজনিত ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে তত সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না। যার ফলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যার পরিণাম ভয়াবহ। কাজেই পরিবেশ আজ আর কোন সুদূর ভবিষ্যতের সংকেতবাহী নয়, তা আজ প্রতিদিনের মারাত্মক বাস্তব অভিজ্ঞতা। গত দু'দশকে পৃথিবীর পঞ্চাশ কোটি একর অরণ্য নষ্ট হয়েছে। মরুঅঞ্চল তার কলেবর বিস্তৃত করেছে অতিরিক্ত ত্রিশ কোটি জনস্থানে, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পৃথিবীর ঋতুচক্রের উপর। অধিক মাত্রায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে যদি এ পৃথিবীর ক্ষতিকর 'ক্লোরোফ্লুরো কার্বন' এর পরিমাণ হ্রাস করা না যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে এ পৃথিবীর জীবজগতের অস্তিত্ব একেবারেই বিপন্ন হয়ে পড়বে, এখনই বহু প্রজাতির বৃক্ষ ও পশুপাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ তো সর্বনাশের সূচনা মাত্র। একদিন মানুষের জীবন নিয়েও পড়ে যাবে টানাটানি। সমস্ত পৃথিবীই সেদিন পরিণত হবে ভূপাল কিংবা চেরনোবিলের মতো ভয়ঙ্কর গ্যাস চেম্বারে কিংবা ইথিওপিয়ার বৃষ্টিপাতহীন অরণ্যহারা দুর্ভিক্ষের চিত্রে।

এ পৃথিবী আমাদের। এর রক্ষার দায়িত্বও আমাদেরই। ভয়ানক হুমকির সম্মুখীন আমাদের এ পৃথিবীকে আজ আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। আর বৃক্ষরোপণ- অধিক মাত্রায় বৃক্ষরোপণই পারে আমাদের এই পৃথিবীর পরিবেশকে নির্মল, সুন্দর, সজীব করে তুলতে। তাই, আর এক মুহূর্তও অপচয় নয়, আসুন আমরা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আর বৃক্ষ ধ্বংস নয়, এবার কেবল সৃষ্টির পালা। আজ একটি গাছ কাটা হলে আমরা আরও পাঁচটি গাছ লাগাবো, তবেই এ পৃথিবী হয়ে উঠবে শ্যামল, সুন্দর এবং শান্তির আবাসভূমি।

কম্পিউটারের অগ্রযাত্রা

মোঃ তানভীর আহমেদ
কলেজ নম্বর :৭৭০৬
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

গ্রীক শব্দ Compute থেকেই Computer শব্দটি এসেছে। Compute অর্থ হচ্ছে গণনা করা আর Computer অর্থ হচ্ছে গণনাকারী। কম্পিউটার আবিষ্কারের নেপথ্যে বহু মনীষীর বহু শতাব্দীর নিরলস সাধনা বিদ্যমান। কম্পিটারের জনক হচ্ছেন চার্লস ব্যাবেজ, কারণ তিনি ১৮৩৩ সালে কম্পিউটারের ৫টি গঠনতন্ত্র আবিষ্কার করেন। তা হচ্ছে (I) ভান্ডার (II) মিল বাস্টোর (III) কন্ট্রোল (IV) ইনপুট (V) আউটপুট। আর আধুনিক কম্পিউটারের জনক হচ্ছেন জন ভন নিউম্যান। কারণ EDVAC কম্পিউটারের জন্য প্রস্তাবিত জন ভন নিউম্যানের এই স্থাপত্য আজও আধুনিক কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়। বহু গবেষণা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে কম্পিউটার।

পঞ্চাশের দশকের কম্পিউটারকেই বলা হয় ১ম প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৫১-১৯৫৯)। বায়ুশূন্য টিউব দ্বারাই এ সময়ের কম্পিউটারগুলো তৈরী হতো। হাজার হাজার ডায়োড ও ট্রায়োড ভালব, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর দ্বারা তৈরী বলে এদের আকার অনেক বড়। কয়েকটি ঘর জুড়ে থাকত এসব কম্পিউটার, রক্ষণাবেক্ষণ ও উত্তাপের সমস্যা এই প্রজন্মের কম্পিউটারের বড় সমস্যা। এই প্রজন্মের কম্পিউটারসমূহ হচ্ছে univac, IBM 650।

১৯৫৯ সাল থেকে কম্পিউটারে ভালবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরীতে William B. Shokly, Jon Berdeen এবং H. Bratain সম্মিলিতভাবে ট্রানজিস্টর তৈরী করেন। এর ফলে কম্পিউটারের আকার কমে যায় এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পায় এবং তাপ সমস্যার সমাধান হয়। এই প্রজন্মের (১৯৫৯-১৯৬৫) কম্পিউটার সমূহ হচ্ছে IBM 1400, IBM 1600।

তৃতীয় প্রজন্মের (১৯৬৫-১৯৭১) কম্পিউটারে Integrated circuit থাকে যাতে অনেক অর্ধপরিবাহী ডায়োড ট্রানজিস্টার এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ থাকে, ফলে কম্পিউটারের আকার ছোট হয়, দাম কমে আসে, বিদ্যুৎ খরচ কম হয় এবং কাজের গতি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় প্রজন্মে মিনি কম্পিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এই সময় থেকেই কম্পিউটারের সাথে মনিটরের ব্যবহার শুরু হয় এবং Operating system এর উন্নয়ন সাধিত হয়। এই সময়ে out put হিসেবে VDU ও উচ্চগতির লাইনপ্রিন্টারের প্রচলন শুরু হয়। এই প্রজন্মের কম্পিউটার হচ্ছে IBM 360, IBM 370।

বর্তমানে আমরা যে সকল কম্পিউটার ব্যবহার করছি তা হলো ৪র্থ প্রজন্মের (১৯৭১-বর্তমান) কম্পিউটার। এ সময় থেকে কম্পিউটারের অর্ধপরিবাহী মেমরী প্রবর্তিত হয় এর LSI S VLSI প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরী মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহৃত হয়। যার ফলে কম্পিউটারের দাম কমে যায় এবং কাজের গতি বেড়ে যায়, ১ ন্যানো সেকেন্ডেরও কম সময়ে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারে। H. Edward Roberts কর্তৃক ডিজাইনকৃত Altair-8800 কে প্রথম মাইক্রো কম্পিউটার বলা হয়, ৪র্থ প্রজন্মের কম্পিউটার বলতে মাইক্রো কম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটারকে বুঝানো হয়ে থাকে। এ প্রজন্মের কম্পিউটার হচ্ছে IBM 3033, IBM 4341।

কম্পিউটারের আরো উন্নয়নের জন্য বহু মনীষী এখনও নিরলস সাধনা করে যাচ্ছেন, তাদের গবেষণায় ভবিষ্যতের কম্পিটউারটি মানুষের কণ্ঠস্বরের নির্দেশ অনুধাবন করতে পারবে এবং এতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থাকবে।

কম্পিউটারের জগৎ আজ বিশাল, এর বিস্তৃত কর্মকাণ্ড নিয়েই আজকের জগৎ। এর সফল প্রয়োগের মধ্যেই আমাদের অমিত সম্ভাবনা নিহিত। শতাব্দীর এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটিই বলে দিবে কোন পথে আমাদের সিদ্ধি আর কোন পথে আমাদের অনগ্রসরতা।

জুনিয়র উইং এর ছাত্রদের প্রাতঃকালীন শরীর চর্চা

সিনিয়র উইং এর ছাত্রদের প্রাতঃকালীন শরীর চর্চা

কলেজ ফুটবল দল

কলেজ ভলিবল দল

কলেজ ক্রিকেট দল

কলেজ হকি দল

কলেজ বাস্কেটবল দল

কলেজ বাদক দল

অমর একুশে উদযাপন

কলেজ বটমূলে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

সংস্কৃতি সপ্তাহের সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি
দিবা শাখার ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করছেন

কলেজ অডিটোরিয়ামে থিয়েটার (তোপখানা)
নাট্যগোষ্ঠীর মঞ্চস্থ 'তোতারাম' নাটকের
কলাকুশলীদের সাথে অধ্যক্ষ

আনসার একাডেমীতে শিক্ষকদের পারিবারিক বনভোজন

কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষা সচিবের ক্রিসমাস ট্রি রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদযাপন

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহে কলেজের শিক্ষিকা বৃন্দের বৃক্ষরোপণ

রেমিয়েনস পূণর্মিলনী উপলক্ষে অধ্যক্ষ উপহার দিচ্ছেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পররাষ্ট্র সচিব সমসের মুবীন চৌধুরীকে

কলেজ স্কাউট দল

শিক্ষামূলক ভ্রমনে দিবা শাখার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর ছাত্রবৃন্দ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ, একজন শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে লখনৌ সিটি মন্টিসেরী স্কুল ও ডিগ্রী কলেজের উপধ্যাক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

লখনৌ এ ছাত্রদের চতুর্থ আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি কন্ট্রোল কনভেশনের প্লিনারী সেশনে ডঃ ডোনাল্ড ডেওয়ার, ডঃ ডি জে ব্লাকেনশীপ ও অধ্যক্ষ

শিক্ষাভবন-১ এর সামনে বাংলাদেশের মানচিত্র

শিক্ষাভবন-১ এর সামনে পৃথিবীর মানচিত্র

শাপলা সিঞ্চন

কলেজ ক্যাম্পাসের একাংশ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অধ্যক্ষ পুরস্কার প্রদান করছেন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথী মাননীয় শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম ও অধ্যক্ষ

বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী ও অতিথীবৃন্দ

বোর্ড অব গভর্ণরস এর সভায় সভাপতি মাননীয় শিক্ষা সচিব ও সদস্যবৃন্দ।

জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০০২
পরিচালকের সাথে ১ম পর্বে বিজয়ী বিতার্কিক দল

বিকেএসপিতে কলেজ ক্রিকেট দলের সাথে
শিক্ষকবৃন্দ ও অধ্যক্ষ

কলেজ মসজিদে জুমা'র নামাজ

সাপ্তাহিক সমাবেশ

মানুষের কথা

মোঃ শাফায়াত রিজভী

কলেজ নম্বর : ৮৪০৯
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

"মানুষ কী?" প্রশ্নটি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হলে তার কাছে বেশ বিস্ময়কর ও উদ্ভট ঠেকবে। কিন্তু সিংহভাগই যে এর উত্তর দিতে গিয়ে মহাবিপাকে পড়বে, এতে কোন সন্দেহ নেই। 'মানুষ' শব্দটি বাংলা তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শব্দ যা এক বিশেষ জীবের রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরে। মানুষের নামকরণেই তার পরিচয় ফুটে উঠে। মানুষ হচ্ছে সেই জীব যার আছে 'মান' বা মর্যাদা বা আত্মসম্মান এবং যার আছে এটা ধরে রাখার "হুঁশ" বা জ্ঞান বা বিবেক। আর মানুষের মাঝে এ গুণটি আছে বলেই ইসলাম ধর্মে মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে।

মানুষের গঠনকে দুভাগে ভাগ করা যায় বা চিহ্নিত করা যায়। একটি হচ্ছে দেহ নামক একটি কাঠামো এবং অপরটি জীবন বা আত্মা। মানুষের দেহকে এক দামহীন জড় পদার্থ বলতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞান যে এ-কথাকে কোন ক্রমেই মানতে রাজি হবে না, এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তবে কথাটি আমি বিনা যুক্তিতে কারো উপর চাপাতে চাই না। আমার এ কথার যুক্তি হচ্ছে এই যে, জীবন বা আত্মা যতক্ষণ একটি দেহে আছে, ততক্ষণ তা সচল। কিন্তু যখনই কারো আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, তখনই দেহটি সবার কাছে হয়ে যায় মূল্যহীন ও মৃত।

যাই হোক, মানুষ শব্দটি নিয়ে বেশি কথা না বাড়িয়ে এবার আসি তার কর্ম বা জীবনে। জীবন সম্পর্কে বহু কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও জ্ঞানী অনেক কিছু বলে গেছেন। তাই আমি এ সম্পর্কে নতুন কিছু বলার ক্ষমতা রাখি না, তবে ভিন্নভাবে হয়ত বলতে পারব। জীবনকে এক মহাসাগর ধরে নিতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকে হচ্ছি ঐ সাগরে এক একটি নৌকার মাঝি। জন্মের পর থেকেই সে ঐ নৌকা নিয়ে ভেসে পড়ে জীবন সাগরে। এখানে কেউ জানে না সে কতদূর যেতে পারবে। এই সাগরে যে মাঝির নৌকা যত উন্নত ও সজ্জিত, সে আমাদের সমাজে তত বড় পদে অধিষ্ঠিত ও বিত্তবান। আর ঐ সাগরে ডিঙ্গি নৌকার মাঝিরা হচ্ছে এই সমাজের ভাসমান মানুষ। তারা তাদের নৌকাকে নিজে চালানোর বল রাখে না, বরং জীবন সাগরের ঢেউ তাকে যে দিকে নিয়ে যায় সে সেদিকেই যাবে ও যেতে বাধ্য থাকবে। জীবন সাগরে ঝড় উঠলে বড় নৌকার ও জাহাজের মাঝিরা নিজেদের বাঁচাতে পারে। কিন্তু ডিঙ্গি নৌকার মাঝি যারা কিনা ভাসমান মানুষ, তারা কেবল ঐ ঝড়ের কাছে তার ডিঙ্গিটি রক্ষার জন্য আকুলভাবে আরাধনাই করতে পারে।

জীবন সাগরের মাঝে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ। ঐ দ্বীপগুলোতে পৌঁছাই প্রতিটি মাঝির লক্ষ্য। সে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপের লক্ষ্যে ছুটে চলে। যতদিন তার জীবন তরীর ভেসে থাকার ক্ষমতা আছে, ততদিন সে ঐ মরীচিকার দিকে ছুটতেই থাকে। কখনো সফল, আবার কখনো বিফল হয়। কিন্তু তার ছুটে চলা থামে না। সে পর্যুদস্ত হতে পারে ঢেউয়ের কাছে, ঝড়ের কাছে, কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার কাছে নয়।।

জীবনের নানা দিক রয়েছে। সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি রয়েছে, তা হচ্ছে সময়। এই সময় প্রতিটি মুহূর্তে একটি করে অভেদ্য দেয়াল গড়ে যায়। এই দেয়ালকে কেউ ডিঙ্গাতে পারে না, পারে না একে কেউ টপকাতে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত সব সময় সচেতন থেকে এগিয়ে চলা। কেউ যদি কোন ভুল করে তার মনকে দেয়ালের ওপাশে ফেলে আসে, তবে সে কেবল হায় হায় করতে পারবে, এর বেশি কিছু নয়। তাই প্রত্যেকের উচিত সব সময় সামনে এগিয়ে চলা। কেননা যে সময় একবার জীবন থেকে চলে যায়, তাকে আর ফিরে দেখার

কোন অবকাশ কারোরই নেই। যদি কেউ তা করতে চায়, তবে সে শুধু পেছনেই পড়ে থাকবে।

এই জীবনে সুখী থাকার চেষ্টা ও ইচ্ছা সবারই। আর সে-ই সত্যিকারের সুখী হবে যে নিজের অবস্থানে সন্তুষ্ট থাকবে ও নিজেকে ছোট না ভেবে বরং নিজেকে আত্মবিশ্বাসের উপর দাঁড় করাবে। তবে সাবধান হতে হবে যেন এই আত্মবিশ্বাস আত্মদম্ভ ও আত্মগর্বে পরিণত না হয়। যা কিনা সমস্ত ধ্বংস ও অনর্থ সৃষ্টির মূল। তাই জীবনকে সুন্দর করতে হলে প্রথমে একে বুঝতে হবে, তারপর নিজ চিন্তা ও চেতনাকে কাজে লাগাতে হবে। তবেই একজন মানুষ হতে পারবে সফল, হতে পারবে একজন ভাল মানুষ। আর ভাল মানুষ হচ্ছে সেই মানুষ যাকে তার বিবেক বলবে "হ্যাঁ, তুমি মানুষ ও একজন ভাল মানুষ।"

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বনাম মানুষের অধিকার

এস.এম. মিনহাজ উদ-দীন

কলেজ নম্বর : ৭৬৬০

শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

"প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।" নিউটনের গতির এই তৃতীয় সূত্র সার্বজনীন ও সর্বজনসম্মত হলেও সকল ক্ষেত্রে যে প্রযোজ্য নয় তা বর্তমানে অনেকেই জানেন।

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির ফলে বর্তমানে আমরা আমাদের চরম সীমাবদ্ধতাগুলি উপলব্ধি করতে পারি। এমন কোন উন্নত যন্ত্র তৈরি সম্ভব নয় যা একটি নির্দিষ্ট মানের চেয়ে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে পারে।

পদার্থ বিজ্ঞানের তথা ভৌত বিজ্ঞানের নীতিসমূহ বর্তমানে নির্দিষ্ট মাত্রার প্রযোজ্য বিধিরূপে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। সাবেকী পদার্থ বিজ্ঞানের যে নির্ধারণী তথা নিশ্চিত সম্পর্ক নির্দেশকারী রূপ ছিল তা বর্তমান কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞান অনুসারে নির্দিষ্ট সীমায় অনিশ্চয়তাজ্ঞাপনকারী রাশিমালায় পরিণত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, আমাদের পক্ষে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তিকে তথা সকল প্রাকৃতিক বলকে একীভূত করে একটি সাধারণ শক্তি সমীকরণ বা শক্তিসূত্র নির্ণয়ের সময় এসেছে। যার মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট সীমায় প্রাকৃতিক বলসমূহের ক্রমপরিবর্তন ও তৎসংশ্লিষ্ট আবেক্ষক সমূহের সম্পর্ক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি।

ভৌত বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসাবে, বিজ্ঞানসচেতন মানুষ হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা যত সহজ সার্বিক বিবেচনায় একজন মানুষ হিসাবে এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক করা ততোধিক কঠিন। "এ বিশ্বজগৎ আমার কাছে সত্য কারণ আমার নিজের অস্তিত্ব আছে।" মানুষের নিজের কাছে এই তার পরম অনুভূতি। কি প্রয়োজন আছে ব্যয়বহুল গবেষণার যদি আমরা নিজেদের অস্তিত্বই রক্ষা করতে না পারি?

তথ্য প্রযুক্তি ও আণবিক জীব বিজ্ঞানের উন্নয়নে যখন লক্ষ কোটি ডলার ব্যয় হয় তখন শত কোটি মানুষ না খেয়ে থাকে। আমাদের প্রথম কর্তব্যটি প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় অপটিক্যাল ফাইবার লাইন স্থাপন করে কয়েকশত ইরোহার্জের ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক তৈরি— না ঐ মহাসাগরের পাপুয়া নিউগিনি, ফিজি, মিন্দানাও প্রভৃতি দ্বীপের অভুক্ত মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দেওয়া তা ভেবে দেখার সময় এখন এসেছে।

এইচ, জি, ওয়েলস তাঁর বিখ্যাত 'টাইম মেশিন' গ্রন্থে মানব জাতির দুই ভিন্ন প্রজাতিতে বিভক্ত হবার কাহিনী এখন বাস্তব রূপ নিতে যাচ্ছে, ক্রমাগত অবহেলার শিকার যারা তাদেরও বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে। মহাবিশ্বের স্রষ্টা তাদেরও সৃষ্টি করেছেন অফুরন্ত সম্ভাবনাময় করে। এখন সেই যুগ নেই যে যুগে বলা যায়, কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় শ্বেতাঙ্গের বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক ক্ষমতা বেশি। বরং এখন সেই যুগ যখন প্রত্যেক মানুষ বলার অধিকার রাখে "এ মহাবিশ্ব আমাদের, এর প্রতিটি মৌলিক কণিকায় আমাদের প্রকৃতিদত্ত অধিকার বিদ্যমান।"

এই অধিকার কিন্তু আদায় সাপেক্ষ। চার্লস রবার্ট ডারউইনের বিখ্যাত যোগ্যতমের উর্ধ্বতন মতবাদ আজও সত্য। তারই টিকে থাকার অধিকার আছে যার টিকে থাকার ক্ষমতা আছে। এই মহাবিশ্বের পরিষ্কার নীতি।

বর্তমানে মানুষকে শুধু অর্থ ও সম্পদের বৈষম্যে বিভক্ত করা হচ্ছে না, করা হচ্ছে বহুমুখী বৈষম্যে। তথ্যে, তত্ত্বে, সংস্কৃতিতে, প্রযুক্তিতে সকল ক্ষেত্রে উন্নত ও স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

এখন সময় এসেছে এই ব্যবধান মুছে ফেলার, ধ্বংস করে ফেলার এই কূটজালকে। বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের এখন সময় এসেছে বণিকের হাতের পুতুলের বদলে জ্ঞান ও যুক্তির সাধকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠার।

বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য কি তা নিয়ে বর্তমানে কে চিন্তা করে? বরং বিজ্ঞানের প্রয়োগে কত অর্থ কত দ্রুত পুঞ্জীভূত করা গেল তা নিয়ে প্রতিযোগিতার জন্য লোকের অভাব নেই। আবার তেমনি অভাব নেই এমন লোকেরও সারা বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকে অধিকার করে নিজেদের দাবি করে সুপার রেস, শ্রেষ্ঠ জাতি।

শ্রেষ্ঠ জাতির একজনের মূল্য অন্যান্য জাতির হাজার জনের চেয়ে বেশি। তাদের একজন সাংবাদিকের অপহরণের কারণে অন্য দেশের কয়েক হাজার লোক বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে মাসের পর মাস কারাভোগ করে। তাদের একজন নাগরিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে আরেকটি দেশের সহস্র নাগরিকের নগর ধূলিসাৎ করা হয়।

তাদের মনে রাখা উচিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদাররা অতি নির্মমভাবে ধ্বংস হয়। তাদের পরিণতি হয় দানবীয় শক্তির নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তারণের যুগ এসেছে। তবে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে নয় বরং সাম্যের, ঐক্যের পারস্পরিক সহযোগিতার উপকরণরূপে।

বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান সাধকদের মুখোমুখি হতে হবে এক তীব্র সংগ্রামের। এই সংগ্রামের লক্ষ্য হবে মানব জাতিকে এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করা। কিসের সংগ্রাম? কিসের জন্য? আর তা করা হবেই বা কিভাবে? করবেই বা কারা? সেই সংগ্রাম জ্ঞানকে, অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সার্বজনীন করে তোলার। এর উদ্দেশ্য মানব জাতিকে সকল দিক থেকে এক উন্নততর স্তরে পৌঁছে দেওয়া। আর কিভাবে করা হবে? এর উত্তর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সত্তাই জানেন। আমাদের লক্ষ্য জানা আছে, যে ভাবে হোক তা পূরণ করতে হবে। মহাবিশ্বের মহাপ্রভু নিশ্চয়ই আমাদের সঠিক পথ দেখাবেন কারণ আমাদের সংগ্রাম হবে সত্যের, বন্ধন মুক্তির, মিথ্যার বেড়াজাল থেকে সত্যকে বিশাল জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে সঞ্চারিত করার। আর এই সংগ্রাম তারাই করবে যারা মানুষ আর বোধসম্পন্ন মানুষ।

আগামী দিনগুলিতে প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের যেমন নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা করতে হবে, বের করতে হবে সম্ভাবনার নবদিগন্ত তেমনি সেই দিগন্তের নব অরুণোদয়ের আলোকরশ্মি সঞ্চারিত করতে হবে দিকে দিকে।

ভবিষ্যৎ পদার্থবিদ মৌলিক বল আর শক্তির পরিমাণের সম্পর্ক যেমন নিবিড় করবেন তেমনি তার প্রয়োগে মহাশূন্যে বিনা জ্বালানী ব্যয়ে গবেষণাযান প্রেরণ করবেন।

আবার তারই হাতের তৈরি যন্ত্রের মাধ্যমে কোটি মানুষের জীবনে আসবে গতি। রসায়নবিদ যেমন নতুন মৌল আবিষ্কার করবেন তেমনি নতুন খাদ্য তুলে দেবেন অভুক্ত মানুষের মুখে।

আর যারা এই পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দেবে সেই সম্পদের পাহাড় তৈরিকারীদের সম্পদ ভস্মীভূতও করতে হবে তাদের। সেই শক্তিশালীদের শক্তিকে পরাজিতও করতে হবে তাদের।

আমরা তাই একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অবমুক্তির সংগ্রামের বিষয়বস্তু ঠিক করতে পারি।

প্রথমত, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের তথ্যকে যথাসম্ভব সর্বজনগ্রাহী করে তোলা।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিকে বণিকের হাতিয়ারের বদলে পারস্পরিক সহযোগিতার সোপানরূপে ব্যবহার করা।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সার্বজনীন বিকাশের পথের সকল বাধা ধ্বংস করা।

চতুর্থত, ক্রমবর্ধমান শক্তি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস খুঁজে বের করা।

পঞ্চমত, জীবদেহকে রোগমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রোগ্রামাইজড অণু যন্ত্রাংশের ব্যবহার কোন নির্দিষ্ট জীবদেহে অনুপ্রবেশকারী যে কোন বহিঃস্থ পদার্থ যা জীবদেহের ভারসাম্য বিনষ্ট করে তাকে ধ্বংস করতে বা প্রশমিত করতে পারে।

ষষ্ঠত, চিকিৎসাবিজ্ঞানকে একটি অনুমান নির্ভর শাস্ত্রের বদলে সুস্পষ্ট বিধান রূপে গড়ে তোলা।

সপ্তমত, গণিতশাস্ত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন রাশির মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ নিখুঁতভাবে নির্ণয়।

অষ্টমত, প্রাকৃতিক বলের একীভবনের মাধ্যমে শক্তিসূত্র প্রণয়ন।

এগুলি সম্ভব হলে মানব জাতি মোটামুটিভাবে একটি সাম্য ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী পৃথিবী পাবে যাতে প্রত্যেককেই অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। প্রত্যেকেই যথাযথ গুরুত্ব পাবে।

মানবজাতি তখন হবে একটি অখণ্ড দেহের ন্যায়। এর কোন অংশের আঘাতে যেমন সম্পূর্ণ অংশ ব্যথা পায় তেমনি সকল মানুষ পরস্পরের সমব্যথী হয়ে উঠবে।

তখনই সময় আসবে বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য পূরণের। তখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে মহাবিশ্বের মৌলিক বিধি নির্ণয়, তখনই আমরা পারব পরম সত্তাকে অনুভব করতে।

একজন বিজ্ঞানীর জীবনের চরম লক্ষ্য তো এই হওয়া উচিত যে, সে মহাবিশ্বের স্রষ্টা পরম সত্তাকে উপলব্ধি করবে। কিন্তু সেই পরম ও মহাশক্তিশালী সত্তা ততক্ষণ আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে যতক্ষণ না আমরা আমাদের মধ্য থেকে সকল অত্যাচার, অন্যায় আর বৈষম্য দূর করতে পারি।

হে সর্বজ্ঞ সত্তা, এই সংগ্রামকারীদের সাফল্য দান করো।

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব

খালেদ বিন সাহাবুদ্দিন
কলেজ নম্বর : ৮৪১৪
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

মানুষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সে জানতে চায়। মানুষ তার নিজের এবং তার চারপাশের জগত সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চায়। এটি মানুষের সহজাত একটি প্রবৃত্তি এবং একারণেই আমরা দেখি, কোন অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফেরার পর, প্রথম সে যে প্রশ্নগুলো করে সেগুলো হচ্ছে- "আমি কোথায়? আমি এখানে কেন? এখানে আমি কিভাবে আসলাম?" তেমনি এই পৃথিবীতে আসার পর হয়ত-বা কোনও একসময় এই তিনটি প্রশ্ন আমরাও করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমাদেরকে কেউ ঠিকমত ব্যাখ্যা করে বোঝায়নি- "আমরা আসলে এখন কোথায়? আমরা এই পৃথিবীতে কেন এসেছি? কিভাবে আমি এখানে আসলাম?"

এই তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর জানবার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন, আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? এই বিশ্ব, মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? নাকি এতসব কিছু আপনা আপনিই তৈরি হয়েছে? যদি বা কেউ সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তিনি কেমন, তাঁর বৈশিষ্ট্য কী?

আমাদের মধ্যে যে বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, চিন্তা করার যে ক্ষমতা আমাদের মধ্যে রয়েছে, তা দ্বারা খুব

সহজেই বোঝা সম্ভব, আসলেই সৃষ্টিকর্তা আছেন কিনা।

যদি আমরা শুধু এই পৃথিবীর কথাই চিন্তা করি। তাহলে, আমরা জানি, এই পৃথিবীর সকল কিছু ১০৯টি মৌলের বিভিন্নরকম বিন্যাসকৃত বা বন্ধনযুক্ত পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো-এই ১০৯টি মৌলই বা কে তৈরি করল? আমি যদি একটি বাক্সকে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করে কোটি কোটি বছরও রেখে দেই, তাহলে কোন কালেও বাক্সের ভিতর কোন কিছুর সৃষ্টি হবেনা, যদি না কেউ বাক্সের ভিতর কিছু রাখে। তেমনিভাবে, এই মহাবিশ্ব যদি একটি ক্ষুদ্র কণা থেকেও সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সেই ক্ষুদ্র কণাটিই বা কে সৃষ্টি করল? তার মানে, অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন- যৌক্তিকভাবে প্রমাণিত হল।

এখন আমাদের জানা প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তার বৈশিষ্ট্য। চারপাশের জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি, সকল সৃষ্ট জীব ও জড় পদার্থের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে- প্রতিটি সৃষ্ট জীবেরই সৃষ্টি হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং ধ্বংস হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। অর্থাৎ, কোন সৃষ্টিই চিরস্থায়ী নয়। তেমনি সৃষ্টিকর্তাও যদি কারও দ্বারা সৃষ্ট হতেন, তাহলে তাঁরও একটি জন্মকাল ও মৃত্যুকাল থাকত। কিন্তু, তাহলে তো- উনি আর সৃষ্টিকর্তা হলেন না, হতেন আমাদের মতনই একজন সৃষ্টি। সুতরাং, সৃষ্টিকর্তা হবেন এমন একজন, যিনি কারও দ্বারা সৃষ্ট নন।

এপর্যন্ত, আমরা লজিক্যালি প্রমাণ করলাম যে, এই মহাবিশ্ব তথা সকল কিছুর পেছনে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। যিনি কারও দ্বারা সৃষ্ট নন, কিন্তু, সকলই তাঁর সৃষ্টি।

এখন, বাস্তবভিত্তিকভাবেও আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের চারপাশের সকল সৃষ্ট জিনিসেরই কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন– জীবনধারণের জন্য আমাদেরকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। আমরা টানা ১০ দিন না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি না। আমাদের ওজন, উচ্চতা, শরীরের তাপমাত্রা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হয়। কোন সৃষ্টিই একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুই জায়গায় অবস্থান করতে পারে না। অর্থাৎ প্রত্যেকটি সৃষ্টিই নানা সীমাবদ্ধতায় সীমাবদ্ধ এবং এই সীমাবদ্ধতা কেউ একজন তাদের মাঝে তৈরি করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে আমরা বলতে পারি, সৃষ্টিকর্তার মাঝেও যদি কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকত, তবে তিনি সৃষ্টিকর্তা হতেন না, হতেন আমাদেরই মতন কোন সৃষ্টি। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা হবেন এমন একজন যার মধ্যে কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা নেই।

এপর্যন্ত আমরা যে তিনটি বিষয় (একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, যিনি কারও দ্বারা সৃষ্ট নন, কিন্তু সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনি এবং তাঁর ক্ষমতা অসীম) প্রমাণ করলাম, তার ভিত্তিতে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর জানা সম্ভব, যদি কেউ একটু চিন্তা করে।

এখন সৃষ্টিকর্তা কি একজন নাকি একাধিক? এর উত্তরও খুব সহজেই দেয়া যায়- সৃষ্টিকর্তা যদি একাধিক হতেন তাহলে তাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধতা চলে আসত। কেননা তাঁদের উভয়ের অস্তিত্বই উভয়ের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু, একটু আগেই আমরা প্রমাণ করে এসেছি- সৃষ্টিকর্তা হবেন এমন একজন, যাঁর মাঝে কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা নেই। সুতরাং, সৃষ্টিকর্তা একাধিক হতে পারেন না। অবশ্যই তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

এখন, আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই— আমরা আমাদের জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করি উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা প্রিয় মানুষের ইচ্ছের ভিত্তিতে। কিন্তু, আমরা যে জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করছি, সেটার সত্যতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে আমরা কখনও চিন্তা করি না, সত্যতা যাচাই করি না। এজন্য আমাদের একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা যে তিনটি সত্যে উপনীত হয়েছি, আমাদের দেখা প্রয়োজন কোন ধর্ম এ তিনটি সত্যকে স্বীকৃতি দেয়।

নিরপেক্ষভাবে তাকালে আমরা দেখতে পাই; একমাত্র ইসলামই এ তিনটি বিষয়কে সত্য বলে আমাদের সামনে হাজির করেছে। একমাত্র ইসলাম ধর্মই বলে, আল্লাহ্ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, যিনি অনন্তকাল ধরে আছেন এবং অনন্তকাল ধরে থাকবেন, তিনি এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয় এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাই, মুসলিম,

অমুসলিম-আমাদের সকলের একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। অন্ধভাবে কিছু বিশ্বাস না করে, বিবেক বুদ্ধি, যুক্তি দিয়ে আমরা যে সত্য দেখতে পাই, আমরা যেন তা বিশ্বাস করি। একজন বিজ্ঞানী যদি একটি যন্ত্র তৈরি করেন, তবে তিনিই সবচেয়ে বেশি ভাল জানবেন, যন্ত্রটির নাড়ি-নক্ষত্রপর্যন্ত। তেমনি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাই, আমাদের সকল বিষয়ে তাঁরই সবচেয়ে বেশি জানবার কথা। তিনিই বলতে পারেন, এই পৃথিবীতে আমরা কেন এসেছি?পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

'আমি জ্বীন ও মানুষ জাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।"

তাই, আমরা যারা মুসলমান, আমরা কি বাস্তবিকই আল্লাহর ইবাদত করছি? দিনের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে কি আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলি? আল্লাহর অস্তিত্ব ও জান্নাত-জাহান্নামের চরম সত্যকে জেনেও আমরা কেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে গ্রহণ করছি না আমাদের জীবনে? আমাদের একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। মৃত্যুকে কি আমরা ভয় করি না? তাহলে, নিজেদেরকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করছি না কেন? পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

"আল্লাহ কারও অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজে পরিবর্তিত হওয়ার চেষ্টা করে।"

কিছু অপ্রিয় সত্য

এ,কে,এম, আরাফাত
কলেজ নম্বর : ৮৪৩৬
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

যাকে প্রতিরোধ করা যায় না কিংবা এড়ানো যায় না তাকে ধ্বংস করার একটা অবদমিত ইচ্ছে থাকে মানুষের। মানুষের প্রয়োজনে এবং তা একান্তই খোলসমুক্ত পরিপূর্ণ শোধিত ইচ্ছার অন্তঃপ্রকাশ।

যা নিয়ে ভাবি তা যদি সকলের ভাবনার বিষয়বস্তু হতো, বিশেষ করে প্রত্যেকটা অচেতন নাগরিকের, তাহলে আরও কয়েক যুগ পূর্বেই বাংলা-মায়ের কল্যাণ সাধন হতো বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ। জীবন সম্পর্কে অচল ধারণা পোষণ করাই যেন আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত কিংবা ঐশ্বরিক রূপে অর্জিত যাই হোক না কেন পৃথিবীর কোন এক ক্ষুদ্র অংশে পড়ে থেকে নিজেদের মধ্যে হানাহানি, মারামারি করতে আমরা যে অনভ্যস্ত নই সেটা একদম সত্য। নচেৎ উন্নতির স্বাদ আস্বাদনের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন পরম মঙ্গলের বিপরীতে স্থান লই, কেনই বা হিতসাধনে তৎপর হয়েও অহিতকর কার্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। অবসরে এইটুকু বিশ্লেষণে আমরা কেউ কি কখনো সামান্য সময় নষ্ট করেছি? তাহলে কি বলব আমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবেই কল না হয়ে বিকল হয়ে আছি? কলুষিত সজ্ঞার কাছে প্রশ্ন।

আমাদের জীবনধারা একেবারেই নিশ্চল, টলমল আর স্থবিরতায় পরিপূর্ণ। অযাচিত আশা–আকাঙ্ক্ষার দুর্ভাবনায় বহুদিনের অর্জিত জ্ঞানরাজ্যের পরিধি ক্রমশ নিস্পন্দিত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে অসংলগ্নভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর পরিপুষ্ট জ্ঞানসাম্রাজ্যের অধিপতিদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপের অসাধু উপায় অবলম্বন। এদেরকে নদীতে কাঠ নির্মিত মালবাহী নৌকার মাঝিরূপে কল্পনা করাই অধিকতর শ্রেয়। এই মাঝিরা নৌকার পাটাতনের উপর বসে নৌকাবোঝাই ভারসমূহ এক তীরে রেখে পুনরায় অন্য তীরে যাওয়ার জন্য নদীর নির্বাক তীরকে চোখা বাঁশ দ্বারা আঘাত হানে। তা শুধু নিজেদের আত্মার তুষ্টি অর্জনের সপক্ষে জোরালো আবেদন ব্যতীত ভিন্ন কিছু নয়। এই কি হওয়া উচিত মানবমনের নিগূঢ় তত্ত্ব। এইভাবে জড়তার আশ্রয়ে নিজেই নিজের এবং দেশ ও দশের কল্যাণবিমুখী কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত থেকে বাহাদুরী দেখানোর কোন মানে হয় না। জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সাথে অন্যের মনের জীর্ণতা,শীর্ণতাকে কোমলভাবেই ত্যাগ করতে হবে।

আমাদের দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা ময়ূরপুচ্ছ ধারণকারী, যারা কিছুক্ষণের সুখে, অরেঞ্জড্রিঙ্ক, লেম-নড্রিঙ্ক পান করে আর হলুদ হাসি হেসে যতসব আনন্দের ঔদার্যবশত নিয়ম-নীতির প্রবর্তন করেন তাদের সবসময় অচেতন না থেকে সচেতন থাকা জরুরী। নচেৎ আমাদের এই দেশ অচিরেই ভস্মীভূত হবে এটা নিশ্চিত। বই-পত্রে লেখা এক টুকরো বোল আজকে আমার ভীষণভাবে মনে পড়ছে। তাহলো "বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। আরো একটা জিনিস ভাবছি আমাদের ছেলেবেলায় শিখানো এই ভাবসম্প্রসারণটুকু হাতির তৈজস পত্রের মতই বইয়ের পাতায় সাজানো আছে। আমাদের এখানে প্রযোজ্য কর্মবিশেষ তো বইয়ের কোন দেশ অনুকরণ করতে যায় না। তবে আমরা কেন যেচে যেচে তাদের শুভ নিয়মনীতি আমাদের এখানে অশুভরূপে প্রকাশ করি। আমরা আমাদের অস্তিত্বকে ভুলে যাবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি নিজেরাই নিজেদেরকে বাহ্‌বা দিতে কারণ আমরা সঠিকভাবেই তাদের পায়ের ধুলো মুছে একদম স্বচ্ছ করে দিয়েছি।

অর্থলিপ্সা আমাদের কোনদিনও যাবে না। কারণ মনোজগতে পিনবদ্ধ আমাদের এই হীন আচরণটিই আমাদের এতদিনকার কর্মকাণ্ডের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। সার্বিক ব্যাকুলতা আমাদের ঐ জিনিসকেই ঘিরে। পথ যত বন্ধুর হোক না কেন ঐ পথে আমরা সকলেই সমভাবে বিজয়ীবেশের বরমাল্য গলায় ঝুলাই। অথচ একবারও ভেবে দেখি না। ঘোড়দৌড়ের কথা। আমরা সকলেই সেই মঞ্চের সামনের মাঠে ঘোড়া হতেও নারাজ নই। যেন নিষ্ঠুর কোন এক খেলার সস্তা মহড়া চলছে এখানে। যেন নৈরাজ্যের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে আরও একটি ভয়ার্ত ঘোড়া।

সন্ধ্যায় অতিথিদের জন্য আয়োজিত আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় থাকে একই বর্বরতা। দেশীয় সংস্কৃতির তৈরী পানীয় পান করেই চলছে বিদেশী সংস্কৃতির সমাবর্তন। আমাদের রূপ, রুচি, মধুনির্মিত অনিমেষ পলক এখন অন্যজগতের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। সেখানে উত্থিত হতেই আমাদের আজকের প্রতিযোগিতা। আগে আমাদের ঢোল বাজাতো ঢুলিরা, আর মনোরম পরিবেশে শান্ত কোমল, পেলব অধরে ফুটে উঠতো বাংলা মায়ের বর্ণনা। কিন্তু এখনকার সংগীতে মুখরিত আকাশ পাতাল কেঁপে উঠে ঠিকই, সাথে সাথে তা উথলিয়ে আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায়, যেখানে কালো কোকিলের অবস্থান একবারেই নেই। এমনভাবে তা আমাদের ইন্দ্রিয়কে তাড়িত করে যেন বহু বছরের ক্ষতি একদিনেই সাধিত হবে। স্বদেশের নিসর্গে বাস করেই অপরাপর হীন মস্তিষ্কের কাজগুলো আমরা অত্যন্ত সুনিপুণভাবেই করে থাকি। এভাবেই আমরা আমাদেরকে মিথ্যা অলংকারে অলংকৃত করি। অনুপম সৌন্দর্যের ধারা মাঝে মাঝে প্রত্যাখ্যাত হয় যখন মানুষের অন্তর্কোঠাকে ঘন কুয়াশা পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে। আর প্রমাণ করে আমরা জাতি হিসেবেই সৌজন্যবোধ ভুলে থাকি। তাছাড়া আমাদের উদ্দেশ্যেই থাকে ঘাপলা। আমরা জল খেয়েই দুধের স্বাদ পেতে চাই। এ যে কত বড় বিড়ম্বনা।

এ জনমে না হোক জন্মান্তরেও হয়তো কেউ এসব সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠা করবে। একদিকে বিষাদ, অবসাদে জীবন নির্বিকার, মহাশূন্যতায় সমর্পিত, আর অন্যদিকে নির্মমতার অন্তরালে মমতার হাতছানিতে কুসুম কুসুম স্বপ্নিল আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্বলিত ভঙ্গিতে জ্বলে উঠতে হয়তো আমি একা পারব না তথাপি প্রতিকার যখন হয়নি তখন সকলে মিলে এর প্রতিরোধ করাটাই হবে এখনকার মত সকলের কর্তব্য। জীবনকে এভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে এসো সকলে মিলে মতের ঐক্য গড়ে তুলি—

"গড়ব মোরা মোদের দেশ
ভুলে গিয়ে হিংসা, দ্বেষ
আর সইব না নীরব ক্লেশ।"

প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মকানুন

কামরুন নাহার খানম
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ (দিবা)

প্রায় সাড়ে চারশ' কোটি বছর আগে সূর্য হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে পৃথিবী তার এক নিজস্ব নিয়ম সৃষ্টি করেছে। গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল, তরল থেকে কঠিন রূপ নিয়ে পৃথিবী প্রাণবৈচিত্র্যে নিজেকে কোলাহলময় করে তুলেছে। সবুজে সুন্দরে ভরে নিয়েছে নিজেকে। তারপর কেবলই আপন খেয়ালে নিজস্ব নিয়মের মধ্যে চলছে কোটি কোটি বছর ধরে।

এই বিশাল মহাবিশ্ব এক কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সে নিয়মের ব্যতিক্রম কোথায়ও নেই। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারদিকে ঘুরছে অসংখ্য নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সির অন্তর্গত নক্ষত্ররাও স্থির নয় । তারাও নির্দিষ্ট কক্ষপথে পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে এবং পরিভ্রমণ করছে গ্যালাক্সির চারদিকে। এদিকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তার গ্রহরা এবং গ্রহদের প্রদক্ষিণ করছে তাদের উপগ্রহসমূহ। কেবল তাই নয়, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

পৃথিবীও সূর্যের একটি গ্রহ এবং তাকে মহাবিশ্বের যাবতীয় নিয়ম পালন করতে হচ্ছে। তাই তার সংসারে যাদেরই অবস্থান তারা সবাই এই নিয়মের অধীন। জীব (প্রাণী ও উদ্ভিদ) তো বটেই, জড়বস্তুও বর্হিভূত নয় সেই নিয়মের আওতা থেকে। প্রবহমান নদীর স্রোত, ঝরনার অবিরাম কলধ্বনি, অরণ্যের শ্যামলিমা, ফুলের মাধুরী, পাখির কলকাকলি, সবার মধ্যে আছে নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং একটা কার্যকারণ সম্পর্ক। এমনকি পার্থিব সকল শক্তির মূলাধার ওই সূর্যের মধ্যেও আছে নিয়ম-শৃঙ্খলা। পৃথিবীর স্থলভাগের বারিধারাকে নদী বহন করে নিয়ে যায় সাগরে। আর সূর্যকিরণের তাপ তাদের পৌঁছে দেয় মেঘের কাছে। পানি নেমে আসে বৃষ্টি হয়ে। এ এক আশ্চর্য চক্রপথ।

বৃষ্টির পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করে কঠিন শিলাস্তরে বাধা পায়। কখনও কখনও বেরিয়ে আসে ঝরনার আকারে। তারপর মিশে যায় সাগরের পানিতে। সূর্যকিরণের উপস্থিতিতে বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইড থেকে অঙ্গার গ্রহণ করার জন্য বৃক্ষের পাতায় পাতায় সবুজকণার অবস্থান। খাদ্য তৈরির জন্য সে কেবল কার্বনকে নেয় আর বাতাসকে ফিরিয়ে দেয় অক্সিজেন। জীবজগৎ শ্বাসকার্যের জন্য গ্রহণ করছে অক্সিজেন আর বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে কার্বনডাই অক্সাইড। এখানেও সেই চক্রপথ।

ফুলের এত শোভা, পাখির এমন মন-মাতানো গান, তার মধ্যে নিহিত আছে বংশরক্ষার তাগিদ। কেউ হারিয়ে যেতে চায় না, প্রকৃতিও চায় না কাউকে নিঃশেষ করে ফেলতে। সবাই বেঁচে থাকে আপন সন্তানের মধ্যে। অতি সূক্ষ্ম ভাইরাস থেকে অতি বৃহৎ নীল তিমি পর্যন্ত সবার মধ্যে আছে বংশরক্ষার তাগিদ। আর জড় পদার্থের জন্ম ও মৃত্যু না ঘটলেও রূপান্তরের মাধ্যমে নব নব রূপে সেগুলো প্রকাশ পায়। ফুল ফোটে, ফুল থেকে ফল বের হয়, ফল থেকে জন্ম নেয় গাছ। সেই গাছ আবার একই ধরনের ফুল ও ফল জন্ম দেয় । জীব তার আপন আপন আকৃতির অনুরূপ সন্তানের জন্মদান করে। সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায় পিতামাতার বৈশিষ্ট্য । যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই নিয়ম। জীবের দেহটার বিনাশ ঘটলেও পরোক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় তার বিনাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে সে অমর, সে অবিনশ্বর। আপন বংশধারার মধ্যে বেঁচে আছে চিরকাল।এখানেও একই চক্রপথ।

আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও দেখা যায়, অতিবড় যে শক্তিমান ও মহাদীপ্ত নক্ষত্র-সেও এক সময় নিভে যায় চিরতরে। ধ্বংস হয়ে যায় তার গ্রহজগৎ। কিন্তু ধ্বংসের মধ্যে নিহিত থাকে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা। বিশাল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার প্রসারণও চিরকাল অব্যাহত থাকবে না । একদিন শুরু হবে সঙ্কোচন। সঙ্কোচন যখন চরমে উঠবে, ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু। তখন আবার তা প্রসারিত হতে শুরু করবে। পুনরায় নব নব নক্ষত্রজগৎ সৃষ্টিতে ব্যাপৃত হবে বিশ্বপ্রকৃতি-এই মতই প্রচার করছেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ সবই সেই চক্রে বন্দী।

বিশাল এই মহাবিশ্বের অনন্ত রহস্যজাল ভেদ করা মানুষের ক্ষুদ্র শক্তির বাইরে। শুধু জানা গেছে, তার প্রতিটি আঙ্গিনায় নিয়ম এবং শৃঙ্খলা। মহাবিশ্বমাঝে পৃথিবী যত ক্ষুদ্র আর যত তুচ্ছ হোক না কেন নিয়ম তাকেও পালন করতে হচ্ছে। আর পৃথিবীর মানুষ? সেও বাঁধা কঠোর নিয়মের মধ্যে। সে নিয়ম পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার নিয়ম, বেঁচে থাকার নিয়ম। পার্থিব পরিবেশও নিতান্ত জড় নয় তাকেও যথানিয়মে পরিবর্তিত হতে হচ্ছে। সে পরির্বতন অতি সূক্ষ্ম ও অতি মন্থর। তার জন্য পার হয়ে যায় কোটি কোটি বছর। সেও আবর্তিত হচ্ছে চক্রপথে। কোথায়ও তৈরি হচ্ছে মরুভূমি, আবার কোথায়ও মরুভূমির বুকে জেগে উঠছে নতুন প্রাণস্পন্দন। মেরুদেশের পরির্বতন হয়, নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে, নতুন দ্বীপের জন্ম হয়, পুরাতন দ্বীপ হয় জলমগ্ন। এভাবে বিলীন হয়ে গেছে মহাদেশ। সাগরের বুকে জেগে উঠেছে বিশাল পর্বতমালা ।

আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতির কোন কোন কাজ খেয়ালিপনা বলেই মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রতিটির ক্ষেত্রে আছে কার্যকারণ সম্পর্ক। অর্থাৎ কোনকিছুই নিয়ম বহির্ভূত নয়। চিরকাল যা ঘটে চলেছে, ভবিষ্যতে তা ঘটতে থাকবে। বোধহয় ব্যতিক্রম ওই 'মানুষ' নামে প্রাণী। নিয়ম ভাঙার প্রবণতা কেবল তারই। তার তীক্ষ্নবুদ্ধি এবং স্বার্থপর মনোভাবই প্ররোচিত করেছে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করতে। আবার, যুগে যুগে কিছু চিন্তাশীল মানুষই মানুষের চলার পথে মানবিক গুণাবলীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সমাজের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করেছেন।

এত জ্ঞানার্জন সত্ত্বেও মানুষ মাঝে মাঝে বিস্মৃত হয় যে, নিয়ম রক্ষার মূলে আছে তার নিজেরই বাঁচার তাগিদ। সে বুদ্ধির জোরে পৃথিবী জয় করেছে। কিন্তু সভ্যতার নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পেষিত হচ্ছে নিবিড় বন, মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং সাগরতল। কলুষিত হচ্ছে পৃথিবীর মাটি পানি ও বায়ু। পরিত্রাহি চিৎকার জুড়েছে সমগ্র জীবজগৎ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম কানুনের সংখ্যা বড় কম নয়। ভয়ঙ্কর সে সব নিয়ম-কানুন। মানুষ বুদ্ধিবলে জেনে নিয়েছে তাদের অনেক কিছু এবং অতিক্রমও করতে চাইছে সকল বাধা। মানুষ নিয়ম ভেঙে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে দুর্বার স্রোতকে রুদ্ধ করছে । আকাশের মেঘকে টেনে নামিয়ে এনে বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে। সার প্রয়োগ করে অধিক ফসল ফলাচ্ছে। অরণ্যকে ধ্বংস করে নগরের পত্তন করছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে তোলপাড় করছে এমনই আরও কত কী! কিন্তু প্রতিটি ক্রিয়ার আছে সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া । আবার নিয়ম ভাঙার পরও নতুন নিয়ম প্রযোজ্য হয়। বিশেষ বিশেষ নিয়মে পরিচালিত কোন ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম আরোপিত হলে সর্বত্র একটা চাঞ্চল্য কিংবা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারলে বিপ্লবের রূপ নেয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না । যতক্ষণ না সামঞ্জস্য ঘটছে ততক্ষণ প্রতিক্রিয়া চলতেই থাকবে।

প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করতে পারছে বলে মানুষের আত্মতৃপ্তির কোন কারণ নেই, উল্লসিত হওয়ারও অবকাশ নেই। দৈবশক্তির অধিকারী মনে করে গর্ব করা বৃথা। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করলে মনে হবে, এ যেন ভয়ঙ্করের সূচনা অথবা মহাবিপ্লবের সূত্রপাত। সেক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনকারীর ধ্বংসও অনিবার্য।

একআধটু পরিবর্তনে অবশ্য কোন ক্ষতি হয় না। প্রচুর নিয়মের মধ্যে একটির সামান্য রদবদল একেবারে নিয়মমাফিকভাবে প্রকৃতি শুধরে নেয়। সে পরিবর্তন অবশ্য ক্ষমতার মধ্যে হওয়া চাই। রোগজীবাণু প্রশমিত করতে দেহে যেমন নতুন নিয়ম তথা 'অ্যান্টিবডি' গঠিত হয় (যদিও আক্রমণ জোরদার হলে ব্যর্থ হয় বাধা দিতে), তেমনই যদি বড় রকমের পরিবর্তন আসে, তখন প্রকৃতিকে 'আত্মসমর্পণ' করতে হবে পরিবর্তনের কাছে।

যেহেতু আজ পরিবর্তনের সবেমাত্র সূচনা, তাই শুরুতে সাবধান হতে পারলে বিপ্লব দাবানলের আকার গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে। একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে তুষের আগুনের মত যা ধিকি ধিকি জ্বলছে, সামান্য পানির ছিটা দিলে অচিরেই নিভে যাবে সে আগুন। অতএব আমরা এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, যে সময় আমাদের সবারই জানা দরকার, প্রাকৃতিক নিয়মকানুনগুলি এবং সবাইকে একযোগে সচেষ্ট হতে হবে সেই নিয়মগুলিকে রক্ষা করতে। তবেই বজায় থাকবে আমাদের গতি, অটুট থাকবে আমাদের বংশধারা।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সবই ওলটপলট হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার আফসোসের সুরে বলে 'ঘোরকলি!' আমাদের ছেলেবেলায় এত ঘন ঘন খরা-বন্যা হতো না। নিয়মিত বৃষ্টিপাত হতো, সার না দিয়েও প্রতি একরে প্রচুর ধান হতো। আর আজ! খরা লেগেই আছে। বৃষ্টি আদৌ হচ্ছে না। আষাঢ়ের কর্দমাক্ত পথঘাট, শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণ, কার্তিকের প্রথম দিকে সাধারণভাবে একপশলা বৃষ্টি, এ তো কবেই ভুলে গেছি। শুধু কি বৃষ্টি! এক-এক বছর আশ্বিনের শেষেও গরম ও গুমোট থাকে, অগ্রহায়ণের ভোরেও গায়ে চাদর জড়ানোর দরকার হয় না, হাড়-কাঁপানো শীতও পড়ে না আগেকার মত। কেন এমন হচ্ছে?

একটু ভালভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগে দেশে বন তথা গাছপালার সংখ্যা ঢের বেশী ছিল। শহরে শহরে এত কলকারখানা ও বাস-লরি ছিল না। অঢেল ছিল ফাঁকা জায়গা। বড় বড় গাছ থেকে আরম্ভ করে ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছিল পল্লীর পথঘাট। সেদিন যে সব জায়গায় দিনদুপুরে শেয়াল ডাকত, ভেতরে ঢুকতে গা ছমছম করত আজ সেখানে চাষের জমি, নয়ত রাতদিন জ্বলছে বিদ্যুৎবাতি।

জনসংখ্যার চাপে পতিত জমি একটিও রাখলাম না, দাম পেয়ে এবং আসবাবপত্রের চাহিদা মেটাতে বড় বড় গাছ কেটে লোপাট করে দিলাম। শিরীষ, শাল, সেগুন প্রভৃতি গাছের কাঠ-যার আদৌ চাহিদা ছিল না তাকেও কাজে লাগলাম। অতএব সুবৃষ্টির আশা করবো কেমন করে? বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় বড় বড় গাছ বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প ত্যাগ করে বলে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে, জলদ মেঘকে আকর্ষণও করতে পারে। তাহলে প্রকৃতির নিয়মগুলি আপনা হতে ভাঙছে বলা যায় না। আমরা নিয়ম ভঙ্গ করছি, আর প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায় নিয়মমাফিক নিয়ম প্রযুক্ত হচ্ছে।

অপরদিকে গাছপালার সংখ্যা যেমন হ্রাস পেয়ে চলেছে, তেমনই দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা এবং তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে কলকারখানা। শহরে বন্দরে তো দূরের কথা সুদূর পল্লীতে পল্লীতে এখন উঠছে কারখানার কালো ধোঁয়া। গড়ে উঠেছে ধানভাঙার কল। স্থাপন করা আছে শ্যালো বা ডীপ টিউবওয়েল। উনানে পুড়ছে কাঠ ও কয়লা। অতএব বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। বায়ু শুদ্ধ করার জন্য যে পরিমাণ গাছপালার দরকার, তা প্রকৃতির ভাণ্ডারে নেই। ফলে পরিবেশ তো গরম হবেই!

হিসাবে দেখা গেছে, বিগত দশ বছরে বায়ুতে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ০.০১২ ভাগ। সেই কারণে এবং বায়ুমণ্ডলে ধূম ও ধূলির পরিমাণ বেড়েছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের উষ্ণতা বেড়েছে ০.১৪ সেন্টিগ্রেডের মত । পরিমাণটা যদিও নগণ্য তবু বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, এইভাবে চলতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে হবে দ্বিগুণের মত। আজ এত অল্পেই যদি এমন বিপর্যয়ের

সূচনা হয় তাহলে পঞ্চাশ বছর পরে পার্থিব পরিবেশটা কেমন হবে!

ধরা যাক, আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পরের দিনগুলির কথা। সেদিন গাছপালার আরও বিলুপ্তি ঘটবে, শহরের সংখ্যা বেড়ে উঠবে, হয়ত হাজার কোটিতে গিয়ে পৌছুবে পৃথিবীর জনসংখ্যা, কলকারখানায়, ছেয়ে যাবে পৃথিবীর বুক, আরও বিষিয়ে উঠবে পৃথিবীর বায়ু, প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠবে পৃথিবীর পরিবেশ। সে রকম একটা অবস্থায় যদি রুখে দাঁড়ায় প্রকৃতি। যদি প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয় ঝড়ঝঞ্ঝা ও বিপুল জলরাশি নিয়ে? তখন কী দাঁড়াবে?

মানুষের অমরত্ব তার উত্তরপুরুষদের ওপরই নির্ভর করছে। সেই উত্তরপুরুষদের আমরা কী দিয়ে যাচ্ছি? বুক ভরা বিষ! বিষ পান করে তারা কি নীলকণ্ঠ হতে পারবে? অথবা বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে? কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায় আমাদের এখনই 'অঙ্গীকার' করতে হবে, যাতে নবজাতকদের কাছে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে পারি। তা না হলে আমাদের ধন-মান-যশ আর আকাঙ্ক্ষার এইখানেই সমাপ্তি ঘটবে।

প্রথম স্টকটেকিং

জেহিন বেগম
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

১৯৯১ সালে আমি এই কলেজে জয়েন করি। সে বছরই প্রথম বাৎসরিক 'স্টকটেকিং' করি। আমাদের টিম লিডার ছিলেন শ্রদ্ধেয় সহকর্মী জনাব আহসান উল্লাহ্। কে যেন তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল He is a man of principle- তখনো বোঝার বাকি ছিল।

তো স্টক টেকিং এ আমার দায়িত্ব ছিল কাঁচা রেশনের হিসাব নিরীক্ষা। অর্থাৎ পাঁচ হাউজের ছাত্ররা বিগত এক বছরে কত কেজি রুই মাছ, কত কেজি পাঙ্গাশ মাছ, কী পরিমাণ কাঁচামরিচ, পুদিনাপাতা, টমেটো, ক্ষিরা ইত্যাদি খেয়েছে তার হিসাব দেখা। আমি তখন ক্যাম্পাসের বাইরে থাকি। ডিসেম্বর মাস। কলেজ বন্ধ। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমি হসপিটালের নিচতলায় সেন্ট্রাল স্টোরে বসে বসে বাঁধাই করা বিশাল বিশাল সব স্টক রেজিস্টার চেক করি, মনে হয় এর চেয়ে নিরানন্দ কাজ জীবনে আর করি নি। ঘরটিতে রেশন দোকানের মত কেমন এক ধরনের গন্ধ। মনে হতো আমি যেন রেশন দোকানের কেরানি এবং অনন্তকাল ধরে আমাকে এই কাজ করতে হবে।

কাজকর্মে স্টোরকিপার আমাকে সাহায্য করতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনিও বল্লেন, 'আহসানউল্লা সারে খুব খুতখুতা মানুষ আপা, কাজ পছন্দ না হইলে একবারের কাজ তিনবারে দিয়া করায়।' শুনে বলি ত্রাহি মধুসূদন! যে কাজ একবারই করতে ইচ্ছে করে না, তা তিনবার করতে হলে নির্ঘাত মারা পড়বো। তো যথেষ্ট সাবধানতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ শেষ করে কাগজপত্র জমা দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। দোয়া করতে করতে ফিরলাম যেন কোন ভুলত্রুটি বের না হয়।

তিন চার দিন পর- একদিন সকাল আটটা কি সাড়ে আটটা, নাশতা সেরে দ্বিতীয়বারের মত একটু লেপের তলায় আশ্রয় নিয়েছি, হঠাৎ শুনি আহসানউল্লাহ্ সাহেব এসেছেন। মনের দুঃখে মনে হলো ধরণী দ্বিধা হও। নিশ্চয়ই কোন ভুল খুঁজে বের করেছেন!

আজ গোপন করবো না-সেদিন আমি প্রচণ্ডরকম মর্মাহত হয়েছিলাম তাঁর এই আগমনে। না হয় ভুলই

হয়েছে, তাই বলে আমার এই নিরঙ্কুশ ছুটির মধ্যে ভুলের অঙ্কুশ বিঁধিয়ে দেয়াটা কি খুব জরুরী ছিলো? কলেজ খুললে কী সেটা সংশোধন করা যেত না! যাই হোক 'লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা' পড়তে পড়তে গায়ে ফুঁ টু দিয়ে গেলাম বসার ঘরে। সালাম দিলাম। উনি জবাব দিয়েই বল্লেন, 'দুলাভাই কোথায়?'

'সে তো অফিসে'!

'আপা, মস্তবড় একটা ভুল হয়ে গেছে।' তিনি বলতে শুরু করলেন-'কী করে যে এত বড় ভুল হলো ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে গত কদিন আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম, গতকাল মাত্র ফিরেছি এবং গতকাল রাতেই ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছে।

তো কিভাবে যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি! সকালে উঠে গেলাম ফেরদৌস আরা আপার বাসায়, তিনি আপনার বাসা চেনেন কিন্তু নম্বর জানেন না। শেষমেষ কলেজের ড্রাইভারকে নিয়ে এই এলাম।' (তখন কলেজের গাড়ি লেডি টিচারদের নাইটস্টাডিতে আনানেয়া করতো।) তিনি বলে যাচ্ছেন, আমি স্থাণুর মত বসে বসে শুনছি। তাঁকে চা দিতে হবে, সঙ্গে কী দেব, কিচ্ছু আমার মাথায় নেই। আমি শুধু মনে মনে ভাবছি-ভুল যে হয়েছে সে তো বিলক্ষণ! তা না হলে তিনি আসবেন কেন! কিন্তু এর মধ্যে দুলাভাইর প্রসঙ্গ আসে কেন? সে তো কোনো ভুল করে নি।

আহসানউল্লাহ্ সাহেব সব সময় একটি ডায়েরি বগলদাবা করে চলাফেরা করতেন। দেখি তিনি ওটার পাতা ওল্টাচ্ছেন। কী সাংঘাতিক! ভুলের বিবরণ পর্যন্ত নোট করে নিয়ে এসেছেন!

হঠাৎ দেখি তিনি একটি কার্ড আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন- 'আপা, আজ দুপুরে কুদরত-ই-খুদা হাউজে আমার ছেলের বৌ-ভাত। আমি খুবই দুঃখিত যে ভুলে সময়মত আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। আশাকরি মনে কিছু নেবেন না এবং দুলাভাইকে নিয়ে অবশ্যই আসবেন।'

আমার সে মুহূর্তের বিস্ময় ও স্বস্তি আমি ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারবো না।

আমার মত একজন আনকোরা শিক্ষকের প্রতি তাঁর এই সৌজন্য আমাকে অভিভূত করেছিল। আর স্বস্তি? সেই অসহ্য স্টক টেকিং আবার করতে হবে না, তাই।

রসায়নের রহস্য

সুলতান উদ্দিন আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

রসায়ন বিদ্যা ভৌত বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। গুরুত্বপূর্ণ বলছি এই কারণে যে, এর ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। এক কথায় মানব শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রসায়নের উপর নির্ভর করতে হয়, যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি।

রসায়ন শব্দটি বিশ্লেষণ করলে, রস+আয়ন পাওয়া যায়। যেমন রসগোল্লা= রস+গোল্লা। রসায়নের ক্ষেত্রে 'রস' বলতে দ্রাবককে এবং আয়ন বলতে চার্জযুক্ত পরমাণু (Na^+) বা মূলক (NO_3^-) বুঝানো হচ্ছে। রসায়নে সত্যি রস আছে, যেমনটি আছে ইক্ষু বা আখে। আখ থেকে যেমন রস বের করে নিতে হয় তেমনি রসায়ন পাঠ করে রস আহরণ করা যায়। রসায়নকে কঠিন বিষয় ভাববার কোন কারণ নেই। শুধু প্রয়োজন মনোযোগ ও একাগ্রতা।

রসায়নের ইংরেজী প্রতিশব্দ Chemisty, আর mistry শব্দের অর্থ হচ্ছে রহস্য। সত্যিই রহস্যে ভরা

রসায়ন। যেমন হাইড্রোজেন (H) গ্যাস নিজে জ্বলে, অক্সিজেন (O_2) অন্য পদার্থকে জ্বলতে সাহায্য করে। তাহলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে বেশী বেশী জ্বলার কথা নয় কি? কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়। $H_2+O_2 \rightarrow H_2O$, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে পানি উৎপন্ন করে, যা আগুন নেভাতে সাহায্য করে। এরকম বহু রহস্য নিহিত রয়েছে রসায়ন শাস্ত্রে। রসায়ন পরমাণু ও অণু নিয়ে আলোচনা করে। আর পরমাণু এমন এক সত্তা যা খালি চোখে তো দূরের কথা, অতি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। ব্যথা যেমন দেখা যায় না শুধু অনুভব করা যায়, তেমনি পরমাণু ও তার ইলেকট্রন, প্রোটোন ইত্যাদি দেখা না গেলেও বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। রসায়ন শাস্ত্রে ইলেকট্রনের ভূমিকা অপরিসীম। এই ইলেকট্রন আদান-প্রদান কিংবা শেয়ার বা ভাগাভাগির মাধ্যমেই পরমাণুগুলো একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে বিভিন্ন যৌগ গঠন করে।

পরমাণুর ইলেকট্রন এমন এক সত্তা যার চলাচলের ফলেই তড়িৎ শক্তির উৎপত্তি ঘটে। আবার এই ইলেকট্রনের লাফালাফির জন্যই আমরা আলোক শক্তি পাই এবং বিভিন্ন বস্তু রঙ্গিন দেখি। ইলেকট্রনগুলো শক্তি গ্রহণ করে লাফ দিয়ে উচ্চতর শক্তিস্তরে গমন করে, আবার শক্তি বিকিরণ করে নিম্ন শক্তিস্তরে চলে আসে। এই আসার সময় যে শক্তি বিকিরণ করে তাই আলো ($h\nu$)। এ রহস্য রসায়ন উদ্‌ঘাটন করেছে।

এছাড়া আমরা কিছু যৌগ রঙ্গিন এবং কিছু যৌগ বর্ণহীন দেখি, এরও উত্তর রসায়নে রয়েছে। এক্ষেত্রেও একই পরমাণুর ইলেকট্রন তার ফাঁকা বা আংশিক ফাঁকা অর্বিটালে গমনাগমন করে। ফলে বিভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মি নির্গত হয় এবং আমরা যৌগগুলোকে রঙ্গিন দেখি। বিভিন্ন রং (Dye) এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নাট্যমঞ্চে যে ধোঁয়া সৃষ্টি করা হয়, তাও রসায়নের রহস্যের মধ্যে পড়ে। কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2) একটি গ্যাস হলেও একে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে কঠিন বরফে পরিণত হয়, যা থেকে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়।

রসায়ন হাসাতেও জানে আবার কাঁদাতেও জানে। যেমন নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) কারো নাকে ঢুকলে হাসতে শুরু করবে। তেমনি কাঁদুনে গ্যাস (CCl_3NO_2) যা তৈলসদৃশ তরল চোখে লাগলে কান্না পায় অর্থাৎ চোখে পানি আসে। আর একারণেই এই রাসায়নিক পদার্থটি পুলিশের কাছে অতি প্রিয়। মহাআনন্দে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য এ পদার্থটি (টিয়ারগ্যাস) ব্যবহার করে থাকে। এরকম অসংখ্য রহস্যের জাল ছিন্ন করার জন্য রসায়ন বিষয়কে ভয় না পেয়ে যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। তবেই পাওয়া যাবে রসায়ন পাঠে আনন্দ।

সব্‌জি হিসেবে মাশরুম

মোঃ নূরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, কৃষিবিজ্ঞান

মাশরুম কী?

মাশরুম এক প্রকার অপুষ্পক উদ্ভিদ। অন্যভাবে বলা যায় মাশরুম হচ্ছে মাংসল এবং ছাতা আকৃতির এক ধরনের ছত্রাক (Fungus)। এটি সাধারণত আর্দ্রতাপূর্ণ বন ও তৃণভূমিতে জন্মে। অনেকে হয়তোবা মনে করে থাকেন মাশরুম মানে ব্যাঙের ছাতা। আসলে ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত যে বস্তুটি বাড়ির আনাচে কানাচে হয়ে থাকে তার আভিধানিক অর্থ হল টোডস্টুল। খাবার উপযোগী ছত্রাককে মাশরুম বলে এবং খাবার অনুপযোগী ছত্রাককে টোডস্টুল বলে।

কীভাবে চাষ করবেন

মাশরুম উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুটি পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করতে হয়। একটি স্পন বা বীজ উৎপাদন অন্যটি মূল মাশরুম বা ফল উৎপাদন। আপনি মাশরুম কালচার সেন্টার (MCC) থেকে স্পন বা বীজের প্যাকেট সংগ্রহ করে বাড়িতে বসে একেবারে অল্প জায়গায় মাশরুম চাষ করতে পারেন। এই চাষের জন্য আপনার তেমন কোন জায়গা বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে না। তবে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে; যা বীজ সংগ্রহের সময় মাশরুম কালচার সেন্টার (MCC) থেকে শিখে নেয়া সম্ভব।

মাশরুমের প্রকারভেদ

সারা পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার তিনশ' প্রজাতির মাশরুম পাওয়া যায়। যার মধ্যে প্রায় তিন হাজার প্রজাতিরই দেখা মেলে আমেরিকা ও কানাডায়। এই তিন হাজার তিনশ' প্রজাতির মধ্যে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ২৫-৩০ প্রজাতির মাশরুমকে চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। আমাদের দেশের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে ৩টি জাত বা প্রজাতি চাষ করা হয়। এগুলো হল : (১) স্ট্র মাশরুম (Straw), (২) ওয়েস্টার মাশরুম (Wyster) (৩) ইয়ার মাশরুম (Ear)।

বাংলাদেশে মাশরুম চাষ

আমাদের দেশে মাশরুম চাষের সূচনা হয় ১৯৭৬ সালে গবেষণার বিষয় হিসেবে। তখন থেকেই চাষ শুরু হলেও ১৯৮৪-৮৫ এর সময় থেকেই মূলত মাশরুম চাষাবাদ চলে আসছে। এবং এই কাজটি করছে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মাশরুম চাষকেন্দ্র মাশরুম কালচার সেন্টার (MCC)। এটি বাংলাদেশ সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এক্সটেনশন (DAE)-এর আওতাধীন। জাপান সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এই মাশরুম ফার্মটি গড়ে উঠে। ঢাকার সাভারে গড়ে উঠা এই ফার্মই বাংলাদেশের একমাত্র মাশরুম গবেষণা কেন্দ্র ও বীজ (স্পন) উৎপাদন কেন্দ্র। এই কেন্দ্র ছাড়াও বর্তমানে এখান থেকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেয়া কিছু কর্মী নিজস্ব উদ্যোগে এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় গুটিকয়েক ফার্ম গড়ে তুলেছে।

পুষ্টিমান

পুষ্টির দিক বিবেচনা করে আমাদের সকলের মাশরুম খাওয়া দরকার। মাশরুম পুষ্টিমানে ভরপুর। এর পুষ্টিমান অন্য যে কোন শাকসবজির তুলনায় অনেক বেশি। এটি সবজি হলেও এতে মাংসের গুণাগুণ বিদ্যমান। তাইতো অনেক দেশে মাশরুমকে গরিবের মুরগি বলে বিবেচনা করা হয়।

প্রতি ১০০ গ্রাম মাশরুমের পুষ্টিমান

ক্যালরি ৪২ গ্রাম, আমিষ ৩.১৭৫ গ্রাম, শর্করা ০.৪১০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ গ্রাম, লৌহ ১.৫ গ্রাম, ভিটামিন-এ ১.১৪ গ্রাম, ভিটামিন-বি ২.৬৯ গ্রাম, ভিটামিন-সি ১.৮ গ্রাম

ঔষধ হিসাবে মাশরুম

মাশরুমে স্নেহ ও শর্করা জাতীয় পদার্থ নাই বললেই চলে। এজন্য যারা বহুমুত্র রোগী বা অতি-রিক্ত মেদ ভূঁড়িতে ভুগছেন তাদের জন্য মাশরুম একটি অত্যন্ত উপকারী সব্জি। মাশরুমে ক্যালরি খুব কম এবং আমিষ জাতীয় পদার্থ বেশি থাকায়, উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগীর জন্য মাশরুম একটি আশীর্বাদ। এ ছাড়া মাশরুম শিশুদের হাড় ও দাঁত গঠন, ক্যান্সারের প্রতিরোধক খাদ্য হিসেবে ও রক্ত স্বল্পতায় ভাল কাজ করে থাকে।

মাশরুম দ্বারা তৈরি খাবার

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে মাশরুমের খাবার প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে চাইনিজ রেস্তোঁরা গুলো-তে মাশরুম সুপ একটি উপাদেয় খাবার। এছাড়াও খুব সাধারণভাবে ভাজি করে অথবা অন্যান্য সবজির সাথে একত্রে রান্না করে খাওয়া যায়। এদেশে নারিকেল দিয়ে চিংড়িমাছ যেভাবে রান্না করা হয় ঠিক ঐভাবে চিংড়ি দিয়ে মাশরুম রান্না খুবই সুস্বাদু। মাশরুম বেশি সময় সিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। সাধারণত তিন/চার মিনিটেই সিদ্ধ হয়ে যায়। মাশরুম দিয়ে পোলাও, ওমলেট, সস, স্যান্ডউইচ, মাশরুম চিংড়ি, চিকেন সুপ, আমিষ সুপ, ফ্রাই, চপ, পিজা, রোল ইত্যাদি খাবার তৈরি করা সম্ভব।

মাশরুম ফ্রাই তৈরি

৬টি মাঝারি সাইজের মাশরুম, ডিম ১টি, ময়দা ২টেবিল চামচ, সামান্য বেকিং পাউডার সাজাতে হবে পরিমাণ মত লবণ এবং গোল মরিচ। শুকনা পাউরুটির গুড়া এবং সয়াবিন তেল।

রন্ধন

একটা পাত্রে ডিম ভেঙ্গে ময়দা, লবণ, মরিচ ইত্যাদি মিশিয়ে লাই করুন ও প্রয়োজন মত পানি মিশান। মাশরুমগুলো ঐ লাই এর মধ্যে চুবিয়ে নিয়ে পাউরুটির গুড়ার উপর রোল করুন। পাত্রে তৈল গরম করুন এবং একত্রে কয়েকটি মাশরুম ভেজে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সতর্কতা ঃ খাদ্যোপযোগী মাশরুম বা মাশরুম বিশেষজ্ঞ কর্তৃক চিহ্নিত মাশরুম ব্যতীত বাড়ির আনাচে কানাচে জন্মানো মাশরুম খাবেন না। কারণ এগুলো খুবই বিষাক্ত।

"শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন।" — জন ডিউই

শিল্পচর্চার নান্দনিক বিকাশ

মাহ্‌বুবা হাবিব
প্রভাষক, চারু ও কারু কলা বিভাগ

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আল্লাহ্‌তালার যে বিরাট সৃষ্টি এ তুলনাহীন। এই সৃষ্টির সৌন্দর্য যখন দিনের পর দিন উপলব্ধি করতে করতে মনকে আন্দোলিত করে তখনই কেউ কেউ নানাভাবে এর বিকাশ ঘটায় ছবি আঁকায়, সাহিত্যে, গানে।

শিক্ষার লক্ষ্যই হল মানুষের পূর্ণ বিকাশ। মানুষের চেতনার বিচিত্রমুখী গতিপ্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম বা গভীরভাবে চেতনার বিকাশ হল শিল্পকলা। এই চেতনা সম্বন্ধে মানুষ আদিকাল থেকে যেভাবেই হোক সচেতন। তাই কোথাও শিল্পের প্রভাব বর্জিত সমাজ দেখা যায় না। এক সময় শিল্পকলা সৃষ্টির ক্ষমতাকে ঐশী শক্তির অন্যতম প্রকাশ বলে ধরা হত। মানুষ যখন কথা বলতে জানত না সেই আদিম যুগে ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। অতএব এটা বলতে দ্বিধা নেই শিল্পকলা পৃথিবীর সব মানুষেরই একমাত্র ভাষা যা একে অন্যকে সহজেই বুঝাতে পারে। এই ব্যাপারে আমাদের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। স্পেন, ফ্রান্স, চীনে তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার সময় পকেটে সবসময় একটা স্কেচ খাতা আর কলম, পেন্সিল রাখতেন। কোথাও গিয়ে ভাষা না জানলে স্কেচ খাতা কলম খুলে ছবি এঁকে দিতেন– তাহলেই সে দেশের লোকজন বুঝে নিত তিনি কী বলতে চাইছেন। তাই শিল্প-শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ এবং শৈশবকাল থেকেই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিল্প শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা দরকার।

আমাদের দেশে শিল্প যে বিলাসিতার আনুষঙ্গিক নয়, জাতীয় জীবনে শিল্পের গভীর তাৎপর্য এবং সে তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন বিশেষভাবে শিল্পী জয়নুল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, হাশেম খান, রফিকুন নবী। বর্তমানে যে যন্ত্রশিল্প এসেছে, সেখানে আছে উৎপাদনের বিশেষ কৌশল। Computer এ অনেক সহজেই সমস্যার সমাধান করে নেওয়া যেতে পারছে। যন্ত্রশিল্প দিয়ে অনেক দ্রুত শিল্প তৈরি করা যাচ্ছে ঠিকই তবু ভবিষ্যৎ কতগুলো মানুষের উপর, যন্ত্রের উপর নয়। কাজেই মানুষের এই শক্তিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাকে যন্ত্র করে তুললে চলবে না। এ জন্যই সৃজনীশক্তির প্রকাশ দরকার। মানুষ নামক যন্ত্রটিকে শিক্ষিত করতে হলে তার সৃজনীশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দরকার স্বাধীন পরিবেশ। তবে এটা ঠিক যে, যদি সৃজনীশক্তির মূল্য থাকে সমাজে, তবে কিছু অপচয় হলেও স্বাধীনতা ও অবসরেরও প্রয়োজন আছে। কারণ স্বাধীন পরিবেশ না হলে মানুষের সৃজনীশক্তির বিকাশ হতে পারে না।

সমাজ, সমাজের সঙ্গে শিল্প Art creativity সৃজনীশক্তি বিচ্ছিন্ন নয়। যারা Art ও Creativity উপলব্ধি করছেন, অভিধান না পড়েও যারা মনোজগত থেকে অন্য মনোজগতে নিজের আনন্দের সৃষ্টিকে পৌছে দিতে চান তারা নিশ্চয়ই বুঝবেন মনের স্বাধীনতা দরকার।

Art and creafivity এই দুটি কথার মূল্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর উপযোগিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সচেতন করেন। বিদ্যাচর্চাকে রবীন্দ্রনাথ কখনও কেবলমাত্র পঠন পাঠন পুঁথিচর্চায় আবদ্ধ রাখেন নি। বিদ্যাচর্চাকে তিনি দেখেছেন জীবনচর্চা হিসাবে। কোন প্রতিষ্ঠানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে, তার অন্তরে একটি ভাবপ্রবাহ নিত্য প্রবাহিত রাখতে হয়। একথা অবশ্যই সকলে স্বীকার করবে যে, ব্যাপক অর্থে

শিক্ষাদান-ব্যাপারে পাণ্ডিত্য ছাড়াও আরও অনেক গুণের প্রয়োজন হয়। মানুষের মন সৃজনবিলাসী। সৃষ্টির মধ্যেই তার প্রধান তৃপ্তি। বিদ্যার্জন তখনই সার্থক যখন বিদ্যার্থী নিজেকে প্রকাশ করতে শিখবে। গান, ছবি আঁকা, নাচতে, খেলতে, কোন কিছুতে পারদর্শিতা দেখাতে পারলে তবে তার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। আত্মপ্রকাশ ছাড়াও শিক্ষার ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের চর্চা অপরিহার্য। একবার যদি সৌন্দর্যবোধ মনে জাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই মানুষের মন নীচতা, ক্ষুদ্রতা, হিংসা, বিদ্বেষ সকল প্রকার কুৎসিত চিন্তা থেকে বিরত থাকবে। সৌন্দর্যবোধ মূলত পরিমিতিবোধ– আচার, ব্যবহারে, নিত্যদিনের কর্মে। যে কাজ সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করে তাই নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি বিচিত্র ও অদ্ভুত হলেও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি একাধারে কবি ও স্রষ্টা।

ভারতীয় শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসুর স্কেচের এবং চিত্রের অজস্রত্ব বিশ্বের শিল্পে অতুলনীয়। শিল্পী নন্দলাল বসুর কয়েকটি কথা উল্লেখ করা গেল—

(ক) শিল্পসৃষ্টির মধ্যে একটি সম্পূর্ণতা আছে।

(খ) শিল্পসৃষ্টি সহজ, সরল ও সুনির্দিষ্ট। হৃদয়ের রসের স্পর্শানুভূতি বা কোন এক ছন্দের বিকাশ হলে শিল্পী নির্ভীক চিত্তে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

একদল লোক আছেন-যাঁরা বলেন ছবি এঁকে কী হবে? এতে কি ভাত-কাপড় যোগাড় হবে? আসলে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, শিল্পচর্চার দুটো দিক আছে-একটি আনন্দের এবং একটি বৈষয়িক। এই দুটো ভাগের নাম চারু শিল্প ও কারু শিল্প।

চারু শিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ, দুঃখ দ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, চিত্তে আনন্দ দেয়। আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিসগুলোতে সৌন্দর্যের সোনারকাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর ও সুগম করে তোলে তাই নয়- আমাদের অর্থলাভের পথও তৈরি করে দেয়। প্রকৃতির সাথে যোগসাধন হলে প্রকৃতিকে সত্যিকার ভালবাসতে শিখলে তার সৌন্দর্যের উৎস কখনও ফুরাবে না। কারণ প্রকৃতিই যুগে যুগে শিল্পীকে শিল্পসৃষ্টির উপাদান যুগিয়ে আসছে।

কোন কিছু আঁকতে হলে সেই দৃশ্য বা সেই বস্তুকে খুব গভীরভাবে দেখতে হবে। বারে বারে দেখতে হবে। এই দেখতে দেখতে নিজের ভেতরে আত্মস্থ করতে হবে। তারপর আঁকতে গেলে সহজেই আঁকা হয়ে যাবে। কাগজ কলম সামনে রেখে কী আঁকব বলে ভাবতে থাকলে কখনই ছবি আঁকা হবে না। চারপাশের জিনিসের সাথে যোগসাধন থাকতে হবে। চোখ মেলে ভাল করে দেখতে হবে। মনের মধ্যে গাঁথতে হবে। তাহলেই শিল্প সৃষ্টি করা যাবে।

মানুষ সৌন্দর্যপ্রিয়। আমার জানা মতে এমন কেউ নেই যে ফুল, পাখি, গান, শিশুকে ভালবাসে না। একটা শিশুকে রং কাগজ দিয়ে বসিয়ে দিলে সে তার মনের আনন্দে কাগজে রং ঘষতে থাকে। বিভিন্ন রং এর খেলা সে খেলতে থাকে। তাই এই শিশু বয়স থেকেই যদি তার সৌন্দর্যবোধের চর্চাকে ধরে রাখা যায় তাহলে বড় হয়ে অকল্যাণকর কাজ থেকে দূরে থেকে যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণকর সেগুলোর দিকে আকৃষ্ট হবে এবং সেগুলোই প্রতিষ্ঠিত করবে। শিল্পকলার চর্চাকে অনেকেই মনে করেন একটা অপচয়- কিন্তু আসলে মোটেই তা নয় বরং সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায় শেষ করছি— "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর"।

বাংলা শব্দের বানান : একটি পর্যালোচনা

মুহম্মদ হায়দার আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বাংলা ভাষার বয়স প্রায় দেড় হাজার বছর হতে চললেও এ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির সর্বজনগ্রাহ্য বানানরীতি আজো গড়ে ওঠেনি; ভাষা-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে আজো ঘটেনি বাংলা ভাষার বানান বিষয়ক দীর্ঘকালীন বিতর্কের অবসান। ফলে বাংলা ভাষা লিখনের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি চরম বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি বিরাজমান। এ বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির স্বরূপ উন্মোচনে এবং তা নিরসনের ক্ষুদ্র প্রয়াস ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমার এ লেখার অবতারণা।

বিংশ শতাব্দী বাংলা বানান সংস্কারের শতাব্দী। এ-শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলা বানান নির্ধারণের ও বর্ণমালা সংস্কারের বহুবিধ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ একটি লক্ষণীয় বিষয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির বানানরীতি নির্ধারণের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২৬ সালে গৃহীত এ-উদ্যোগে বিশ্বভারতী মূলত চলিত ভাষারীতিতে ব্যবহৃত শব্দাবলির বানানরীতি নির্ধারণ করে। এ-উদ্যোগের প্রায় এক দশক পরে, ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য গঠন করে 'বাংলা বানান সংস্কার সমিতি'। উক্ত সমিতি ১৯৩৬ সালে 'বাংলা বানানের নিয়ম' সুপারিশ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত এ-বানানরীতিই দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত হয়ে এসেছে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর মাওলানা আকরাম খাঁ, সৈয়দ আলী আহসান ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে যথাক্রমে ১৯৪৯,১৯৬৩ও ১৯৬৭ সালে বাংলা বানান সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। এসব কমিটি বাংলা শব্দের বানান-সমস্যা সমাধানের জন্য মূলত বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাব করে। ১৯৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গঠিত 'বাংলা বানানের নিয়ম সমিতি' বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু বর্ণমালা সংস্কারের এসব প্রস্তাবের কোনটিই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। ১৯৮৮ সালে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠপুস্তক বোর্ড, ঢাকা তার প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে অভিন্ন বানানরীতি অনুসরণের লক্ষ্যে 'পাঠ্য বইয়ের বানান' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। বোর্ডের এ-বানানরীতিতে বিকল্প বানান বর্জন করে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির বানানকে যথাসম্ভব স্বচ্ছ ও সংশয়মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে আনন্দ পাবলিশার্স নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' নামে বাংলা বানানের স্বতন্ত্র নিয়মাবলি প্রকাশ করে। কিন্তু এ-নিয়মাবলি ভাষাবিশেষজ্ঞ মহলে সমাদৃত হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা বানান সংস্কারের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলা একাডেমী। ১৯৯২ সালে একাডেমী বাংলা বানানকে অভিন্ন ও প্রমিত করার উদ্দেশ্যে 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। উক্ত পুস্তিকায় প্রকাশিত বানানরীতি অনুসরণ করে একাডেমী তার সকল বইপত্র মুদ্রিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে এ-বানানরীতি অনুসরণের আহবান জানায়।

বাংলা শব্দের বানান সংস্কারের উল্লিখিত বহুমাত্রিক উদ্যোগ ও প্রয়াসের পরও বাংলা শব্দের বানান বিষয়ক বিশৃঙ্খলা ও সংশয় সম্পূর্ণ দূর হয়নি, তবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম (সংস্কৃত), অর্ধ-তৎসম (অর্ধ-সংস্কৃত), তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে আগের বিশৃঙ্খলা কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে। বাংলা শব্দের বানানে সাধারণত ই, ঈ, উ, ঊ, এ, অ্যা এসব স্বরবর্ণ এবং এগুলোর চিহ্ন এবং ঙ,ং ; জ, য ; ণ, ন ; ত, ৎ ; র, ড়, ঢ়; শ, ষ, স ; ঃ এসব ব্যঞ্জনবর্ণ ও কিছু যুক্ত বর্ণের ব্যবহার নিয়েই মূলত জটিলতা, বিশৃঙ্খলা ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই জটিলতা, বিশৃঙ্খলা ও সংশয় দূর করার জন্য কোনো কোনো ভাষা-বিশেষজ্ঞ বাংলা বর্ণমালা থেকে ঈ, ঊ এসব স্বরবর্ণ ও এগুলোর কারচিহ্ন এবং ঙ, ঞ, য, ণ, ষ, ৎ, ঃ এসব ব্যঞ্জনবর্ণ বর্জন

করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশকিছু তৎসম ও তদ্ভব শব্দের বানানভেদের কারণে অর্থভেদ এবং বিদেশী শব্দের উচ্চারণানুগ বানান নির্দেশের জন্য ভাষা-বিশেষজ্ঞদের উল্লিখিত বর্ণবর্জনের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। তবে উক্ত বর্ণগুলোর ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা এবং বাংলা একাডেমী একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। তাদের সিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১) **ই, ঈ, উ, ঊ এবং এদের কার চিহ্ন (ি, ী, ু, ূ)-এর ব্যবহার :**

ক) যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, ঊ উভয়ই শুদ্ধ, সেসব শব্দে কেবল ই বা উ অথবা এদের কারচিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন—কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, পঞ্জি, ভঙ্গি, পদবি ইত্যাদি।

খ) তৎসম শব্দ ছাড়া অন্যান্য শব্দে (তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র) কেবল ই বা উ অথবা এদের কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন—বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, পাখি, হাতি, জাতি, দাবি, মালি, নানি, দাদি, মামি, চাচি, ভারি, চুরি, খুশি, বেশি, দিঘি, হিজরি, রেশমি, পশমি, কুমির, সরকারি, তরকারি, আসামি ইত্যাদি।

গ) ভাষা ও জাতিবাচক শব্দের শেষে ই বা উ অথবা এদের কারচিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন—বাঙালি, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, হিন্দি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, ইরাকি, ফরাসি, পাকিস্তানি, উর্দু বর্মি ইত্যাদি।

ঘ) বিশেষণবাচক'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের শেষে ই-কার হবে। যেমন—সোনালি, রূপালি, বর্ণালি, গীতালি, মিতালি, খেয়ালি, হেঁয়ালি ইত্যাদি।

ঙ) কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ -কার হবে। যেমন-পরী, রানী, নারী, গাভী, মানবী, হরিণী, কিঙ্করী, পিশাচী ইত্যাদি।

চ) সর্বনাম পদ ও বিশেষণ পদ রূপে 'কী' ঈ—কার দিয়ে লিখতে হবে। যেমন—কী কথা? কী কর? কী জানি। কী যে করি। তোমার নাম কী? কী সুন্দর! কী বীভৎস! কী খাবে? পদ কয় প্রকার ও কী কী? ইত্যাদি । কিন্তু অব্যয় পদ রূপে 'কি' ই—কার দিয়ে লিখতে হবে। যেমন—তুমি কি খাবে? সে কি এসেছে? কি ভালো কি মন্দ সবই মানুষের কর্মের ফল ইত্যাদি। (প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে 'কি' ও 'কী'-এর সাধারণ ব্যবহারবিধি হলো—যেসব প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' বলে দেয়া সম্ভব, সেসব প্রশ্নে'কি' ব্যবহৃত হবে। পক্ষান্তরে যেসব প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে দেয়া সম্ভব নয়—বর্ণনা প্রয়োজন, সেসব প্রশ্নে 'কী' ব্যবহৃত হবে।)

২) **'এ' এবং 'অ্যা' বর্ণের ব্যবহার :**

'এ' এবং 'অ্যা' বর্ণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বোর্ড ও একাডেমীর মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর মতে, ইংরেজি বাঁকা 'A' ধ্বনির জন্য শব্দের আদিতে 'এ' হবে। যেমন—এসিড, এলকহল, এরিস্টটল ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা একাডেমীর মতে, বিদেশী শব্দে 'A' ধ্বনির বাঁকা উচ্চারণে 'অ্যা' বা 'A' ব্যবহৃত হবে। যেমন—অ্যাসিড, অ্যারিস্টটল, অ্যাডহক, অ্যালার্জি, অ্যামবুলেন্স, অ্যাবসার্ড, অ্যান-টেনা ইত্যাদি।

৩) **'ঙ' এবং 'ং'-এর ব্যবহার :**

'ঙ' এবং 'ং' মূলত একই ধ্বনির দুই প্রতীকী রূপ। বর্ণ দুটোর ব্যবহার সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলেছে-সন্ধিতে ম্-এর পর ক-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে 'ম্' স্থানে 'ং' লিখতে হবে। যেমন—

অহংকার (অহম্+কার), সংখ্যা (সম্+খ্যা), সঙ্গীত, সম্+গীত), সংঘটন (সম্+ঘটন), ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা একাডেমী 'ম্' স্থানে 'ং'—এর বিকল্পে 'ঙ' ব্যবহারকেও সিদ্ধ বলেছে। যেমন-অহংকার/অহঙ্কার, সংগীত/সঙ্গীত ইত্যাদি। এছাড়া সুংসহত, মৌল বা একক শব্দে ক—বর্গীয় বর্ণ এবং 'ক্ষ'-এর সঙ্গে সর্বদা 'ঙ' ব্যবহৃত হবে। যেমন—অঙ্ক, অঙ্কন, শঙ্খ, সঙ্গ, বঙ্গ, ভঙ্গুর, আকাঙ্ক্ষা, কাঙ্ক্ষিত ইত্যাদি। প্রত্যয় বা বিভক্তিহীন শব্দের শেষে 'ং' ব্যবহৃত হবে। যেমন—রং,ঢং, গাং, পালং ইত্যাদি। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলে 'ঙ' ব্যবহৃত হবে। যেমন—ভাঙা, রঙিন, রঙের, বাঙালি ইত্যাদি। বাংলাদেশের সংবিধানে 'বাংলা' ও 'বাংলাদেশ' শব্দদুটো 'ং' দিয়ে লেখা হয়েছে বলে শব্দ দুটোতে সাংবিধানিক বানানই বহাল থাকবে।

৪) 'জ' এবং 'য' বর্ণের ব্যবহার :

বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের বানান বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুসারেই লিখতে হবে। যেমন-কাগজ, হাজার, জুলুম, জেব্রা ইত্যাদি। কিন্তু ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত যেসব শব্দে যে, যাল, সোয়াদ, যোই হরফ রয়েছে সেগুলোর যথাযথ উচ্চারণের জন্য বাংলায় 'য' ব্যবহৃত হবে, যেমন—আযান, মুয়ায্যিন, ওযু, নামায, যোহর, কাযা, রোযা, রমযান, যাকাত, যিকির, হযরত ইত্যাদি। তবে আরবি জিম্ স্থানে বাংলার 'জ' লিখতে হবে। যেমন—হজ, ফজর, হিজরি, হিজরত ইত্যাদি। অবশ্য বাংলা একাডেমী বিদেশী শব্দে 'য'-এর পরিবর্তে 'জ' -এর ব্যবহারকেও শুদ্ধ বলেছে। একাডেমীর মতে, জাদু, জাদুঘর, জোয়াল জেব্রা ইত্যাদি শব্দে 'জ' -ই সিদ্ধ।

৫) 'ণ' এবং 'ন' বর্ণের ব্যবহার :

তৎসম শব্দেই কেবল 'ণ' ব্যবহৃত হয়। যেমন—কর্ণ, পর্ণ, স্বর্ণ, ব্রাহ্মণ, প্রাণ, পুণ্য, বণিক, কল্যাণ ইত্যাদি। এছাড়া তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দের বানানে কখনো 'ণ' ব্যবহৃত হয় না, ন হয়। যেমন—কান, পান, সোনা, বামন, পরান, অঘ্রান, ধরন, হর্ন, কার্বন, কর্নেল, ইন্টার, ইস্টার্ন, লন্ডন, মডার্ন, কর্নার, অ্যান্ড, গভর্নর, গভর্নমেন্ট ইত্যাদি।

৬) 'ত' এবং 'ৎ' বর্ণের ব্যবহার :

'ত' এবং 'ৎ' মূলত একই ধ্বনির দুই প্রতীকী রূপ। 'ত' বর্ণের নিচে হসন্ত চিহ্ন (ত্) ব্যবহার করলে 'ৎ'-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। যা ঘটে, চলে বা হয় অর্থ প্রকাশ করে, তা বোঝাতে তৎসম শব্দের শেষে 'ৎ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—জগৎ, তড়িৎ, সত্যজিৎ,ইত্যাদি। যা ঘটবে, হবে বা হতে থাকবে, সে অর্থে 'ৎ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-ভবিষ্যৎ। যেসব শব্দে 'ৎ'-এর ব্যবহার রয়েছে, সেসব শব্দের শেষে ষষ্ঠী বিভক্তি (র,এর) বা সপ্তমী বিভক্তি, (এ,য়, তে) যুক্ত হলে ৎ-এর পরিবর্তে 'ত' হয়। যমন—জগতে, জগতের, তড়িতে, তড়িতের, সত্যজিতের ইত্যাদি। অতীত বা যা হয়ে গেছে বোঝাতে শব্দের শেষে 'ত' ব্যবহৃত হয়। যেমন—অর্জিত, উচিত, গৃহীত, কুৎসিত, শিক্ষিত ইত্যাদি।

৭) র, ড়, ঢ় বর্ণের ব্যবহার :

র, ড়, ঢ় বর্ণগুলো শব্দে অর্থভেদ ঘটায়। প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ সৃষ্টিতে এগুলোর ব্যবহার লক্ষণীয়। বারি (জল, বৃষ্টি), বাড়ি (আবাস); গর (অভাব), গড় (স্থুল হিসাব); ঘোরা (বিচরণ), ঘোড়া (অশ্ব); চরা (বিচরণ করা), চড়া (আরোহণ করা, নদী—মধ্যস্থ দ্বীপ); ছার (অধম), ছাড় (বাদ দেয়া, ত্যাগ করা); জোর (শক্তি), জোড় (মিলন); ত্বরিত (তাড়াতাড়ি), তড়িৎ (বিদ্যুৎ) ; নীর (পানি), নীড় (পাখির বাসা); গুড় (মিঠাই), গূঢ় (গোপনীয়, গভীর); পরা (পরিধান করা) পড়া, (পাঠ করা) ইত্যাদি।

৮) শ, ষ, স বর্ণের ব্যবহার:

কেবল তৎসম শব্দেই 'ষ' ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দের বানানে 'ষ' ব্যবহৃত হয় না। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী চ,ছ বর্ণের সঙ্গে 'শ', ট,ঠ বর্ণের সঙ্গে 'ষ' এবং ত,থ বর্ণের সঙ্গে 'স' যুক্ত হয়। যেমন—নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র, সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ, অন্ত, আস্থা ইত্যাদি। বিদেশী শব্দের বানানে যথাযথ প্রতিষঙ্গী বর্ণ ব্যবহার করতে হবে। আরবি—ফারসি শব্দে সে, সিন্ সোয়াদ- এর প্রতিষঙ্গী বর্ণ রূপে 'স' এবং শিন্—এর প্রতিষঙ্গী বর্ণ রূপে 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন—হাদিস, সালাম, মসজিদ, সালাত, ইসলাম, মুসলিম, এশা, এজলাস, বেহেশ্‌ত্, গোসল, তস্‌বিহ্, ফেরেশ্‌তা, নালিশ, বদমাস, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, পোশাক, আপোস, সাদা, নাশতা, কিশ্‌মিশ্ ইত্যাদি।

ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত শব্দের বানানে 'S'-এর প্রতিষঙ্গী বর্ণরূপে 'স' এবং 'Sh', Sion, ssion, tion-এর প্রতিষঙ্গী বর্ণরূপে যথাক্রমে 'শ'ও 'শন্' ব্যবহৃত হবে। যেমন— স্টল, স্টার,স্টান্ড, স্টোর, স্টেশন, স্টুডিয়ো, স্ট্রিট, স্টাইল, ফটোস্ট্যাট, ইনস্টিটিউট, মাস্টার, পোস্টার, শেলফ, শার্ট, শেক্‌স্‌পিয়র, সেশন, ম্যানশন ইত্যাদি। (তবে Christ ও Christion শব্দের বাংলা বানান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যথাক্রমে 'খ্রিস্ট' ও 'খ্রিস্টান' এবং এই নিয়মে 'খ্রিস্টাব্দ' লিখলেও, বাংলা একাডেমী শব্দগুলোর বানান যথাক্রমে খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টান ও খ্রিষ্টাব্দ লেখার পক্ষপাতী। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর বক্তব্য হলো—'খ্রিষ্ট' যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই 'ষ্ট' দিয়েই 'খ্রিষ্ট' শব্দটি লেখা হবে।)

৯) (বিসর্গ)—এর ব্যবহার :

'ঃ' (বিসর্গ)—এর উচ্চারণ 'হ'-এর উচ্চারণের মতো। বাংলা শব্দের শেষে বিসর্গ উচ্চারিত হয়না বলে বাংলা শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে না। যেমন—প্রধানত, সাধারণত, মূলত, বস্তুত, কার্যত, ক্রমশ, বিশেষত ইত্যাদি। তবে যেসব শব্দের শেষে বিসর্গ না থাকলে অর্থের বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে, সেখানে শব্দের শেষের বিসর্গ থাকবে। যেমন—পুনঃপুনঃ ইত্যাদি। এছাড়া পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। যেমন—দুঃখ, অতঃপর, প্রাতঃকাল, পৌনঃপুনিক ইত্যাদি। তবে ব্যাকরণসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জণীয়। যেমন- দুস্থ, নিস্তব্ধ ইত্যাদি।

১০) বিবিধ নিয়ম :

উল্লিখিত বানানবিধিগুলো ছাড়াও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমী বাংলা বানানের আরো যেসব দিকনির্দেশনা দিয়েছে, সেগুলো হলো :

ক) তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র—কোনো শব্দেই রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। অর্থাৎ রেফযুক্ত বর্ণ দু বার লেখা যাবে না। যেমন—অর্ধ, অর্চনা, কর্ম, কর্জ, কার্য, কার্যালয়, মূর্ছা, কার্তিক, সূর্য, ধৈর্য সৌন্দর্য ইত্যাদি।

খ) শব্দে বর্ণের নিচে হস্ চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন—চট, কলকল, তছনছ,ডিশ, ছটফট ইত্যাদি।

গ) ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন—দু জন, চারশ, বলে, (ব'লে), করে (ক'রে) ইত্যাদি।

ঘ) সমাসবদ্ধ পদ একসাথে লিখতে হবে। যেমন—সংবাদপত্র; বিজ্ঞানসম্মত, জটিলতামূলক, স্বভাবগতভাবে, পূর্বপরিচিত, পিতাপুত্র, বারবার, অদৃষ্টপূর্ব ইত্যাদি। তবে বিশেষ প্রয়োজনে

পদগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক হাইফেন ব্যবহার করা যাবে। যেমন—মা-মেয়ে, ভবিষ্য-তহবিল, শিক্ষা-ভবন প্রশাসন-ভবন, কিছু-না-কিছু, কোনো -না-কোনো ইত্যাদি।

ঙ) বিশেষণ পদ আলাদা বসবে। যেমন—এক জন, কত দূর, ভাল ছেলে, নীল আকাশ ইত্যাদি।

চ) না, নি, নেই, নাই প্রভৃতি নঞর্থক পদ শব্দের শেষে পৃথকভাবে বসবে। যেমন—আসে না, আসে নি, ভয় নেই, করে নাই ইত্যাদি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমীর উপরিউক্ত বানানবিধি ছাড়াও ব্যাকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরো বহু শব্দের বানান নির্দিষ্ট হয়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান, নাসিক্য ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার, সন্ধি, স্ত্রীবাচক শব্দ, বিশেষ্য—বিশেষণ পদ, বাহুল্য শব্দ, প্রায়—সমোচ্চারিত শব্দ ইত্যাদি। এসব পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :—

১১) ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব—বিধান :

ণ–ত্ব বিধান : তৎসম শব্দে 'ণ'–এর ব্যবহারের নিয়মকে ণ–ত্ব বিধান বলে। ণ—ত্ব বিধানের নিয়ম অনুযায়ী—

ক) ঋ, র, ষ—এর পর সাধারণত 'ণ' হয়। যেমন—ঋণ, ঋণী, তৃণ, ঘৃণা, কারণ, বরণ, স্মরণ, বর্ণ, বর্ণনা, ভাষণ, ভীষণ, ক্ষীণ, লক্ষণ ইত্যাদি।

খ) ঋ, র, ষ—এর পর স্বরবর্ণ, ক ও প—বগীয় বর্ণ, য, হ, ং থাকলেও 'ণ' হয়। যেমন—রূপাঙ্কণ, রূপায়ণ, রামায়ণ, প্রাঙ্গণ, সর্বাঙ্গীণ, অপেক্ষমাণ, ম্রিয়মাণ, গ্রামীণ, অর্পণ, দর্পণ, কৃপণ, গ্রহণ, প্রয়াণ,পরিবহণ, হরিণ, নির্মাণ, নির্বাণ ইত্যাদি।

গ) কিন্তু ঋ, র, ষ—এর পর পূর্বোক্ত (খ—নিয়মে উল্লিখিত) বর্ণগুলো ছাড়া অন্য কোনো বর্ণ এলে 'ণ' হয় না, 'ন' হয়। যেমন— রসায়ন, রচনা, প্রার্থনা, দর্শন ইত্যাদি।

ঘ) সমাসবদ্ধ পদে পূর্বপদে ঋ, র, ষ থাকলেও পরপদের 'ন' সাধারণত 'ণ'—তে রূপান্তরিত হয় না। যেমন— দুর্নাম, দুর্নিবার, নির্নিমেষ, দুর্নীতি, ত্রিনয়ন, সর্বনাম ইত্যাদি।

ঙ) ট—বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সর্বদা 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন—কণ্টক, কণ্ঠ, কাণ্ড, খণ্ড ইত্যাদি।

চ) প্র, পরা পরি, নির প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত হলে মূল শব্দে 'ন' থাকলেও তা'ণ'—তে রূপান্তরিত হয়। যেমন—প্রণাম, প্রণত, প্রণীত, প্রণয়ন, পরিণয়, পরিণাম, নির্ণয় ইত্যাদি।

ছ) কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়। যেমন—কণা, কোণ, কল্যাণ, গণ, গণ্য, গুণ, গৌণ, পণ্য, পুণ্য, বেণু, বীণা, বাণী, বণিক, বাণিজ্য, বিপণি, নিপুণ, লবণ ইত্যাদি। জ) ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সর্বদা 'ন' যুক্ত হয়। যেমন— অন্ত, যত্ন, গ্রন্থ, পন্থা, বিন্দু, বন্দনা, বন্ধন ইত্যাদি। ঝ) সর্বনাম পদ, অব্যয় পদ ও ক্রিয়াপদে কখনো 'ণ' হয় না, ন হয়। যেমন— আপনি, আপনারা, তিনি, যিনি, উনি, ইনি, কিন্তু, বিনা, নতুবা, গুন গুন, করেন, ধরেন, করুন, ধরুন, করলেন ইত্যাদি।

ষ-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দে 'ষ'-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে। ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুযায়ী— ক) ঋ, ঋ-কার (ৃ), র, রেফ (র্)-এর পর সাধারণত 'ষ' হয়। যেমন—ঋষি, কৃষি, কৃষক, বৃষ, বর্ষা, বর্ষণ, কর্ষণ ইত্যাদি। খ) অ, আ ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ এবং ক, র-এর পর প্রত্যয় বা বিভক্তির 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়। যেমন— জিগীষা, চিকীর্ষা, স্নেহাস্পদেষু, কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। গ) অতি,

অভি, অধি, পরি, প্রতি, নি, বি, অনু, সু, কু— এসব উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুর 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়। যেমন— অভিষেক, অভিষিক্ত, অধিষ্ঠিত, পরিষেবক, পরিষেবিকা, প্রতিষ্ঠান, প্রতিষেধক, নিষেধ, নিষাদ, বিষম, অনুষঙ্গ, সুষম, সুষুপ্ত, কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি (ব্যতিক্রম— অভিসার, বিস্ময়, বিস্মরণ, অভিসন্ধি ইত্যাদি। ঘ) ট ও ঠ-এর সঙ্গে সর্বদা 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন— মিষ্টি, কষ্ট, কনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ঙ) স্পৃহ্, স্পন্দ্, স্ফুট্, স্ফুর্— এসব ধাতুর 'স' কখনো 'ষ' হয় না। যেমন— নিস্পৃহ, নিস্পন্দ, পরিস্ফুট, বিস্ফোরণ ইত্যাদি। চ) 'সাৎ' প্রত্যয়ের 'স' কখনো 'ষ' হয় না। যেমন—ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ, আত্মসাৎ ইত্যাদি। ছ) কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন— আষাঢ়, অভিলাষ, ঈষৎ, কোষ, পাষাণ, ভাষণ, তোষণ, তুষার, ষোড়শ, ভূষণ, ঔষধ ইত্যাদি।

১২) নাসিক্য ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার :

নাসিক্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলো (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) কেবল নিজ বর্গের বর্ণের সঙ্গেই যুক্ত হয়। এই নিয়মে ক-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় 'ঙ', যেমন— অঙ্ক, শঙ্খ, সঙ্গীত ইত্যাদি; চ-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় 'ঞ', যেমন— অঞ্চল, লাঞ্ছনা, ব্যঞ্জনা, গঞ্জ, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি; ট-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় 'ণ', যেমন— বণ্টন, লুণ্ঠন, ভাণ্ডার, দণ্ড ইত্যাদি। ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় 'ন', যেমন— দন্ত, মন্থন, ক্রন্দন, বন্ধু ইত্যাদি। 'প'-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় 'ম', যেমন— কম্প, লম্ফ, লম্বা, সম্ভব ইত্যাদি।

১৩) সন্ধি :

পাশাপাশি দুটো ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধিসূত্রেও বেশ কিছু শব্দের বানান নির্দিষ্ট হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ লক্ষণীয় : ক) ই/ঈ-কারের পর ই/ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়, যেমন— রবীন্দ্র, পরীক্ষা, প্রতীক্ষা, অতীব, প্রতীত, অধীশ্বর, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি। খ) উ/ঊ-কারের পর উ/ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। যেমন—মরূদ্যান, অনূর্ধ্ব, বহূর্ধ্ব, বধূৎসব, ভূর্ধ্ব ইত্যাদি। গ) 'ম্'-এর পর য, র, ল, ব, হ, থাকলে 'ম্' স্থানে 'ং' হয়। যেমন— সংবরণ, কিংবদন্তী, সংবর্ধনা, স্বয়ংবরা ইত্যাদি। ঘ) অ, আ-এর পর 'ঃ' এবং তারপর ক, খ, প, ফ থাকলে 'ঃ' স্থানে 'স' হয়। যেমন— তস্কর, ভাস্কর, আস্ফালন, পুরস্কার, তিরস্কার, পদস্খলন, বাচস্পতি ইত্যাদি। কিন্তু অ, আ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পর ক, খ, প, ফ থাকলে 'ঃ' সাথে 'ষ' হয়। যেমন— পরিষ্কার, আবিষ্কার, বহিষ্কার, নিষ্পাপ, নিষ্ফল, পুষ্প, চতুষ্পদ ইত্যাদি। ঙ) ই/উ-এর পর 'ঃ' এবং তারপর 'র' থাকলে 'ঃ' লুপ্ত হয়ে ই/উ ধ্বনি ঈ/ঊ-তে পরিণত হয়। যেমন— নীরব (নিঃ + রব), নীরোগ, (নিঃ + রোগ)নীরস, (নিঃ + রস), নীরক্ত (নিঃ + রক্ত) ইত্যাদি।

১৪) স্ত্রীবাচক শব্দ :

বেশকিছু পুরুষবাচক শব্দের শেষে ঈ, নী, ইনী আনী, ইকা প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এসব স্ত্রীবাচক শব্দের বানান প্রত্যয়-যোগের নিয়মে নির্দিষ্ট হয়। যেমন : 'নী' প্রত্যয়-প্রণয়িনী, ভিখারিনী, মালিনী, দুঃখিনী, মায়াবিনী, মেধাবিনী ইত্যাদি। 'ইনী' প্রত্যয়— বাঘিনী, কাঙালিনী, গোয়ালিনী ইত্যাদি। 'আনী' প্রত্যয়— মেথরানী, চাকরানী, মাতুলানী, ইন্দ্রানী ইত্যাদি। 'ইকা' প্রত্যয়— নাটিকা, পুস্তিকা, গায়িকা, প্রভাষিকা, অধ্যাপিকা, পরিচালিকা ইত্যাদি।

১৫) বিশেষ্য-বিশেষণ পদ :

সাধারণত ক্রিয়ামূল বা নামশব্দমূলের পরে বিভিন্ন প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠন করা হয়। শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবে বেশকিছু শব্দের বানান ভুল হয়। যেমন— উৎকর্ষতা, অপকর্ষতা, কৃচ্ছ্রতা, দারিদ্র্যতা, সৌজন্যতা, সৌহার্দ্যতা, গাম্ভীর্যতা, মাধুর্যতা, ভারসাম্যতা, সখ্যতা, মৌনতা, দৈন্যতা, বাহুল্যতা, সহযোগীতা, উপকারীতা, অধীনস্থ, অর্ধাঙ্গিনী, আহরিত, ঐক্যমত, ঐক্যতান, জন্মজয়ন্তী,

জন্মবার্ষিকী, নির্ধনী, নির্দোষী, নিরপরাধী, নিরহঙ্কারী, মুখরিত, নিঃশেষিত, পূর্বসূরী, সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধশালী, আভ্যন্তরীণ, পরলৌকিক ইত্যাদি। এসব শব্দের শুদ্ধ রূপ হলো যথাক্রমে— উৎকর্ষ, অপকর্ষ, কৃচ্ছ্র, দারিদ্র্য, সৌজন্য, সৌহার্দ্য, গাম্ভীর্য, মাধুর্য, ভারসাম্য, সখ্য, মৌন, দৈন্য, বাহুল্য, সহযোগিতা, উপকারিতা, অধীন, অর্ধাঙ্গী, আহৃত, ঐকমত্য, ঐকতান, জয়ন্তী, জন্মবার্ষিক, নির্ধন, নির্দোষ, নিরপরাধ, নিরহঙ্কার, মুখর, নিঃশেষ, পূর্বগামী, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধ, অভ্যন্তরীণ ও পারলৌকিক।

১৬) বাহুল্য শব্দ :

দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা অনেক বাহুল্য শব্দ ব্যবহার করি। এ ধরনের শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র, শুধুমাত্র, সদাসর্বদা, সময়কাল, সমতুল্য, অনেকগুলো, সবগুলো, যতক্ষণ পর্যন্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত, অশ্রুজল, সঠিক, তবুও, আবারও পরিবারবর্গ, বাহিনীরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব শব্দের প্রমিত রূপ হলো যথাক্রমে–কেবল বা মাত্র, শুধু বা মাত্র, সদা বা সর্বদা, সময় বা কাল, সম বা তুল্য, অনেক, সব, যতক্ষণ, ততক্ষণ এবং অশ্রু বা চোখের জল, সঠিক, তবু, আবার,পরিবার ও বাহিনী।

১৭) প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দ ঃ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের সংখ্যা অনেক। এসব শব্দের উচ্চারণ প্রায়-অভিন্ন হলেও বানানভেদের কারণেই অর্থভেদ হয়ে থাকে। তাই এ-শ্রেণীর শব্দের বানান কষ্ট করে শিখে নিতে হবে। সামান্য বানানভেদে অর্থভেদ ঘটে— এ ধরনের বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের উদাহরণ লক্ষণীয় : অনু (পশ্চাৎ), অণু (বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ); অর্ঘ (মূল্য), অর্ঘ্য (পূজার উপকরণ); কৃতি (কাজ) কৃতী (মেধাবী, যোগ্য); দিন (দিবস), দীন (দরিদ্র, ধর্ম); কুজন (খারাপ লোক), কূজন (পাখির ডাক); নিচ (নিম্ন), নীচ (হীন); কুল (বংশ, বরই), কূল (নদী বা সমুদ্রের তীর); সাক্ষর (শিক্ষিত), স্বাক্ষর (দস্তখত), শিকার (মৃগয়া), স্বীকার (অঙ্গীকার), জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ, প্রবীণ), জ্যৈষ্ঠ (মাস বিশেষ) ইত্যাদি।

১৮) বিবিধ শব্দঃ

উল্লিখিত শব্দগুলো ছাড়াও আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যেসব শব্দের বানান প্রায়ই ভুল হয়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শব্দগুলো হলো— অতিথি, অদ্ভুত, অদ্যাবধি, অধ্যবসায়, অনূদিত, অনুকূল, অনুভূতি, অন্তর্ভুক্ত, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, আকৃতি, আনুষঙ্গিক, আয়ত্ত, আশীর্বাদ, আহূত, ইতোপূর্বে, ইতোমধ্যে, ইদানীং, উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, উত্ত্যক্ত, উদ্‌গিরণ, উর্ধ্ব, উপরিউক্ত, উল্লিখিত, উচ্ছৃঙ্খল, উহ্য, এদ্বারা, কটূক্তি, কুৎসিত, কৌতূহল, ক্রূর, খেলাধুলা, গগন, গড্ডলিকা, গ্রহীতা, চত্বর, চূড়ান্ত, চুষ্য, ছত্রচ্ছায়া, জীবী, জীবিকা, তত্ত্ব, স্বত্ব, সত্তা, ত্বরান্বিত, সমীচীন, হরিলক্ষ্মী, দ্বন্দ্ব, দুরবস্থা, দূরীভূত, দুরূহ, দূষণ, দূষিত, দূষণীয়, দিগ্বিজয়ী, দুর্গাপূজা, দৌরাত্ম্য, নিরীক্ষণ, নিরীহ, ন্যূনতম, নূপুর, শুশ্রূষা, পরিপক্ব, পশ্চাৎপদ, পিপীলিকা, পুঙ্খানুপুঙ্খ, সূক্ষ্ম, পুঞ্জীভূত, পুষ্করিণী, পৈতৃক, প্রোজ্জ্বল, প্রজ্বলিত, ফলপ্রসূ, বশীভূত, বিকীর্ণ, বিকিরণ, বিদুষী, বিদ্রূপ, বিপণন, বীভৎস, ব্যুৎপত্তি, মুমূর্ষু, বুভুক্ষু, বৈচিত্র্য, ব্যাধি, ব্যথা, ব্যক্তি, ব্যবসায়, ভূতপূর্ব, ভূয়সী, ভুবন, ভূয়া, ভৌগোলিক, ভ্রাম্যমাণ, ভ্রূক্ষেপ, ভ্রূকুটি, মনঃপূত, মনীষী, মন্ত্রিসভা, প্রাণিজগৎ, মরীচিকা, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, মীমাংসা, মুখস্থ, মূর্খ, মুহূর্ত, লক্ষণীয়, শ্বশুর, শাশুড়ি, শারীরিক, শাশ্বত, স্বতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্য, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, স্বচ্ছন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য, জ্যোতিষ্ক, মস্তিষ্ক, ব্যবসায়, বাণিবদ্ধ, প্রাণিবিদ্যা, স্নেহাশিস, দেবাশিষ, শুভাশিস, সঞ্জীবনী, সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক, সম্মুখ, স্বস্তি, সান্ত্বনা, সুধী, সুষ্ঠু, সচ্ছল, সস্ত্রীক, সপরিবার, সন্ন্যাসী, শ্মশান, স্মরণিকা, সরস্বতী, স্বায়ত্তশাসন, সার্থক, হঠাৎ ইত্যাদি।

বস্তুত মানবজীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষিত মানুষ তার মাতৃভাষাকে দু ভাবে ব্যবহার করে

থাকে— মৌখিক ও লৈখিক। মৌখিক ভাষার শুদ্ধতার জন্য তাকে জানতে হয় ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালী, আর লৈখিক ভাষার শুদ্ধতার জন্য তাকে শিখতে হয় শব্দের বানানের নিয়ম। মাতৃভাষার উচ্চারণপ্রণালী ও বানানরীতি যত জটিলই হোক না কেন, প্রকৃত মাতৃভাষাপ্রেমিকেরা কঠোর শ্রম স্বীকার করে হলেও তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আরবি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশী ভাষা শুদ্ধভাবে শেখার জন্য যে সাধনা করি ও অর্থব্যয় করে থাকি, রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভাষা বাংলাকে শুদ্ধভাবে বলতে ও লিখতে শেখার জন্য তার কিঞ্চিৎ সাধনা ও অর্থব্যয় করতেও প্রস্তুত নই। মাতৃভাষার প্রতি আমাদের চরম উদাসীনতার একটি বাস্তব প্রমাণ হলো— আমাদের প্রত্যেকেরই কাছে এক বা একাধিক English Dictionary থাকলেও অনেকেরই কাছে হয়ত একটিও বাংলা অভিধান নেই। অথচ শিক্ষিত বাঙালিমাত্রেরই কর্তব্য—English Dictionary-র পাশাপাশি অন্তত একটি করে বাংলা অভিধান কাছে রাখা। একথা প্রত্যেকেরই উপলব্ধি করা দরকার যে, মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলতে ও লিখতে পারা উপহাস্যকর বা নিন্দার বিষয় নয়, বরং তা গৌরবের ও প্রশংসার বিষয়।

পরিশেষে বলতে চাই, বাংলা একাডেমী যেহেতু 'জাতির মননের প্রতীক', সেহেতু বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার রয়েছে আরো অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সব ধরনের সংস্কারবদ্ধতা ও বিকল্প বানানরীতি থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা একাডেমীর বানানরীতিকে করতে হবে আরো স্বচ্ছ ও প্রমিত। এরপর সরকারি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে উক্ত বানানরীতি অনুসরণের আহ্বান জানাতে হবে। আর এভাবেই হয়ত একদিন দূর হবে বাংলা বানানের বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি।

কার্টুন

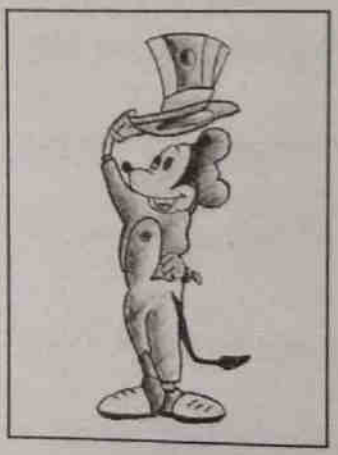

সুমন
কলেজ নম্বর-৭৯৭৬
৫ম শ্রেণী

সুলতানুল আরেফিন
কলেজ নম্বর-৭৭৮৩
ষষ্ঠ শ্রেণী

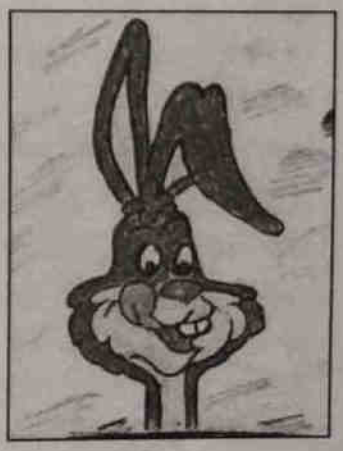

জুবাইর হাসান
কলেজ নম্বর-৭৬৭০
ষষ্ঠ শ্রেণী

ইংরেজি মাসের নাম

খ, ম, সারোয়ার মিরাল
কলেজ নম্বর : ১০৩২
শ্রেণী : সপ্তম (দিবা)

জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বার মাস। এই বার মাসে এক বছর। এই বারটি মাসের রয়েছে নিজ নিজ জন্ম কথা। তখন ছিল রোমানদের যুগ। রোমানরা গ্রীক বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বছর গুনতো ৩০৪ দিনে , যাকে দশ মাসে ভাগ করা হয়। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর জন্ম তখনো হয়নি। মার্চ ছিল তখন বছরের প্রথম মাস।

এক সময় রাজা পম্পিলিয়াস দেখলেন, ৩০৪ দিন হিসেবে বছর করলে প্রকৃতির সাথে মিলছে না। তাই তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ সালে বছরের সাথে যোগ করলেন আরো ৬০ দিন। এতে বছরের দিন সংখ্যা ঠিকই বাড়লো, কিন্তু সমস্যা শেষ হলো না। সময় এগিয়ে আছে দুই মাস। তখন রোম রাজ্যের বিখ্যাত অধিপতি জুলিয়াস সিজার ঢেলে সাজালেন বছরকে। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীকে বছরের প্রথম দিকে নিয়ে এলেন তিনি।

১. জানুয়ারী ঃ রোমান দেবতা জেনাস এর নাম থেকে রাখা হয়।

২. ফেব্রুয়ারী ঃ রোমান ফেব্রুয়াম উৎসবের নাম থেকে রাখা হয়।

৩. মার্চ ঃ রোমান যুদ্ধের দেবতা মার্জ এর নামানুসারে মার্চ নাম রাখা হয়।

৪. এপ্রিল ঃ বসন্তের মোহনীয় দ্বার খুলে দেয়াই এপ্রিলের কাজ। তাই কেউ কেউ ধারণা করেন, ল্যাটিন শব্দ এপিরিবি হতে 'এপ্রিল' এসেছে। এপিরিবির অর্থ খুলে দেয়া। আবার অনেকের ধারণা- রোমান দেবী 'আফ্রিদিতি'র নাম থেকে 'এপ্রিল' নামের জন্ম হয়েছে।

৫. মে ঃ রোমান দেবী মাইয়া এর নামানুসারে রাখা হয়।

৬. জুন ঃ রোমানদের স্বর্গের দেবী জুনিয়র এর নামানুসারে 'জুন' নাম রাখা হয়।

৭. জুলাই ঃ রোম রাজ্যের অধিপতি জুলিয়াস সিজারের নামানুসারেই জুলাই এর নামকরণ করা হয়। একটি মজার ব্যাপার হলো, বছরের প্রথমে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীকে স্থান দিয়ে তিনি নিজেকেই নিজে দূরে সরিয়ে রাখেন।

৮. আগস্ট ঃ রোমান সম্রাট 'অগাস্টান' এই মাসে বহু যুদ্ধে জিতেছিলেন ও সৌভাগ্যের অধিকারী হন বলে তাঁর নামের অনুসরণে 'আগস্ট -এর নামকরণ করা হয়।

৯. সেপ্টেম্বর ঃ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে - বছরের সপ্তম মাস। কিন্তু জুলিয়াস সিজারের বর্ষ পরিবর্তনের পর তা এসে দাঁড়ায় বছরের নবম মাসে। তারপর এটি পরিবর্তিত হয়নি।

১০. অক্টোবর ঃ এর শাব্দিক অর্থ - বছরের অষ্টম মাস। সেই অষ্টম মাসের স্থান এখন ক্যালেণ্ডারের দশম মাসে। জুলিয়াস সিজারের বর্ষ পরিবর্তনের ফলেই শাব্দিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

১১. নভেম্বর ঃ 'নভেম' শব্দের অর্থ - নয়। সেই অর্থানুযায়ী নভেম্বর ছিল নবম মাস। জুলিয়াস সিজারের কারণে আজ নভেম্বরের স্থান এগারোতে।

১২. ডিসেম্বর ঃ ল্যাটিন শব্দ 'ডিসেম' - এর অর্থ দশম। জুলিয়াস সিজারের বর্ষ পরিবর্তনের ফলে ডিসেম্বরের অবস্থান এখন ক্যালেণ্ডারের শেষ পাতায়, বারোতে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

নূরুল আফসার
কলেজ নম্বর : ৭১৮৫
শ্রেণী : অষ্টম-ক

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি, বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি মহান তাৎপর্যপূর্ণ দিন। বাঙালি জাতির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন বাঙালি এই দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। এ দিনে বাংলার দামাল ছেলে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউর ও আরো অনেকের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে পেয়েছি। ১৯৫২ সালের পর বাংলা ভাষাকে ১৯৫৬ সালে সরকার 'রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। তখন থেকে এ দিনটি একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে আসছে। এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের শহীদ দিবস নয়, এ দিনটি বর্তমানে সারা বিশ্বে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো এর সাধারণ পরিষদের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২৭টি দেশের সমর্থন নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারপর ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পলিত হয়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত একুশে ফেব্রুয়ারি 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারটি বাংলাদেশের তথা গোটা বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। কারণ, ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে বাঙালি জাতি আত্মমর্যাদার চেতনা লাভ করেছিল, লাভ করেছিল মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রেরণা এবং অনুভব করেছিল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা। আর এই অনুপ্রেরণাই পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মদানে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল।

আসিফ মাহমুদ

কলেজ নম্বর : ৮৫৪২
শ্রেণী : নবম-বিজ্ঞান

ফুল ভীতি :

অনেকের মাঝে একটি ধারণা রয়েছে যে, "ফুল আর শিশুকে যে ভালবাসে না সে নাকি মানুষ হত্যা করতে পারে।" ফুলের সুগন্ধ ও সৌন্দর্য মানুষের মন প্রফুল্ল রাখে। তবে ইংল্যান্ডের লেডী হ্যানিয়াগের কাছে ফুল ছিল আতঙ্কের প্রতীক। বিশেষ করে গোলাপ ফুল দেখলে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত। পরে তাঁর ডাক্তাররা গবেষণা করে জেনেছেন যে, এক ধরনের অ্যালার্জির জন্য ফুল তাঁর জীবনে মরণযন্ত্রণা হয়ে দেখা দিয়েছিল।

কর্মনিষ্ঠা :

অধ্যবসায় যে মানুষকে বিশ্বজয়ী করে তুলতে পারে তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার শেফিল্ডের কিন উইলিয়াম। তিনি ছিলেন অন্য দশজনের মতই স্বাভাবিক মানুষ। কাজ করতেন শেফিল্ডের কাঠ চেরাইয়ের কলে। একবার কাঠ চিরতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় তিনি তাঁর ডান হাত হারান। কিন্তু পঙ্গুত্ব তাঁকে একদম দমাতে পারেনি। প্রচণ্ড অধ্যবসায় ও মনোবলের ফলে এক সময় তিনি বাম হাতে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাম হাতে কুঠার চালাতে

পারতেন। তিনি ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বরে শেফিল্ডের এক গাছ কাটার প্রতিযোগিতায় সুস্থ সবল কাঠুরেদের হারিয়ে প্রথম হয়েছিলেন। সারা বিশ্ব সেদিন এ খবর শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল।

ভীতু বীর :

বিচিত্র মানুষ নিয়ে আমাদের এ সমাজ। সমাজে এমনও মানুষ আছেন, বিপজ্জনক কাজ করতে যারা কোন ভয় পান না। কিন্তু সামান্য তেলাপোকা দেখলে আঁতকে ওঠেন অনেকে। ফ্রান্সের বিখ্যাত বীর ফিল্ড মার্শাল নিকোলাস অগাস্টি দ্যা মান্ট্রিভেল একশোটি যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে ফরাসীদের কাছে সম্মান কুড়িয়েছিলেন। কিন্তু অবাক করার মত ব্যাপার হল যে, এই বীরযোদ্ধাই সামান্য একটা লবণদানি পড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন।

সত্যিকারের ড্রাকুলা :

ড্রাকুলাকে সকল হররপ্রেমী পাঠক চেনেন। এ পর্যন্ত এই ভ্যাম্পায়ারকে নিয়ে অনেক সুপারহিট মুভি তৈরি হয়েছে। কিন্তু রোমানিয়ার ইতিহাসে ড্রাকুলা নামধারী এক লোক ছিল এবং গল্পের-ছবির ড্রাকুলার চেয়েও সে ছিল অনেক ভয়ংকর। তবে গল্পের ড্রাকুলার মত তিনি ভ্যাম্পায়ার ছিলেন না। তাঁর নাম ভলাদ টেপেস। তিনি রোমানিয়ার শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে তিনি তাঁর লোক দ্বারা শত্রুদেরকে ভয়ংকর পদ্ধতি প্রয়োগ করে হত্যা করতেন। এসব দেখে তখনকার রোমানিয়ার লোকেরা তাকে আসলে যমদূত বলত। যা রোমানীয় ভাষায় অনুবাদ করলে হয় "ভলাদ টেপেস" এছাড়াও তিনি পিতার প্রতি শ্রদ্ধার নির্দশন হিসেবে নিজ নাম সই করতেন "ড্রাকুলা" বা "ড্রগলিয়া", আর তা থেকে ড্রাকুলা শব্দটি এসেছে। মজার ব্যাপার হল, ড্রাকুলার লেখক ব্রাম স্ট্রোকার ড্রাকুলা লেখার উৎসাহ পেয়েছিলেন ভলাদ টেপেসের নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনে।

এক পানি দুই স্বাদ :

ভারতের রাজস্থানের জয়পুরে সমবার নামে একটি লবণাক্ত হ্রদ অবস্থিত। প্রতি বছর অক্টোবর হতে মে পর্যন্ত এ হ্রদ হতে লবণ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু জুন হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একই হ্রদ হতে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কিভাবে এমন হয় ও কেন হয় সে সম্পর্কে আজও জানা যায়নি। *("রিপ্লেস বিলিভ ইট অর নট" হতে সংগৃহীত)*

বিশ্বের ব্যতিক্রম ও বিচিত্র

শাহিদুজ্জামান
কলেজ নম্বর : ৭৭২৩,
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান

অদ্ভুত গাছ :

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে আমাদের দেশের আম গাছের মতো এক অদ্ভুত গাছ জন্মায়। প্রচণ্ড রোদে এ গাছের পাতা বাতাস হতে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তা পানি হয়ে ঝরে। এ পানি এত পরিষ্কার যে, তৃষ্ণার্ত মানুষ এই পানি পান করতে পারে। মাঝে মাঝে এতো পানি ঝরে যে, গাছের নিচে ডোবার সৃষ্টি হয়।

আমেরিকার গভীর জঙ্গলগুলোয় 'বাসিলাম ইউটিলে' নামক এক ধরনের গাছ আছে, যার আঠা গরুর দুধের মতো তরল ও পান করা যায়। এটা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এ দুধ টাটকা পান করতে হয়।

আফ্রিকা মহাদেশে 'ভেলভিশিয়া' নামক এক ধরনের গাছ আছে, যা ১০০ বছরে মাত্র ১ ফুট বাড়ে।

কানাডার 'ডগলাস' গাছটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, গাছটি হতে নির্গত রস চিনিতে রূপান্তরিত হয়।

ব্রাজিলের প্রকৃতিতে "কোপিয়াবা মালাটগুজা" নামক একপ্রকার গাছ আছে যা থেকে তেল পাওয়া যায়। গাছটির কাণ্ড ছিদ্র করলে অবিরত তেল পড়তে থাকে।

পুয়ের্তো রিকোতে "ফ্রেজলেটস" নামক এক ধরনের গাছ আছে যা আলো দেয়।

তিন চোখবিশিষ্ট প্রাণী : টুয়াটারা নামক প্রাণীটি টিকটিকি জাতীয়, কিন্তু তিন চোখবিশিষ্ট। এর দু'টি চোখ অন্যান্য প্রাণীর মতোই এবং তৃতীয় চোখটি মাথার উপর অবস্থিত। এ প্রাণী শুধুমাত্র নিউজিল্যান্ডে পাওয়া যায়।

পানি খায় না যে প্রাণী : যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম মরু অঞ্চলের "ক্যাঙ্গারু র‍্যাট" নামক এক ধরনের ইঁদুর জাতীয় প্রাণী সারা জীবনে একবারও পানি পান করে না।

নীলরক্তের প্রাণী : 'ক্যাটল ফিস' নামক তিন হৃৎপিণ্ড বিশিষ্ট প্রাণীর রক্ত নীল। কারণ এর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে আছে কপার মিশ্রিত হিমোসায়ামিন।

আজব পাখি : উত্তর আমেরিকায় 'গোল্ড ফিল্ড' নামের একজাতের পাখি আছে, যাদের পালকের রঙ ঋতু পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়।

অন্ধ সাহিত্যিক : পৃথিবীর অন্যতম দুটো অমর মহাকাব্য ইলিয়াড এবং ওডিসি। অষ্টম শতাব্দীতে হোমার এ মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন। অবাক বিস্ময় যে, হোমার ছিলেন আজীবন অন্ধ।

টুটেনখামেনের ধনরত্ন উদ্ধার

সৈয়দ আলী ইমাম
কলেজ নম্বর ১৬২৪
শ্রেণী : দশম বিজ্ঞান (দিবা)

মিশরের ফারাওদের কথা প্রায় আমাদের সবারই জানা। প্রাচীন মিশরীয় বাদশাহগণই ছিলেন এই ফারাও। এই ফারাওদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নাম টুটেনখামেন। সেই সময়ে দেবতা আমেনের পুজোর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি পুরোহিত ও প্রজাদের নিকট ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু তিনি মারা যান খুবই অল্প বয়সে। মৃত্যুর পর আত্মা পুনরায় দেহে ফিরে আসে-এই বিশ্বাসের কারণে তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী টুটেনখামেনের মৃতদেহ মমি করে একটি সোনার কফিনে মুড়িয়ে বহু মূল্যবান ধনরত্নসহ রাখা হয় পিরামিডের গোপন সমাধি মন্দিরে। শুধু তাই নয় তার সমাধির পাশে রাজপুরোহিতগণ পুঁতলেন মন্ত্রপূত বড়ি। তারপর দিলেন দিব্যি - যে মহামান্য ফারাওর শান্তি ভঙ্গ করবে, তার দেহে এই কোণা দিয়ে প্রবেশ করবে মৃত্যু।

কিন্তু তার শান্তি ভঙ্গ হল ১৯২২ সালের ২৬শে নভেম্বর। প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ হাওয়ার্ড এবং তাঁর পার্টনার ও অর্থ যোগানদার কর্নারভানকে সাথে করে আবিষ্কার করলেন টুটেনখামেনের মমি, সাথে সাথে আবিষ্কৃত হল প্রভূত পরিমাণে ধনরত্ন, সোনা ও মণিমুক্তা খচিত ফারাও টুটেন এর মস্তকাবরণ, রানীর পূর্ণাঙ্গ স্বর্ণমূর্তি ইত্যাদি, সে এক দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা।

কিন্তু আসল বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে থাকলো তারপর। টুটেনখামেনের গুপ্তধন আবিষ্কারের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় এক অজ্ঞাত রোগে মারা গেলেন কর্নারভান। ডাক্তাররাও ব্যর্থ হলেন তাঁর রোগ নির্ণয়ে আবার তাঁর মৃত্যুর সাথে আরও বিস্ময়কর ঘটনাও জড়িয়ে আছে। যেই মুহূর্তে তিনি মারা গেলেন, সেই মুহূর্তে কায়রো শহরের সবক'টি বৈদ্যুতিক বাতি রহস্যজনকভাবে নিভে যায়। শুধু তাই নয়, লন্ডনে কর্নারভানের একটি প্রিয় কুকুর ছিল। কর্নারভানের মৃত্যুর একই সময়ে কোনপ্রকার অসুখে আক্রান্ত হওয়া ছাড়াই কুকুরটি গোটা তিনেক ডিগবাজি দিয়েই উল্টে পড়ে মারা গেল। এরপর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন এক অদ্ভুত তথ্য। মমির গায়ে ছিল মশার

কামড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। অবিকল একই রকম ছিদ্র পাওয়া যায় কর্নারভানের শরীরেও। তা দেখে অনেকের অনুমান, হয়তো বা পিরামিডের ভেতরের ভৌতিক মশার কামড়েই মৃত্যু ঘটে কর্নারভানের। আবার অনেকের বিশ্বাস, পুরোহিতদের মন্ত্রপূতের কারণে মৃত্যু ঘটে তার। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল টুটেনখামেনের গুপ্তধন উদ্ধারে নিয়োজিত ছিল যেসব কুলি শ্রমিক, তাদের মধ্যেও ত্রিশজন কর্নারভানের মতই দিন কয়েকের মধ্যেই একই অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। কিন্তু এর বিপরীত কাণ্ডও ঘটেছে। প্রধান আবিষ্কর্তা মিঃ হাওয়ার্ড শ্রমিকদের সাথেই মমি ও গুপ্তধন উদ্ধার করলেও তাঁর কিছুই হয়নি। তিনি পরিণত বয়সেই ১৯৩৯ সালে বুড়ো হয়ে মারা যান। এই রহস্যের কোন সঠিক ব্যাখ্যা আজও বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

সোনার শহর

আবদুল্লাহ নূরুস সালাম
কলেজ নম্বর : ৪৭১
শ্রেণী : দশম, বিজ্ঞান (দিবা)

সত্যি বলতে এই ঘটনাটি শুধু রোমাঞ্চকর কাহিনী হিসেবেই ভাল মানায়। ঘটনাটি কয়েক বছর আগের। পেরুর আমাজান অববাহিকার দুর্গম জঙ্গলে টেলিভিশনের জন্য ডকুমেন্টারি ছবি বানাতে গিয়েছিল একটি ইউনিট। জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘেরা জায়গাটির নাম "গ্রান প্রাহাতেন"। পুরো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে স্পেনের ইনকাদের ও আগের একটি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। ১৯৬৫ সালে এক মার্কিন অভিযাত্রী জেন সেভোর জায়গাটি আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় এটাই সবচাইতে প্রাক কলম্বাসীয় শহরের ধ্বংসাবশেষ। ঐতিহাসিক রহস্যময় হারানো শহর এলডোরাডোর খোঁজে অনেক অভিযাত্রী দল "গ্রান প্রাহাতেন" এলাকায় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েছে। কিন্তু কেউ খুঁজে পায়নি রহস্যে ভরা সেই সোনার শহর। তো একদিন এই ডকুমেন্টারি দল গিয়েছিল "গ্রান প্রাহাতেন" এলাকায় একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চারজন মূল ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলল। পথ হারিয়ে ফেলল আমাজানের গহীন অরণ্যে।

তারা চারজন ছিলেন, বেলজিয়ামের জ্যাঁ দ্য কনিক, পেরুর সেগুনদো বিভারেইরা, মারিও কালেগেরি এবং ভাল মাসিয়াল। এঁরা ছিলেন সকলেই পক্ষী বিশারদ। তবে জন মারসিয়াল খরস্রোতা নদী আবিসিওতে পড়ে প্রাণ হারান এবং তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে তারা নিজেদের অজান্তেই এমন এক অরণ্যে প্রবেশ করেন, যেখানে ইতিপূর্বে কোন সভ্য মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। খুব শিগগিরই তাঁদের সঞ্চিত খাদ্য ফুরিয়ে গেল। খিদের তাড়নায় তাঁরা হাঁটতে পারছিলেন না। খিদের জ্বালায় তাঁরা প্রজাপতি ধরে খেতে লাগলেন। চলতে চলতে পথে পেলেন ১০ ফুট লম্বা সাপ। সেদিন তাদের পেটে পড়ল সাপের মাংস। এভাবে এলোমেলো চলতে চলতে তাঁরা নৃতত্ত্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটালেন। আমাজানের অপাপবিদ্ধ অরণ্যে তাঁরা আবিষ্কার করলেন ইনকাদের চেয়েও প্রাচীন এক জাতির, পাথরে গড়া এক নগরের। আর ঐ শহরের পাশেই খুঁজে পেলেন তাল তাল সোনার আকর। শত শত বছর ধরে লতাপাতার জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়েছিল এই শহর। "গ্রান প্রাহাতেনের" চেয়েও অনেক বড় এই নগর। পরে উদ্ধারকারী দল তাঁদের মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এরপর জানা যায় তাঁরা নৃতত্ত্ববিদ নন। কিন্তু তাঁরা যা নমুনা পেয়েছিলেন, তা সংগ্রহ করে এনেছেন। ঘটনাটি বেশ কিছুদিন গোপন করে রাখা হলেও পরে এটি প্রকাশিত হয়ে যায়। বিস্ময়কর এই ঘটনাটি স্টিফেন স্পিলবার্গ বা হ্যাগার্ডের রোমাঞ্চকর কাহিনীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

পিতা

ইশতিয়াক আহমদ
কলেজ নম্বর : ৫১৪
শ্রেণী : দশম, বিজ্ঞান (দিবা)

'আমি চির বিদায় নিচ্ছি না, আমার সন্তানের মাঝে আমি বেঁচে থাকব বহুদিন।' কথাটি টমাস আটওয়ের। যদিও সব ক্ষেত্রে এর যথার্থ প্রকাশ লক্ষ করা যায় না, কারণ এমন অনেক মহামনীষী আছেন যাঁদের পিতা-মাতার নাম আমরা অনেকেই জানি না। তবুও কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার এরই মজার প্রয়োগ দেখা যায়। সন্তানের জন্য বিখ্যাত হলেও সেই সন্তানের নামই যদি কেউ না জানে, তবে আটওয়ের বাণীটির সত্যতা যথার্থ প্রমাণিত হয় বৈকি। এখন এরূপ কিছু পিতার কথা বলি, যারা বিখ্যাত তাদের সন্তানদের জন্য।

মরক্কোর সম্রাট ছিলেন মুলাই ইসমাইল (১৬৪৬-১৭২৭)। তাঁর সন্তানসংখ্যা ছিল ৮৮৮ জন। সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫৪০ জন। আর মজার বিষয় এই যে, এরা সবাই ছিলেন বাদশাহজাদা অর্থাৎ সম্রাটের নিজের পুত্র সন্তান। তাঁর পরিবারের এই সদস্য সংখ্যা গণনা করে তাঁর প্রধান নাপিত গুইল্ড। হেরেমের নিয়ম ছিল কোন বেগমের পুত্র সন্তান হলে নাপিতকে একটি সোনার ক্ষুর উপহার দিতে হবে। আর কন্যা সন্তান হলে দিতে হবে একটি রূপোর আয়না। সম্রাট মুলাই এর রাজত্বকাল শেষ হবার পর গুইল্ড হিসাব করে দেখল যে, তার কাছে ৫৪৮ টি সোনার ক্ষুর ও ৩৪০টি রূপোর আয়না জমা পড়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই বাদশার ৫৪৮+৩৪০=৮৮৮ জন পুত্র-কন্যার জন্ম হয়েছে।

তুরস্কের আরেক সুলতান আবদুল হামিদ দ্বিতীয় (১৮৭৬-১৯০৯)। এই দ্বিতীয় হামিদের সন্তান ছিল ৫০০ জন। যদিও সংখ্যাটি আনুমানিক, দু'চার জন কম-বেশী হতে পারে। তবে সন্তানের চেয়ে তাঁর বেগমের সংখ্যা ছিল আরো অবিশ্বাস্য। সুলতান দ্বিতীয় হামিদের বেগম ছিল ৩০,০০০ জন। আরেক আফ্রিকার কঙ্গোর রাজা কিং পেন্টি (১৮৭৩- ১৮৯৪)। তিনি মোট রাজত্ব করেছিলেন ২১ বছর। আর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৯০ জন। এর মাঝে ৫৫জনই ছিল তাঁর আপন বোন। বেলজিয়ান কঙ্গোর এক রাজা ছিলেন কিং মুসীদী। তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,০০০ জন। প্রায় বলার কারণ, এই সংখ্যা কখনো ঠিক থাকত না। প্রতি বছরই কম-বেশী হতো। প্রতি বছরই তিনি কয়েক শ নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতেন এবং বাদ দিতেন পুরোনোদের। কিংবা দান করে দিতেন অন্য রাজাদের। রাজা মুসীদার সন্তানসংখ্যা ছিল ৯১০ জন। কিন্তু এত সুখ কপালে সইলো না। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার তাঁকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করে। বিচারে দেখা যায়, তিনি নিজের হাতেই তাঁর ২৭ জন স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। ভোহোমির, বেহানজিন রাজার সন্তান ছিল ৯০২ জন। তাঁর জীবিতদের মাঝে ৬৬ জন হয়েছিলেন রাজা। আর ভাগ্যদোষে ২২০ জন হয়েছিলেন ঝাড়ুদার। ইতিহাস এরকম আরো বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী। যত যাই হোক না কেন, পিতা বলে কথা। অন্তত ইতিহাস তো তাই বলে।

"শিক্ষার্থীরা নিজে চিন্তা করতে শিখবে, সন্ধান-কার্য চালাবে এবং কর্তব্য কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করবে।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কতিপয় অসঙ্গতি

মোঃ মুনিম বিন সেলিম
কলেজ নম্বর : ৪৯২
শ্রেণী : দশম, বিজ্ঞান (দিবা)

সুপ্রাচীন কাল থেকে সম্ভবত যোগাযোগের জন্য সহজতম ও সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাধ্যম হচ্ছে কথা বলা। সাধারণভাবেই আমরা যোগাযোগের জন্য এই মাধ্যম সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। কথার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ভাব যত বেশি দ্রুত ও সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করতে পারি, অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারা তা সম্ভব হয় না। মানুষের কণ্ঠস্বরও এক্ষেত্রে বড় সহায়ক। কিন্তু তার পরেও কথা বলার সময় আমরা যে কত ভুল বলে থাকি, তা কি আমরা খেয়াল করি? এসব ভুলের জন্য আমি অজ্ঞতাকে দায়ী করি না, দায়ী করি অসাবধানতাকে। একটু খেয়াল করলেই আমরা এসব ভুল হতে মুক্ত থাকতে পারি। অনেকে হয়তো বলবেন, এই আধুনিক ব্যস্ত জীবনে এত শুদ্ধভাবে কথা বলতে গেলে সময় নষ্ট হবে, তবে নিম্নের বিষয় সম্পূর্ণ পড়লেই বুঝতে পারবেন, এসব ভুল শুদ্ধ করলে সবক্ষেত্রে যে কথা বড় হবে তাই নয়। কিছু ক্ষেত্রে কথা সংক্ষিপ্ত হয়ে মূল্যবান সময় বাঁচাবে।

তাহলে আসুন, আমাদের প্রচলিত, এবং সাধারণ কিছু ভুল সর্ম্পকে জেনে নেয়া যাকঃ **বিয়ে খাওয়া** ঃ এটি একটি খুবই সাধারণ এবং বহুল ব্যবহৃত ভুল। 'বিয়ে খেয়ে আসলাম' বা রাতে বিয়ে খেতে যাব' এ জাতীয় কথা জীবনে বলেনি এমন বাঙালি মনে হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা আসলেই কি বিয়ে খেতে যাই? না, আমরা যাই বিয়ের দাওয়াতে খাবার খেতে। আমাদের দেশে অনেক গরীব বাবা-মাই তাদের সঞ্চয়ের একটা বিরাট অংশ দিয়ে, অনেক কষ্ট করে তাদের ছেলে মেয়ের বিয়ে দেন। আর আমরা যদি বিয়েটা খেয়ে ফেলি? খুব খারাপ ব্যাপার। এক্ষেত্রে বিয়ে শব্দটির পরে 'তে' যোগ করে, অর্থাৎ বিয়েতে খেতে গিয়েছিলাম বলে খুব সহজেই আমরা এ ভুল শুদ্ধ করতে পারি।

দাওয়াত খাওয়া ঃ এটিও প্রায় একই ধরনের ভুল। বাঙালি ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল দাওয়াত। কিন্তু দাওয়াত শুধুমাত্র দেয়া এবং নেয়া, বা গ্রহণ করা বা রক্ষা করা যায়, খাওয়া যায় না। বিয়ের মত এক্ষেত্রেও আমরা শুধু 'এ' যোগ করে ভুল শুদ্ধ করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের উচিত দাওয়াত খাওয়া না বলে 'দাওয়াতে যাওয়া' বলা।

চোখে দেখা ঃ হেডিং দেখে মনে হতে পারে এখানে আবার ভুল কোথায়? এটি ঠিক ভুল নয়, ব্যাকরণের ভাষায় বাহুল্য দোষ বলা যায়। ব্যাখ্যা করছি। মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় হচ্ছে চোখ। চোখ দ্বারাই শুধুমাত্র মানুষ দেখতে পারে, নাক মুখ বা কান দিয়ে নয়। ফলে দেখা কথাটি উচ্চারণ করলেই তা চোখ দ্বারা দেখা বোঝায়, আলাদাভাবে চোখ বলতে হয় না এজন্য চোখে দেখ, কথাটায় চোখ অপ্রয়োজনীয়। একই কারণে কানে শোনা কথাটিতেও ভুল আছে।

গেম খেলাঃ এই ভুলটিও আগের মত। তবে এটি সম্ভবত ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে। যেহেতু ইংরেজি ভাষায় Play শব্দটি খেলা ছাড়াও আরও অন্যান্য কাজ (যেমন বাদ্যযন্ত্র বাজানো) বোঝায়, সেহেতু খেলাধুলা বোঝাতে সেখানে Play এর সাথে Game শব্দটি উচ্চারণ জরুরী। কিন্তু বংলা ভাষায় খেলা বলতে শুধু নানাবিধ খেলাধুলাকেই বোঝায়। ফলে এখানে 'গেম' উচ্চারণ অনাবশ্যক। ফলে, সে গেম খেলছে এমন ভুল কথাও আমরা প্রায়ই শুনে থাকি।

হাতের লেখা ঃ প্রায় এই রকম একটি কথা হল হাতের লেখা। সাধারণভাবে মানুষ হাত দিয়েই লেখে অতএব এখানে আলাদাভাবে হাত বলা অপ্রয়োজনীয়। একই জাতীয় আরও কিছু ভুল হল বৃষ্টির পানি (যেহেতু বৃষ্টিতে

সাধারণত পানিই পড়ে থাকে, শিল পড়ে কদাচিৎ, বৃষ্টি বলতেই এর পানিকে বোঝায়।) লাইটের আলো ইত্যাদি।

পানি খাওয়া ঃ এটি একটি সাধারণ ভুল ও অনেকেই এই ভুল করে থাকেন। পানি খাওয়া যায় না, পান করতে হয়।

দাঁত ব্যথাঃ এটি তো একটি মারাত্মক ভুল! আমাদের দেশে ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে এ ভুল করে থাকেন। আমরা যাকে দাঁত ব্যথা বলি তা দাঁত ব্যথা নয় বরং মাড়ি ব্যথা। আমাদের দাঁতে ব্যথা হয় না। ব্যথা হয় মাড়িতে। অথচ ডাক্তাররাও দাঁত ব্যথার চিকিৎসা করে থাকেন।

গরু খাওয়া ঃ আমরা নাকি প্রায়ই গরু খাই, কিন্তু আসলে তা নয় আমরা খাই গরুর মাংস। পার্থক্য কি জানতে চান? গরু ও গরুর মাংসের মধ্যে পার্থক্য আছে। গরু ঘাস খায়। কিন্তু গরুর মাংস ঘাস খায় না। একইভাবে আমরা মুরগী খাসী না খেয়ে ওদের মাংস খাই। আমাদের দেশের রেস্টুরেন্টে তে প্রায়ই গরু মুরগী নিয়ে আসার অর্ডার দেয়া হয়। অর্থাৎ অনেকেই বয়কে বলেন গরু নিয়ে আয়, হাফ প্লেট মুরগী আন, "ভাগ্যিস হোটেলের বয়দের প্রায় সবাই অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত। নয়ত আমাদের আদেশ পালন করতে গিয়ে তারা ঝামেলায় পড়ত।

হাফ বিরিয়ানিঃ হোটেল-রেস্টুরেন্টে তো প্রায়ই হাফ বা ফুল বিরিয়ানি আনতে বলা হয়। আমাদের উদ্দেশ্য থাকে হাফ বা ফুল প্লেট বিরিয়ানি আনতে বলা। কেউ কি আসলেই হাফ বিরিয়ানি খেতে চায়? অনেকে আবার একটা বা দুটো ভাজি চেয়ে থাকেন। একটা ভাজি কি আনা সম্ভব?

হরিণের মত চোখঃ কান ও চোখকে সুন্দর বোঝাতে আমরা বলি হরিণের মত চোখ। কিন্তু মানুষের চোখ হরিণের মত হতে পারে না। হরিণের চোখের মত হতে পারে। একইভাবে কারও হাত বা পা অনেক বড় হলে আমরা বলি দৈত্যের মতন হাত। আসলে তার হাত দৈত্যের মত না, বরং দৈত্যের হাতের মতন।

মোবাইলে কথা বলাঃ আমরা অনেকেই কখনো বলে থাকি, মোবাইলে কথা বলছিলাম বা তার মোবাইল ইত্যাদি মোবাইল শব্দের অর্থ ভ্রাম্যমাণ, কোন বিশেষ ফোন নয়। এজন্য মোবাইলে কথা বলা যায় না। আর এখনকার দিনে লাইব্রেরি, রেষ্টুরেন্ট অনেক কিছুই মোবাইল হতে পারে। তাই আমি আশা করব, কেউ যেন আর কখনো মোবাইল না কিনে সেলুলার বা সেল ফোন কিনেন। শুধু ফোন কথাটি ব্যবহার করেও অনেক সময় মানুষকে বোঝানো যায়।

ফাইজলামিঃ 'ফাইজলামি করবি না' খুবই সাধারণ কথা। কিন্তু ফাইজলামি (শুদ্ধ ভাষায় ফাজলামো) কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ফাজিল + আমি। এজন্য পরবর্তীতে একথা কাউকে বলার আগে একবার অন্তত চিন্তা করবেন।

সময় সংক্ষিপ্তঃ মানুষকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, 'সময় সংক্ষিপ্ত' বা 'সময় নাই'। কিন্তু সময় সর্বদাই একই বেগে চলতে থাকে। তা কারও জন্য সংক্ষিপ্ত হয় না বা নাই হয়ে যায় না। ফলে এসব কথাকে ভুল বলা যায়। বরং একে শুদ্ধ করে আমরা বলতে পারি, এই এই কাজ করার জন্য সময় সংক্ষিপ্ত বা চিন্তা করার সময় নাই ইত্যাদি।

হৃদয় ঃ আমাদের মন বা অন্তর অর্থাৎ অনুভূতির কেন্দ্রস্থল হিসেবে হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড নামক অঙ্গটিকে বোঝানো হয়। কিন্তু বাহ্যিক অনুভূতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। মস্তিষ্কের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক অন্য দশটি সাধারণ অঙ্গের মতই। তাই যেসব অনুভূতির জন্য হৃদয় শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তাদের জন্যই হৃদয়ের বা দিলের বদলে কিডনী অঙ্গটি ব্যবহার করলে কি সত্যিই বর্তমান ভারতীয় ছবিগুলোর নাম নিম্নরূপ হত? 'হর দিন জো পেয়ার কারে গা' 'কিডনী চাহতাহে' 'কিডনী সে'। এভাবেই সাধারণ কথাবার্তায় আমাদের অগোচরেই আমরা বিভিন্ন ভুল করে থাকি। তবে এসব ভুল সবক্ষেত্রে শুদ্ধ না করলেও হয়। কারণ কথা বলার সময় আমাদের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে বোঝানো। মানুষ যদি বোঝে তবে সবই ঠিক, কিছু ভুল নয়।

অলৌকিক

এজরারুল আলম খান
কলেজ নম্বর : ৭৪৬
শ্রেণী : দশম বিজ্ঞান (দিবা)

'অলৌকিক' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'অলীক' থেকে। মূলগত অর্থে অলৌকিক ঘটনা বলতে মিথ্যা বা ভ্রান্ত ঘটনাকে বোঝায়। এ জাতের ঘটনা সাধারণত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখে আমরা হেসে উড়িয়ে দেই। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে, যা হেসে উড়িয়ে দেয়াটা খুব সহজ নয়। এরকমই একটি ঘটনা এটি। খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকে মিশরের রাজকুমারী আমেনরা মারা যান। তাঁকে যথানিয়মে সমাধিস্থ করা হয়। অনেক পরে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে তাঁর সে মমি কেনার জন্য চারজন ইংরেজ মিশরে আসেন এবং তন্মধ্যে একজন বেশ কয়েক হাজার পাউন্ড খরচ করে মমিটি কেনেন। কিন্তু এর জন্য তাকে নিদারুণ দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয়। মমি কেনার এক ঘন্টা পর তাঁকে মরুভূমির দিকে যেতে দেখা যায়। তিনি আর ফিরে আসেন নি।

এতেই শেষ নয়। অন্য তিনজন ইংরেজের একজন পর দিন ভৃত্য কর্তৃক এমনভাবে গুলিবিদ্ধ হন যে, তার হাত কেটে ফেলতে হয় অপর দুইজন মমিটি নিয়ে ইংল্যান্ডে ফেরেন। ফিরে এদের একজন দেখেন যে তার সম্পদ সম্পত্তি কে যেন জাল করে আত্মসাৎ করেছে। অপর জন ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন ও তার চাকরি খোয়া যায়। জানা যায় শেষ জীবনে তিনি দিয়াশলাই বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মমিটির এর পরবর্তী স্থান ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। কিন্তু যে ব্যক্তিই যে কোনভাবে মমিটির সংস্পর্শে এসেছে , তাকেই কোন না কোন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এমনকি এক মহিলা দর্শনার্থী, যে কিনা কাপড় দিয়ে মমির মুখের ময়লা পরিষ্কার করেছিলেন, তার ছেলে এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাটি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হতে থাকে। একজন ফটো সাংবাদিক মমিটির ছবি তোলেন। ছবিটা ডেভেলপ করে তিনি দেখতে পান রাজকুমারীর মুখের বদলে এক বীভৎস, বিকৃত মুখাবয়ব সেখানে। সে রাতেই তিনি আত্মহত্যা করেন। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ তাই সাধারণ্যে মমি প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়ে মমিটি স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু স্থানান্তর কাজ শুরুর একদিনের মধ্যে একজন কর্মী গুরুতর অসুস্থ হয়। পরদিন এ কাজের প্রধান নির্বাহীকে টেবিলের ওপর মৃত পড়ে থাকতে দেখা যায়। এত কিছুর পরেও মানুষের শখ অনন্ত। এক সৌখিন ইংরেজ মমিটি কিনে নিয়ে আসেন তার বাড়িতে। এর পর বিচিত্র দুর্যোগপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের পর তিনি মমিটিকে শেষ পর্যন্ত তার বাড়ির চিলেকোঠায় স্থান দিতে বাধ্য হন। কিন্তু মানুষের শখ চিরন্তন। এরপরেও এক আমেরিকান পর্যটক মমিটি কিনে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য নিউইয়র্কগামী এক বিখ্যাত জাহাজের কেবিন ভাড়া নেন এবং যথাসময়ে জাহাজে আরোহণ করেন। প্রিয় পাঠক বলতে পারবেন কি? জাহাজের নাম কী ছিল আর তার পরিণতিই বা কী হয়েছিল? জাহাজের পরিণতি সবারই জানা। ওটা ছিল সে জাহাজের প্রথম যাত্রা ও সে জাহাজ ছিল আন সিঙ্কেবল "টাইটানিক"। অবিশ্বাস্য না!

কৌতুক

মোঃ জিয়াউর রহমান
কলেজ নম্বর : ৭১৪০
শ্রেণী : অষ্টম-ক

প্রাইভেট টিউটর ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন

টিউটর ঃ তুমি আজ এখনও পড়তে আসছো না কেন?

ছাত্র ঃ স্যার টেলিভিশনে আজ ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ আছে, আজ আমি পড়ব না।

টিউটর ঃ তুমি পড়বে না তোমার বাবা পড়বে।

ছাত্র ঃ স্যার, বাবাকে এখনই ডাকছি। ধন্যবাদ স্যার।

মাসুদ রানা
কলেজ নম্বর : ৮০৯
শ্রেণী : নবম বিজ্ঞান (দিবা)

এক ছেলে তার বাবার সাথে বাসে করে যাচ্ছিল। বাসে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। কোন সিট ফাঁক ছিল না। তাই ছেলেটি তার বাবার কোলে বসে যাচ্ছিল। বাসে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে একটি পাগল অনবরত উচ্চস্বরে কথা বলছিল। এ দেখে ছেলেটি তার বাবাকে প্রশ্ন করল, লোকটা কেন বকছে? তখন বাবা উত্তর দিল, লোকটার মাথায় সিট আছে। তা শুনে ছেলেটি বললো, বাবা আমিতো সিটে বসিনি, তাই তার মাথায় গিয়ে বসি?

খানে আলম খান
কলেজ নম্বর : ৬৯৩
শ্রেণী : নবম (দিবা)

১. এক বাড়িতে পাত্রপক্ষ গিয়েছে মেয়ে দেখতে –

পাত্র পক্ষ : তো মেয়ের পড়াশোনা কতদূর?

কনে পক্ষ : এস. এস. সি. পাস। তবে বিয়ের পর আরও পড়বে।

পাত্র পক্ষ : কি যে বলেন, বিয়ের পর কি পড়াশোনা হয়?

কনে পক্ষ (ক্ষুব্ধ হয়ে) : হয় না মানে? প্রথম বিয়ের পরই তো এই মেয়ে এস. এস. সি. পাস করল!

২. জাপানী ও বাংলাদেশী লোকের কথোপকথন-

জাপানী : জানেন, আমাদের দেশে মাটির নিচে কয়েক'শ ফুট গভীর পর্যন্ত খুঁড়ে একটা টেলিফোনের তার পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশী : তো কি হয়েছে।

জাপানী : তার মানে আমাদের দেশ এত উন্নত যে কয়েক'শ বছর পূর্বেও মানুষ টেলিফোন ব্যবহার করত।

বাংলাদেশী : জানেন, আমাদের দেশে মাটির নিচে তিন'শ ফুট গভীর পর্যন্ত খুঁড়ে দেখা হয়েছে, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।

জাপানী : এতে কি প্রমাণিত হয়?

বাংলাদেশী : আমাদের দেশ এত উন্নত যে, কয়েক'শ বছর পূর্বেও লোকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করত।

৩. এক ভদ্রলোক কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে খেয়ে দেয়ে বেরুবার সময় বেয়ারাকে পাঁচ টাকা বখশিশ্ দিতেই বেয়ারা সবিনয়ে বলল-এই হোটেলে আমাকে ৫ টাকা দেয়া মানে আমাকে অপমান করা।

ভদ্রলোক : তো কত দিলে তুমি খুশি হবে?

বেয়ারা : আজ্ঞে আরো ৫ টাকা মানে ১০ টাকা।

ভদ্রলোক : দুঃখিত, তোমাকে দু'বার অপমান করার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

৪. রেল লাইনের উপর একটি ট্রেন চলছিল। হঠাৎ ট্রেনচালক ট্রেনটিকে রেললাইন থেকে পাশের একটি ক্ষেতে ঢুকিয়ে দিল। এতে যাত্রীরা অবাক ও ক্ষুব্ধ হল। তারা ট্রেন চালকের কাছে গেল –

যাত্রীগণ : আরে ভাই আপনি হঠাৎ ট্রেনটিকে রেললাইন থেকে ক্ষেতে ঢুকালেন কেন?

ট্রেনচালক : দেখুন ভাই, আমার কোন দোষ নেই, কারণ যখন আমি ট্রেন চালাচ্ছিলাম তখন একজন মানুষ রেল-লাইনের উপর ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

যাত্রীগণ : তো কি হয়েছে। আপনার উচিত ছিল প্রথমে হুইসেল বাজানো ও এতে লোকটি না সরলে তাকে মেরে ফেলেই সামনে এগোনো।

ট্রেন চালক : আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যখনই আমি তাকে ট্রেন দিয়ে পিষে ফেলতে গিয়েছি, অমনি সে একলাফে ক্ষেতের ভেতর ঢুকে গেল । তাই আমিও তাকে ট্রেন দিয়ে পিষবার জন্য ট্রেনটিকে ক্ষেতে ঢুকিয়ে দিলাম।

নাজিফ মাহবুব
কলেজ নম্বর : ১৯০০
শ্রেণী : চতুর্থ, ক –শাখা

ক্লাসে ছাত্রকে পড়া জিজ্ঞেস করলে ছাত্র বলতে পারলোনা। তখন শিক্ষক রাগ করে বললেন, "তুমি বাসায় পড়?"

ছাত্র ঃ না স্যার।
শিক্ষক ঃ কেন পড় না?
ছাত্র ঃ পড়লে ব্যথা পাই তাই।

এস.এম ইনজামাম-উল-হক
কলেজ নম্বর :১৭৯১ (দিবা)
শ্রেণী : চতুর্থ, ক-শাখা

ছেলে ঃ বাবা চিড়িয়াখানা যাব।
বাবা ঃ প্রতিদিন একজায়গায় যাওয়া ভাল না বাবা।
ছেলে ঃ তাহলে আর আমি প্রতিদিন স্কুলে যাবনা।

ধাঁধা

হাট থেকে এল রাজা প্যান্ট শার্ট পরে
প্যান্ট ঃ শার্ট খুলে দিলে চোখ জ্বালা করে

উত্তর ঃ পেঁয়াজ

শাহরিয়ার আবেদীন

কলেজ নম্বর : ১৮৯৯ (দিবা)

শ্রেণী : চতুর্থ, ক-শাখা

বুবাই ঃ জানিস, আমার বাবা একজন বড় সুইমার। সেদিন গঙ্গায় এক ডুব দিয়ে পরের দিন যমুনা নদীতে গিয়ে উঠেছে।

তোতা ঃ ফু ঃ ! আমার বাবা আরও বড় সুইমার। বাবা সেদিন ওয়াসার ট্যাঙ্কে ডুব দিয়ে পরের দিন আমাদের বাড়ির কল দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

মাস্টার মশাই ঃ আমি তোমাকে এতক্ষণ ধরে ডাকছি আর তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন?

ছাত্র ঃ কালই তো আপনি আমাকে মুখে মুখে উত্তর দেওয়ার জন্য বকেছেন।

পিন্টু ঃ মা আইসক্রীম খাব।

মা ঃ না আইসক্রীম খেলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

পিন্টু ঃ ঠাণ্ডা লাগবে না মা, আমি সোয়েটার পরে খাব।

ইফতেখার-উল-করীম

কলেজ নম্বর : ৬৮৮১

শ্রেণী : নবম-গ

এক. শিক্ষক ঃ "পরীক্ষায় অন্যের খাতা দেখে লেখা অন্যায়"-এ বাক্যে কর্ম কোনটি?

ছাত্র ঃ স্যার....এই বাক্যে কোন কর্ম নেই। পুরোটাই কুকর্ম।

দুই. মা ঃ আনু, রান্নাঘরের তাকের ওপর পাঁচটা রসগোল্লা ছিল, এখন দেখছি একটা। বাকিগুলো গেল কোথায়?

আনু ঃ লোডশেডিং ছিল যে, বাকিটাকে দেখতেই পাইনি।

তিন. চিটিংবাজ ঃ (এক পথচারীকে) ঃ ভাই আপনি এই পথ দিয়ে আসার সময় কোন পুলিশকে দেখতে পেলেন?

পথচারী ঃ নাতো! কিন্তু কেন বলুন তো?

চিটিংবাজ ঃ তাহলে আপনার কাছে যা আছে এখনই ছাড়েন, না হলে আপনার পেটে ছোরা বসিয়ে দেব।

চার.

আধুনিক বাক্য সংকোচন

১. যা সহজে খাওয়া যায় - ঘুষ
২. আপনার রং লুকায় যে - মেকাপ বক্স
৩. যা সহজে দেওয়া যায় - উপদেশ

৪. যা সহজে নেওয়া যায় - সরকারী সম্পদ
৫. যা সহজে বলা যায় - মিথ্যা
৬. যা চুষে খাওয়া যায় - চকলেট
৭. তীর ছোঁড়েন যে - রবিন হুড
৮ যে সত্য কথা বলে না - রাজনীতিবিদ

ধাঁধা

১. আম নয়, জাম নয়, গাছে নাহি ফলে, তবু সবাই তারে ফল নাম বলে। -পরীক্ষার ফল।
২. ভাষা আছে কথা আছে সাড়া শব্দ নাই, প্রাণীর সাথে থেকেও তার নিজের প্রাণ নাই। -বই।
৩. তিন অক্ষরে নাম তার বনে বাস করে শেষের অক্ষর বাদ দিলে দেশের ক্ষতি করে। বানর, বান।

"প্রতিভা বলে কোন জিনিস নেই। পরিশ্রম কর, সাধনা কর, প্রতিভাকে আয়ত্ত্বে করতে পারবে"
—ভলতেয়ার

OUR BEST WISHES AND THE HEARTIEST CONGRATULATION AT THE EVE OF PUBLISHING OF "SREEJAN"-2002 ON THE ANNUAL CEREMONY OF DHAKA RESIDENTIAL COLLEGE

MOZAHAR GROUP
(DEDICATED TO QUALITY & COMMITMENT)
AMIN BHABAN (4TH FLOOR)
H/86, NEW AIRPORT ROAD,
BANANI, DHAKA-1213, BANGLADESH
TEL : 8825562, 8812954, 8816011, FAX : 880-2-8826361
E-mail : mozahar@global-bd.net, rita@spaninn.com

English Section

THE MOST VITAL DUTY

THE MOST VITAL DUTY IN THIS DAY IS TO PURIFY YOUR CHARACTER, TO CORRECT YOUR MANNERS AND TO IMPROVE YOUR CONDUCTS.

THREE KINDS OF CHARACTERS

MAN HAS THREE KINDS OF CHARACTERS, HIS INNATE CHARACTER, INHERITED CHARACTER, AND HIS ACQUIRED CHARACTER, WHICH IS GAINED BY EDUCATION.

LIFE

LIFE IN MAN SHOULD BE A FLAME WARMING ALL WITH WHOM IT COMES IN CONTACT.

KNOWLEDGE IS WINGS TO MAN'S LIFE

ARTS, CRAFTS AND SCIENCES UPLIFT WORLD OF BEING AND ARE CONDUCIVE TO ITS EXALTATION. KNOWLEDGE IS AS WINGS TO MAN'S LIFE, AND A LADDER FOR HIS ASCENT.

Apples

Wasiur Rahman
College No : 1551
Class-V (Day)

Apples are green
    Apples are red
Under the trees
    They are neatly spread.

Apples are red
    Apples are green
Apples are fit
    For a King or a Queen.

They grow on a tree
    They fall to the ground
That is the place
    Where apples are found.

Those on the ground
    Will not do for me
Those that I want
    Are up on the tree.

I climb up the tree
    At a sensible rate
I look at the apples
    And judge their state.

If it's an apple
    That's nice and red
Straight in my pocket
    It finds a bed.
And when my pocket
    Is full of fruit
Down I slither
    To share the loot.
I eat the pulp
    I eat the peel
The more I eat
    The better I feel.
I chew the core
    I swallow the pips
I rub my hands
    And I smack my lips.

Apples can be eaten
    By poor thin beggar
Apples cab be eaten
    By men with fat figure.

I like apples so much
    They never get bore
And I am not going to
    Tell you any more.

A Fact

Rasheeq Saeed
College No- 1508
Class-V (Day)

Do you know how much work
Our class can do?
Our class can do more than
A dog loves you.
Our class can sweep out
The places I name.
A big place a little place
To us it's all the same.

We can sweep out the class.
We can sweep out the zoo.
There is not one thing
That our class can't do.

We can sweep out a box.
We can sweep out a hat.
We can sweep out the moon.
Our class can do that.
We can sweep the park.
We can sweep the swings.
We can keep up and sweep up.
All places and things.

We can sweep out the cold.
We can sweep out the light.
We can sweep it up best.
We can sweep it up right.
We could sweep the sun yellow.
We could sweep the water blue.
If you want purple flowers.
We can do that for you.

We are the best class
In the sweeping game.
Our class is the best class.
That you could name.

Education

Md. Riad Arefin
College No- 819
Class-VII (Day)

Education is the backbone of a nation
It is a part of modern civilization
To gather it
We roam everywhere.
We should remember
Education makes us conscious
The good and bad side
Of human's nature.
Education is light
Education is power
For its ray in our life
We should make us proper.

What is Life

Fazle Rabby Khan
College No-2376
Class - VIII (Day)

Life is my story
But believe it a sorrow,
Life is a game
But full of awe
Life is a challenge
But should be met,
Life is a journey
So should be completed
We must play
Because its a game
We must realize
It's also a dream
If we cannot do these
We will drown in life sea,
We will reach at the end of life
Then what will we see?
This is life
Of our human being.
Time and life
Past is misty
Past like dust
Past is dusty
And Past is past
We live in the present
We work in this,
We dream of the future
We think it tender.
But it may be bad
It may even be worse.
One's life passes gently,
Another's passes badly.
Our life is an admission of good and evil
And at least to the death it goes.

How are you Bangladesh?

Md khayerul Alam
College No : 455 (Day)
Clcss : IX

Congratulations Banglsdesh
How are you?
Take my hearty love
Thanks to you
I am fourteen
Also are you?
No! We are not year- mate
Came into view
Beloved like Bangladesh
Give me a kiss
It gives me pleasure and
Much much bliss

Your fresh, green, nice scene
Give me delight
I enjoy your gift and
Fascinating sights
I nurse you in my heart
As a dear
You are my heart beat
A lot of cheer
I dedicate all my love
Only to you
Thirty one years old Bangladesh
How are you?

Soul

Mondip Gharai
College No. 8004
Class : X

It's not a particle,
Not a wave,
It's not covex
Not concave.
It can't be seen
we only can feel,
It's like a dot,
Or bigger than a hill.
Reason of life,
Cause of birth,
For the soul
We come to the earth
Soul departs the body
We call it death,
But, soul remains in the body
Till the last breath.

Beautiful World

Arifur Rahman
College No : 8481
Class : XI

What a bautiful world
we live in!
Trees and trees around us,
Rivers flow on the land.
What an attractive scenery
We are observing!
Hearing the chirping of birds
And viewing the hill -top
What a curious joy
We are enjoying!

Holy Wars

Rubayeth Ferdous Chisty
College No. 6049
Class : XII

Brother will kill brother
Spilling blood across the land
Killing for religion
Something I don't
Fools like me, who cross the sea.
And come to foreign lands
Ask the ships for their belief
Do you kill on God's command?
A country that's divided
surely will not stand
My past erased , no more disgrace
No foolish naives stand
The end is near, it's cry shall clear
Part of master plan
Don't look now to Israel
It might be your home and
Holy wars.

Riddle Keys—
1. Teapot
2. A Flag
3. An Egg
4. Hot dog.

Present, Past and Future

Kazi A.S.M Nurul Huda
College No-2047
Class : XII (Day)

I remember all my past
Which is now to me last.

It helps me to be grateful
To some useful men in my life.

I dream future
Which will come soon in my life.
It helps me to decorate my life.
I always think present
Which is running.
It gives me a great job
To be responsible in my life.

Present, Past and Future
Try a man to go an open air.

The Very Story

Md. Asadur Rahman Khan
College No : 1874
X Commerce 1874
Class : X (Day)

Very easy to say 'no'
Very hard to say 'yes'
Very easy to use the word 'sorry'
But ,
Very hard to forgive every body
Very easy to spend money
But,
Very hard to earn money
Very easy to hate each other
And not
Very easy to love.

The woman

Asma Begum
Lecturer

The woman is alone in her world
She has no one of her own
She is alone in the world
She is a deprived poor fellow
No one is for her.
She is in a great sorrow all the time
She loves and takes care for everyone
But no one feels for her
She is alone in the world.
The woman wants to escape from her world
But her cruel beloved mocks at her
The soul of the woman dies of negligence
Such a departed soul gets peace.

Jokes

Md. Riad Arefin
College No- 819
Class - VII (Day)

1

Teacher : Rahim, Which is the longest river in Bangladesh?
Rahim : Sir, Ganga (!)
Teacher : Your Head is full of cow-dung. Now, Karim, Where grows rice best?
Karim : On Rahim's head, sir.

2

1st foolishman : What will the fishes do when it is fire in the river?

2nd foolishman : They will climb up the trees.
1st foolishman : You are a foolishman, the fishes cannot climb up as the cows.

Joke

Iftekhar -Ul -Karim
College. No. 6881
Class : IX

Father : What is the difference between an elephant and a chicken?

Son : An elephant can have chicken pox but a chicken can't get elephant pox.

My Mother

Tanvir Ahmed
College No- 1513
Class-V (Day)

I never stay without my mother. A few years ago my mother left Dhaka for two days, keeping me along with my father. First day I played with my toys and ate some of my favourite dishes, then I went to sleep by listening nice stories form my father, But next day I began to feel the absence of my mother. I often asked my father when my mother would come. I began to feel very much lonely. Afternoon appeared following the noon. But my mother did not come. I was waiting along with my father at the bus stand. When ever a bus was coming, I tried to find my mother. But my mother did not come. Evening sheded the light of the afternon. I returned home with my father and cried. Television, favourite toys, nice dishes nothing could stop my crying. I couldn't sleep at that night. I was moving from one room to another room. In the morning I heard a knock at the door. I thought my mother might come. Yes, she was! Mother picked me up and cried. I also cried.

I felt heavenly, as if I had met my mother years after.

A Cricket Match I Enjoyed

Bikram Roy
College No.1045
Class : VIII (Day)

Some years ago a tournament between India and Pakistan was going on. I desired to enjoy the match. I told my father about that. So my father bought two tickets. The venue was "Bangabondhu National Stadium". On that day we got up early, took the breakfast and got ready to go. When we reached the stadium, Tendulker was out by Azhar Mahmud. I felt sorry for that. Many people came there to enjoy the match.

The stadium was very dusty and noisy. When Afridi was standing near the rope of boundary, some naughty boys threw some bottles and paper and said many bad languages to him that I can not tell anyone. On that match, India made only one hundred and sixty seven runs. In the half time we took the lunch.

On that match Afridi and Inzamam played a wonderful inings. But at last Inzamam was out sadly by a wonderful catch of Sidhu. It was not a matter for the pakistan team. They won the match by five wickets.

Everything was right but throwing stones and bottles to the players was a great dishonour to cricket and a great shame for our nation. My country is a cultured nation. It is the country of Kazi Nazrul, Jashimuddin, Shamsur Rahman. I love my country very much. Some naughty people are making our country bad to the eyes of games loving people of the world. Our Stadium is a famous one. We are lucky to have it. So we have to show patience and our love for games by observing discipline in the stadium. Because we are a peace loving and cultured nation in the world.

My Memorable Day

Arnab Kumar Choudhury
College No : 2388
Class : VIII (Day)

A man has many memorable days in his life. When he thinks of them, they crowd in his memory. I have also many memorable days in my life. Most of them are still fresh and vivid in my mind. But now I am to choose one and only one.

However, the day of the prize distribution is the most memorable day in my life One Monday I received prizes for excellent recitation. When I think of this day my mind becomes full of pride and joy.

That was a happy day for all the students. The school premises were decorated with flags and festoons. A nice gate was built to welcome the Deputy commissioner who presided over the function. I also came to the function in fine dress as I stood first in the Aunnal examination. I was one of the prize winners. I also stood first in the recitation of poems. So I was the winner of another prize. So our Head master told me to sit on the bench for the prize winners.

At the time of prize distribution, the assistant Headmaster shouted my name and told me to receive the prize for recitation. I walked to the platform, shook the president by the hand, received the prize and came back to my seat. I also received the second prize in the same way when I was called for to receive it. All looked at me with a feeling of appreciation. It was the most glorious day in my life. My parents waited patiently on that day and they showed the prizes to many people in the neighbourhood. So, it is the most memorable day of my life.

So, I never forget this memorable day.

A Packet of Jokes

Tonmoy
College No. 2398
Class : VIII (Day)

1. Father asked his son, " My dear son, why are you weeping?
   The boy said, " Teacher has beaten me in the class."
   Father said, "Certainly you did a mistake"
   The boy replied, "No papa, I didn't make any mistake."
   Being surprised father said, "Then why did he beat you?
   The boy again said, " I don't understand any thing.. I did nothing. I was just sleeping.
2. Oneday a passerby as ked me "You fool! What's your name?
   I replied, " I have a few names. My uncle, aunt and cousin call me as Tamzid. My friends call me as Tonmoy and silly people call me as fool".
3. Teacher asked the student, "How many genders are in English Grammar?
   The student said, "Four kinds sir."
   "What are they?" Asked the teacher. The student replied, " Msaculine gender, Feminine gender, Common gender and Alexander."

A Boy with a Mission

Shafayet Hossain
College No. 1330
Class : VIII (Day)

In 1945, a 12 year old boy saw something in a shop window that set his heart racing. But the price five dollars was far beyond 'Reuben Earl's means. Five dollars would buy almost weeks groceries for his family.

Reuben couldn't ask his father for the money. Everything Reuben's father, Mark Earl made, Reuben's mother, Dora, stretched like elastic to feed and clothe their five children.

Nevertheless, he opened the shop's door and went inside. Standing proud he told the shopkeeper what he wanted, adding, "but I don't have the money right now. Can you please hold it for me for some time?"

"I'll try" the shopkeeper smiled. "Folks round here don't usually have that kind of money to spend things. It should be kept for a while"

Reuben respectfully touched his worn cap and walked out into the sunlight. He would raise the five dollars and not tell anybody.

Hearing the sound of hammering from a side street, Reuben had an idea.

He ran towards the sound and stopped at a construction site. People built their own homes using nails purchased in hessian sacks from a local factory Sometimes the sacks are discarded in the flurry of building and Reuben knew he could sell them back to the factory for five cents a piece.

That day he found two sacks, which he took-to the rambling wooden factory and sold to the man in charge of packing nails.

The boy's hand tightly clutched the five cent pieces as he ran the two kilometres home.

At home Reuben found a rusty baking soda tin and dropped his coins inside. It was dinner time when Reuben arrived home. His father sat at the big table, working on a fishing net. Dora was at the kitchen stove, ready to dinner as Reuben took his place at the table.

He looked at his mother and smiled. She was slim and beautiful.She was the glue who held their family together.

Her chores were never ending. She had a lot of work to do. But she was happy. Her family and their well being were her highest priority.

Everyday after chores and school Reuben scoured the town, collecting the hessian nail bags. On the day the two room school closed for the summer, no other student was more delighted than Reuben. Now he'd have more time for his mission.

All summer long, despite chores at home Reuben kept to his secrect task. Soon the school reopend. The leaves fell and the winds blew cold. Reuben wandered the streets, diligently searchig for his hessian treasures. Often he was cold, tired and hungry, but the thought of the object in the shop window sustained him.

Sometimes his mother asked : "Reuben, where were you? We were waiting for you to have dinner."

"Playing, Mum. Sorry."

Dora would look at his face and shake her head. Finally spring burst into glorious green and Reuben's spirits eruped. The time had come! He was into his house and uncovered the tin can. He poured the coins out and began to cout. Then he counted again. He needed 20 cents more. Could there be any sacks left any where in town? He had to find four and sell them before the day ended. Reuben ran down water street.

The shadows were lenthening as Reuben arrived at the factroy. The sack buyer was about to lock up.

"Mister! Please don't close up yet." The man turned and saw Reuben dirty and sweat stained.

"Come back tomorrow, boy"

"Please, Mister I have to sell the sack now- please"

"Why do you need this money so badly"?

"Its a secret." The man took the sacks and put four coins in Reuben's hand, Reuben murmered "thank you" and ran home.

Then clutching the tin can, he headed for the shop..

"I have the money," he solemnly told the owner.

The man went to the window and retrived Reuben's treasure.

He wiped the dust of and gently wrapped it in brown paper. Then he placed the parcel in Reuben's hands.

Racing home. Reuben burst through the front door. His mother was scrubbing the kitchen door.

"Here, Mum! Here !" Reuben exclaimed as he ran to her side. He placed a small box in her work-roughed hand.

She unwrapped it carefully, to save the paper A blue velvet jewel box appeared Dora lifted the lid, Tears began to blur her vision.

In gold lettering on a small almond- shaped brooch was the word "Mother".

It was Mother's Day, 1946.

Dora had never received such a gift; she had no finery except her weedding ring. Speechless, she smiled radiantly and gathered her son into her arms.

Riddles

Collection : Iftekhar Ul-Karim
College No : 6881
Class : IX

1. What starts with T, ends with T, and is full of T?
2. What is always flying and never goes any where?
3. What is most useful after it is broken?
4. What kind of dog has no tail? *(See page 110)*

Daffy Definitions

1. Experience : A comb of life which you get after you have lost all your hair
2. Secrets : Words which we tell everybody not to tell any body.
3. Etc : We use 'etc' to show a person we know every thing even if we don't know anything
4. Doctor : A person who kills your ills with pills and later kills you by his bills.
5. A time bomb: An invention to end all inventions.

Jokes

Mahbub Kabir
College No : 1304
Class- IX (Day)

1

One night, a woman rushed into a pharmacy and asked the pharmacist if he had any thing that would cure hiccpus The pharmacist immediately slapped on the woman's face.

I bet that has cured your hiccups, he said.

The woman at once slapped on the pharmacist's face and exclaimed with anger, 'you fool, my sister outside in the car has them.'

Three Engineers and a Faulty Car

Ishtiaque Ahmed Rabbi
College No. 2194
Class : IX (Day)
Topic : Jokes 4 you

There are three Engineers in a car; an Electrical Engineer, a Chemical Engineer and a Microsoft Engineer. Suddenly the car just stops by the side of the road, and three Engineers look at each other wondering what could be wrong.

The Electrical Engineer suggests stripping down the electronics of the car and trying to trace where a fault might have occurred.

The Chemical Engineer, not knowing much about cars, suggests that maybe the fuel is the cause. The the Microsoft Engineer, not knowing much about anything, comes up with a suggestion: If we close all the windows, get out, get back in, then open the windows again, maybe it'll work?

Strict Street Patrol

Paddy 'n' Mick join the army, and are put on street patrol in a city with a military curfew. They are given instructions to shoot anybody who's in the streets after 6 o'clock. So one day, they're out at twenty to 6, when Paddy stops a man walking on the other side of the street. He lines up the man in his sights and shoots the man dead. Mick is shocked.

"What are you doing Paddy? It isn't 6 yet".

"I know what I am doing : I know where he lives and he wouldn't have made it!"

Three Insane Men

Three insane men walk out of a mental hospital hoping to escape
The first says, "If there's a high fence, We'll jump over it!"
The second says, "If there's a low fence, we'll jump over it!"
The third says, "Well, we're out of luck, boys-- there is no fence,"
So instead, they just went back to their rooms.

A Memorable Incident in My life.

Every man's life has some memorable incidents I have some memorable incidents in my small life. But the most memorable moment in my life is when I stood before the Tajmahal, one of the seven wonders. It was 16th July of 1999. My mother, my elder sister, younger sister and my maternal uncle were with me. We went to India some days ago. Basically we went for treatment and then visited the beautiful place of india. First we went to Calcutta, then Chennai and stayed there 7 or 8 days, for treatment. After finishing treatment and visiting Chennai, we went to Jaipur, Agra, Delhi and Ajmirsharif. But the most memorable for me was to visit the Tajmahal. When we entered through the main gate of Tajmahal, I felt very excited. It was a great achievement of my life. There were only two graves inside the Tajmahal. One is of Emperor Sahjahan and the other is of his beloved wife Momtaj Mahal. Every side of the Tajmahal looks same. The beauty of the Tajmahal knows no bounds. I will naver forget that moment.

Afghanistan : Humanity vis-a-vis

Rafsan Elahi
College No : 1299
Class : IX (Day)

Blood thirst, breaking news of last year was the hitting of world trade towers in New York and other security points in Pentagon of U.S.A in terrorist attacks. Towers were demolished as two big passenger planes dashed against killing people in planes and those working in towers. Another plane hit Pentagon and the last one crushed in Pennsylvania failing the target. People on board all died. The scenario to keep peace was not that simple. There was a bid to find out those responsible for such outrageous activities. True, more than five thousand people died and were missing and measures were stepped up to stop recurrence as none claimed responsibilities for the carnage.

The U.S government did not sit idle. Efforts were under way to track down the criminals and one Osama Bin Laden a Saudi millionaire living in Afghanistan was the prime suspect. Taleban government ruling there was reported to have backed him in terrorism.

We like other people then tried to map out Afghanistan-It is in middle Asia with rocky mountainous and hill terrains living only 3% of total land for agriculture. For long it was quiet before 1972 when Zahir Shah was deposed. Since then it has been a bloody spot with risen fall of regimes. It has many ethnic groups majoring "Pastu" in population with Pakistan, Iran, and Uzbekistan bounded around. In 1979 Soviet Union invaded and entered here against the will of the people forcing them into war and it never ended; Million left Afghanistan for Pakistan to live there as refugees. Hundreds of thousands of people including children, women, infirm, old incapable people died and its economy lowered to bottom of poverty. Humanity is disregarded shattered, women, children, old and distressed were killed like anything. September 11th occurrence triggered U.S.A to wage all out war against Taleban and Osama Bin Laden increasing killings manifolds and sufferings of humanity in many times. Taleban government had been crushed and new caretaker government was supported by U.S.A and other big power is now in power there. What about the killing now? Still its going on. Peace is yet a long way to achieve and a long war is ahead to win. World conscience should come forward and sit together to stop blood shed in Afghanistan. Killing cannot end killing rather invites farther brutality and revenge. Could we show respect to innocent helpless and distressed people and help them build a peace-loving society without any fear, threat and intimidation to human. So much blood filled the rivers of Afghanistan and any farther bloodshed

may overflow. No more killing or attack or counter attack or no more quench of blood thirst. Love and only love can bring peace and efforts should be made by world powers that everybody can love everyone without discrimination and we should also hate war, terrorism and any other activities harmful to human civilization.

Jokes

SK. Muhit Ahmed
Coll. No : S -463
Class : X (Day)

(1) Book seller : If you read this book, you will certainly get 50% marks.
Student : OK. give me two books so that I can get 100% marks.

(2) In the practical class :
Teacher : If anybody drops a goldbar in a glass full of Acid, what will happen to the goldbar ? Will it melt?
Student : No Sir.
Teacher : Can you tell me why ?
Student : Of course, if it melted, the man would never do this!

(3) Grammar Teacher : "He killed a robber"- what is the case of this sentence?
Student : Obviously, "murder case"

(4) Two foolish men were riding on a boat. Suddenly there was a hole in the boat.
1st : Look, water is coming through this hole, what can we do?
2nd : Make another hole so that it can go.

(5) Examiner : Babul, montu, why are your essays, about the cow are same?
: Because, we have written the essay about the same cow.....

Don't cry, just laugh

Ezrarul Alam Khan
College No : 476
Class : X (Day)

Teacher : Who can swim without making his hair wet?

Student : He, who is bare- headed.

A terrorist is asking Mr. Rahman to give 5 lakhs taka.

Terrorist : If you don't give me 5 lakhs taka, I will throw atom bomb to your, properties.

Mr. R ahman : What will happen then?

Terrorist : All your properties will be turned into dust.

Mr. Rahman : Then I should give you the amount . I have dust allergy.

The Story Hour

S.M.M. Mijba-ul Islam
College No. : 483
Class : X (Day)

"When does the story hour come?" a little boy asked oneday. "Show me on the clock."

The story hour is a magical hour. Sometimes you can show it on the clock, sometimes you cannot. Sometimes it comes just before you go to bed. Other time it may come on a rainy day or a picnic day. Stories and rhymes are the first part of literature we come to know about . In ourchild-hood, our mother read us a story whenever we say "Read me a story" or "say a rhyme." That is the story hour. When we curl up in a chair and read a story or a rhyme to ourselves- that is the story hour too!

When does the story hour come? It can come right now when you open a book and find stories to read and rhymes to say.

Freedom

Mahmood Reaz
College No : 511
Class : X (Day)

Freedom-
You are the smile of a farmer with his golden farm
Little girls unbounded swim through a crow black pond
The glistening eye of the border guard in a lonely night
Freedom -
Hot cross words in a crowd with the passing flavour of tea
The body tangling words of a bright young man
Under the old forgotten tree
The bent trees in a hard gale far and wide
Streaming river in the rain
Freedom-
A father's prayer with his strong liberal heart
Mother's wrinkled sari in a soft wind
The heavenly coloured soft hand of a liking girl
A beaming canvas in a friend's hand - soaked with blood
Freedom -
The smile of a child, the song of a bird
The open heart- with the map of our motherland..

Jokes

MD Asadur Rahman Khan
College No : 1874
Class : X (Day)

(1) Teacher : Can you answer why bears have got so long hairs?
Student : Because there is no saloon in the jungle!
(2) (Seeing his friend Jane jumping)
John exclaimed : Why are you jumping?
Jane : I am repairing my mistake.
John : What mistake?
Jane : I have not shaken my bottle of medicine before taking it.
(3) Teacher : Are you chewing gum?
Asad : No, madam, I am Asad.

Love and Hatred

A.B.M. Shahidul Islam
Asst. Professor,
Department of English

You know about so many things of different tastes, colours and interests around you. Do you know of lies? Of course you do, at least to some extent as they are indivisibly interwoven with the affairs of our life just like the natural joys and sorrows, losses or gains are.

If you gather all the books of ethics and religions, and the speeches of all the saints, sayes and scholars of great repute of all ages, you naturally get an unfathomable heap of advice and sermons against lies. If all these advice, sermons and teachings were a nuclear bomb, its one single explosion aimed at pernicious lies could have wiped them out from the face of the earth. But such a long for blast never took place and will never take place. Therefore, lies both black and white with black seemingly predominating, had been these, and will be there in the affairs of man.

People lie for a queer variety of reasons. Lies have many colours, faces and manifestations. They may be innocent, unharmful, heart touching and sometimes much needed. Again they (lies) may be very vulgar, highly subtle, vicious weird, nasty, heinous, torturing, devastating and disastrous. These black faced lies are at perpetual war against humanity from time unknown.

We often listen to some lies smilingly and approvingly; to some smilingly but unwillingly; to some silently and helplessly; and to some compellingly but scornfully.

Think of M.K. Rawling's Jerry and his lies. How innocent, unharmful and affecting those are! They (his lies) add an extra dimension to his character deepening the depth of his loneliness, intensifying the authentic cry of a starving soul and making the irreparable wounds of his ever bleeding heart almost physically visible to us.

Think of Maugham's lady guest and her lies. How feigning, cadisk and torturing they are! They (her lies) simply wake our disgust and make her character though memorable for many other reasons a repelling stuff.

Think of the big bosses and their tricky and purposeful lies. Aren't they (their lies) enormoulsy harmful; keenly afflicting and far more damaging than those of the commoners? Infact, they are. Any explanation in this regard will sound superfluous.

Think of a famous doctor treating a dying patient and his lies. Aren't they (the doctors lies) sometimes enlivening and encouraging? Perhaps they are, because they have the power to add a consoling and comforting effect to the burning hearts of many, to save many a tear at least for the time being.

Think of a brilliant lawyer who knowingly takes side with a confirmed criminal, and his lies. How are they (the lawyer's lies)? Doesn't he trade lies for money? Doesn't he employ all his talents and efforts to see lies victorious? Doesn't he go all out to defeat his counterpart who fights for the right cause?

Think of the poets and their lies. I wonder if their (the poets) fine, surperising and pleasing excess could at all be called lies. The sceptics may argue, but good people should always know that poets' lies are ever encouraging, invigorating and inspiring, and of course, full of teachings.

Think of a callous and profit monger businessman and his lies. Aren't they patently vicious?

Now, think of a helpless and hapless mother trying to comfort her starving and crying child, and her lies. How are they? Aren't they heartrending? Don't they (the helpless mothers lies) strike and prick our conscience?

Finally think of the vile and servile politicians and tyrants and their naked lies under the veil of sweet commitments. Aren't they extremely dangerous and disastrous? Don't they go directly and widely against interest of humanity? Can this blame be adequately refuted? History will surely not help them.

Therefore, blatant lies and liars are always there lying in wait to destroy our moral values and human qualities.

So, knowing, distinguishing and marking things are very important for our own sake.

You can guard against your enemy only when you are able to detect them. Ignorance in this regard will leave you exposed and unprotected to the sheer advantage of your foes.

You are capable of fervent hatred for all that stain and ruin your soul only when you are capable of deep love for all that elevates your status to the lofty rank of human a unique piece of creation who is capable of loving, hating, accepting and refusing, but never giving in.

Let a Dream Come True

Manzur-al-Matin
Class : XII
College No.- 6028

It takes a thousand years for a culture to evolve. I don't Know how long it takes to destroy one. Every country, every nation and every tribe has its own culture, and these cultures are treasures not only to them but to the whole world. Now in this age of economic expansionism, the cultural entities of nations with lesser economies are about to lose their identities. It is the duty of every citizen of the world to stop this process and help these cultures survive We must not let the cultures of the world be lost for ever.

But what is culture? Culture is the way of life of a society or of a nation. It includes arts and literature, intellectual expressions of any kind, customs, faith and religion and creed. In a word it is that bundle of activities which represent their attitude towards life.

A few days back I had the opportunity to travel to India to attend an international convention. In the end of the convention a farewell party was arranged. I saw with surprise that it was a party arranged totally in western style. People were dancing all over the place and singing western songs. Unfortunately there was not a single item that belongs to Indian culture. That was my worst moment in that tour.

In that tour I found out that the individual cultures of the different states existed no more rather all the young people were running after the cheap Hindi culture. No one seemed to care about it anyway.

Then, a few weeks after my coming back to Bangladesh a reunion was arranged in my college. All the Remians gathered there. I had the opportunity of meeting one of the very first students having college number 16. It was turning out to be a great day for me. Then came the night. It was announced that a cultural ceremony would be arranged. We all were waiting eagerly to see some

good old country music to be played on. I have heard of many x-students and saw many who could sing and make the listeners sink in the music. Who still can soothe the minds of listeners of all levels. But instead there was a very ugly display of western waste!

I knew that my culture is at risk but I never believed it has come this far. I never dreamt that the dark hands of western culture could tear apart the aged old cultural environment that Dhaka Residential Model College had created over such a long time. But my strongest beliefs fell shattered that night.

I had to see my fellow classmates dance like some crazy beasts that night I still can't understand what came into them. They don't know, what they are doing is wrong and there in no one to tell them. I guess they now believe that this is youth. My generation believes that youth is all about throwing all that the people of this country have created and preserved for thousands of years and catching whatever the west throws at us-be it the rotten waste.

My generation says Nazrul Sangeet, Rabindra Sangeet, Foke and anything that is classical is for the old. They are more interested in Pop music which has no depth either in music or in the lyrics, I find it hard to be called music at all

What hurts me most is that no one cares about telling us about our culture. Culture appears to be just a negligible part of life. No one is there to tell us what wisdom, what philosophy and power is there in our own music. Our culture seems to be a forgotten thing to us all.

Even if one wants to know anything about his culture there is only a few place he can go to. If a college student goes to the market and asks for a collection of Nazrul Sangeet, the salesman, in most cases gives him a strange look. In most cases he will find no collection at all. But if he asks for a CD of 'Back Street Boys' I am sure he can return home with a pile of CD's. This is no imagination of mine, this is the reality.

Now we a have new threat to our culture, which is Hindi culture, Hindi movies are flooding in, and so are the Hindi songs. It seems that Hindi songs are an undisputable part of our present culture. They are every where- in the buses, in the parties, even in a tea stall in a rural area. It's like a virus spreading every where, even to the farthest corner of the country. I came to know many people who think that Hindi songs are the only songs which are popular to all. I am afraid that the case is turning out to be so.

Now we have lost our identity in our race, our language and even in our food. Now the parents are more interested to send their children to English medium school- these children call their parents "Dad" and "Mom"; I can't blame them! When we go for higher studies, we have to study in English. We want to get a job-we need good skill in English. We even don't have our own dress. When we go abroad there is nothing that can identify us as Bangladeshis. Culture seems to be enclosed only in eating "Panta" once a year. Shame to this culture!

I won't be too surprised if my next generation has no clue whatsoever as to who was 'Hason Raza'- a king or a warrior! They might not hear a single "Lalon Gitee" in their whole life and they would never know what they are missing.

The situation is not much different through out the world. People all over the world are obsessed with western culture. But what is western chlture? Is it a culture at all? The truth is it is not a culture at all but a way to destroy the cuture and economic back bone of the weak However the powerful countries which have created this evil are themselves affected by the globalization of the evil. Their societies have lost their moral values and are threatened with crisis of identity.

Fate it is; that culture is being controlled by few who control the economy and they are using the culture to dominate in the economical fields. They are destroying local cultures to create market for their products that are in many cases harmful and are slowly destroying the social economical structure of nations which are economically weak The Godless materialism is eating the bones of all nations of the world. The question is what is the way out? The answer is the development of each nation's culture and flourish of their values based on religion and creed.

Some people would like to call it globalization. I call it cultural and economical subjugation. This is a part of a master plan to destroy the third world countries. If this process continues there is nothing that can stop our race from extinction.

Then again who am I to say all these things -I too am unable to say these words in my own language because my computer won't understand my language. The modern age is the age of information technology and we are so far behind in it that we don't even have an operating system in our language. All we can do in computers is just type - we can't do a spelling check after that. All the other things regarding computer is done in English. We are entirely dependent on English in this field. But still we celebrate 21st February as the language day -what a mockery.

So, what now? What can we do to return to ourselves and why we should do that? Why is our culture so important?

First of all, we must save our culture because that's all we have. It differentiates us from the rest of the world. Our culture is our identity. We have fought for our culture and we must fight again. Then again the people of Bangladesh don't get to eat-there is no food in our stomachs why we should care about our culture? We still must care, because culture is what can unite us and unity is the only thing that can save our country from the current economic crisis. All that I am saying may sound too old to many but it is my duty and it is the duty of every citizen of this country to speak out loud over and over again that our culture is in the risk of extinction. We have lost our wealth in the 200 years of British rule and we don't want to loose what is still left.

Invaders like Aleksandra may come and go with little impact but a rule like that of the British even if goes out lives behind their culture which often becomes difficult to shake off. A cultural slavery is the worst of all slaveries.

Now the question arises -how can we save our culture that we have almost forgotten? It is hard to get rid of this virus of cultural aggression. But there are ways. First of all we must let the young generation know their culture. So we must make our culture available and accessible to new generation. Parents must play a vital role in convincing their children that our culture is the thing that makes us what we are and it cannot be replaced by another culture. Children should not be exposed to alien cultures.

The educational institutions have a vital role to play too. The teaching methods must be designed to create interst in our culture and they must introduce our culture to the young in a manner that will give them a feeling of belonging to our culture.

I still belive that if my generation knew the beauty of our culture, they would never turn their backs on it. If they just knew what it felt like to be in some thing that totally and entirely belongs to them. We just need one chance, only one chance to know our culture and we have the right to know it.

I don't want to see my culture being lost like this. I don't want my generation to forget all about our music, dress, food and all that we stand for. I want my generation to sing the music of my soil: I want my generation to study and work independently, without the help of any other language other than Bangla. I want to see my countrymen united under the umbrella of my culture. This is my little dream. Let this dream come true.

FOURTH INTERNATIONAL CONVENTION ON STUDENTS' QUALITY CONTROL CIRCLES (4th ICSQCC-2001) LUCKNOW, INDIA

Col Md Mosharrof Hossain
Principal

1. Introduction. The 4th ICSQCC-2001 was held at City Montessori School & Degree College, Lucknow, India from 05 December 2001 to 10 December 2001. 17 Countries including the host India participated at the 4th ICSQCC. Some other countries are U.S.A, U.K, Germany, Switzerland, Japan, Singapore, Malaysia, Kuwait, U.A.E, Mauritus, Fiji, Nepal and Bangladesh. The convention aimed at focusing the spotlight on the need for adopting QCC as an integral part of academics. It strongly underlines the need to empower the students so that they can find solutions to their problems, develop analytical skills, team work and channelise their creative potentials in order to meet demands of the millennium.

The last few decades of the tweentith century have seen drastic changes in global relationships. As the world expands from a nation state to a global village, it becomes inevitable and essential to introduce new trends in the educational system so as to change the present mindets and develop leaders with quality vision and attitude. The new world order envisages a new era of world peace, prosperity and brotherhood for the whole humanity. This can become a reality only if we have a centred approach towards education.

2. Itinerary. The team included the Principal, one teacher and 4 students of the college. The team left Dhaka on 01 December 2001 at 2230 hours and reached Lucknow on 04 December 2001 at 1800 hours by road/railway via Kolkata. We had a post Convention Sight seeing tour on 09 December 2001 at Lucknow. From 10 December 2001 to 12 December 2001 we visited some historical and important places. We visited the Tajmahal and Agra Fort at Agra. We visited the Maharaja's place and Hawamahal in Jaipur. We went to Kutub Minar, Delhi Gate, the Parliament Bhaban and other important places of Delhi. The Team left Delhi at 2230 hrs on 12 December and returned to Dhaka on 15 December 2001 evening via Kolkata.

3. **Business / Competition Sessions.** Following events / competitions were held in the convention :

Stream - A - Case Study presentation
Stream - B - Collage
Stream - C - Debate
Stream - D - Poster & Slogan
Stream - E - Skit
Stream - F - Quality Quiz
Stream - Z - Paper presentation

4. **Participation of Dhaka Residential Model College.** The students of our college participated in 04 Streams. Brief description of their performance is as under :

a. **Stream- B (Collage).** The Themes were i) Vision for 21st Century : Unleashing the creative power of people and ii) Quality for global peace. Almost one hundred teams participated in this stream. Our students, the only team from Bangladesh, took part in this event. Their performance was good and was praised by the delegates.

b. **Stream- C (Debate).** The topic was 'Quality is free but not gifted.' The most interesting and competitive event was debate. 151 teams participated in this stream. One of our stu-

dents spoke for the motion and the other spoke against the motion. Our team did very well in this stream. But unfortunately they could not come up either as best speaker or as runner up.

c. **Stream- D (Poster and Slogan).** The theme was 'Quality is attitude: Catch then young. Blending Ambition attitude and action for Success". Our college was the only participating team from Bangladesh. The students tried their best and did a fairly good presentation.

d. **Stream - F (Quality Quiz).** The topic was "Quest for right word, universe and cosmos, Arts & Literature, legends and sports, invention, Technology & Science, your choice : The Computer." Our students participated in this stream with other 150 teams. Only three teams were awarded.

e. **Country Presentation.** During the official Farewell dinner every participating teams had to present one item reflecting their culture. Only 04 students of Dhaka Residential Model College form Bangladesh took part in this event. They danced in colourful Baul dress, drums and Ektara with the song 'Takdum Takdum Bajee Bangladesher Dhol.' Our students presentation was highly praised by the delegates.

5. **QCC Forum Pannel Discussion.**

QCC in Academics; An initiative to develop Total Quality people (TQP).

I want to mention few names of the dignitaries and experts who spoke on different session. The names are given below :

a. Dr. Donold Dewar
President, QCC International U.S.A

b. Dr. Shoji Shiba
Dean, Tokiwa University, Japan.

c. Dr. John Mann
Managing Director, Smart Process International Pvt. Ltd.
Singapore

d. Dr. Itay Zimaran
Dean, David Yellin College of Education.
Jerusalem, Israil.

e. Professor S. Chakrabarty
Indian Institute of Management
Lucknow, India.

f. Mr. Andreas Plozenki
Quality Editor & Professional
Berlin, Germany.

g. Prof. Mathew Barunestein

Maharishi Institute of Management & Technology
India.

h. Mr. Hans J Muller
Managing Director HJM
Switzerland

i. Prof. Dinesh P. Chapagain
Kathmandu University School of Management
Dhulikhel, Nepal

j. Prof. Dr. Syed W. Ali
The Jhon Hopkins University
USA

k. Dr. A. N Saxena
World Academy of Productivity Science
New Delhi, India

6. **Management.** Almost 1500 delegates from different states of India & other Participating countries were cordially received by the organising Committee at Lucknow Air-Port and Railway station. The overall management of city Montessori School & Degree College was excellent. They opened information and help desk as well. Every where teachers and students tried to help the delegates, It was a massive and hard task. It may be mentioned that City Montessori School has been imparting quality education through its 16 branches in Lucknow for the past four decades. It has recently registered its name in the Guinness Book of World Records for being the largest private school in a single city Starting with only 5 students, now it has enrolled about 25000 students.

   Thanks to Dr. (Mrs) Vinneta Kamran, the Convenor of 4th ICSQCC and Principal, City Montessori School and College, Lucknow, for her hospitality and make the Convention a success. I also want to thank Mr. Jagadish Gandhi, Chairman City Montessori Schools and Colleges at Lucknow. CMS is reputed through out India and abroad.

7. **Next Convention.** The 5th ICSQCC will be held in Kentucky U.S.A in June 2002. The Convenor of the 6th Convention is Dr. Dallas J Blackeniship, Principal Toyota Campus School, Kentucky. U.S.A. All participating teams of the 4th Convention will be invited to attend the 5th Convention.

8. **Conclusion.** The ICSQCC-2001 is a window to show case the vision, creative ideas and latent talents in various streams on the theme of quality by the delegates. It is an attempt to provide a common platform to the students and academicians to exchange ideas, share views and experiences with the aim of popularising and institutialising QCC in school and colleges as an integral part of TQM (Total quality management) for a better tomorrow. The students of Dhaka Residential Model College attended such convention for the first time. Attending this type of convention is very helpful to academic and extra academic activities for both students and teachers.

কার্টুন

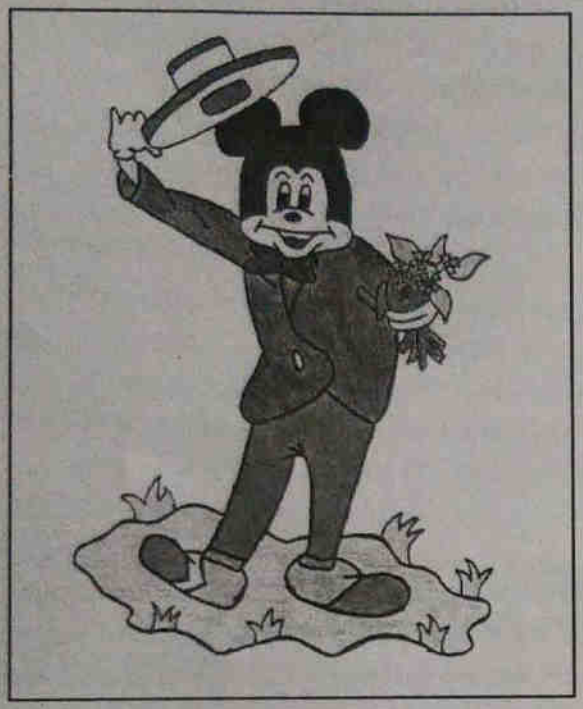

আসিকুর রহমান
কলেজ নম্বর-৭৯৫৬
৫ম শ্রেণী

আসিকুর রহমান
কলেজ নম্বর-৭৯৫৬
৫ম শ্রেণী

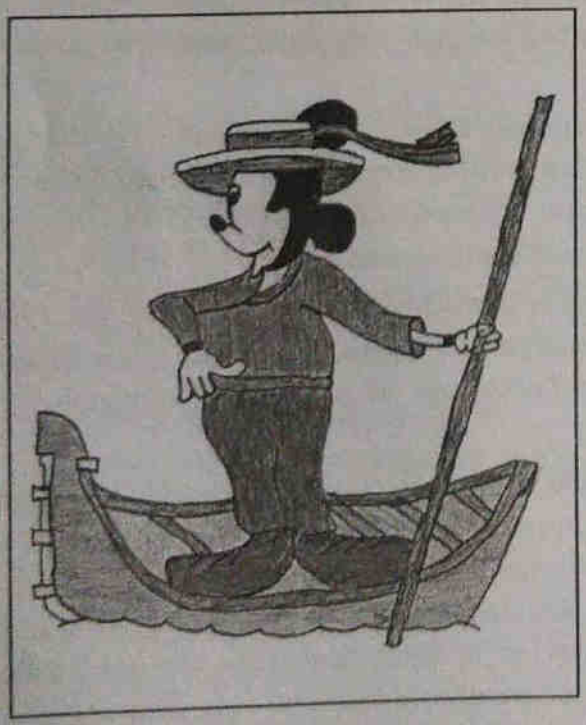

আসিকুর রহমান
কলেজ নম্বর-৭৯৫৬
৫ম শ্রেণী

সুলতানুল আরেফিন
কলেজ নম্বর-৭৭৮৩
ষষ্ঠ শ্রেণী

Monowara Hospital
মনোয়ারা হসপিটাল

The Science of of Medicine-The Art of Care

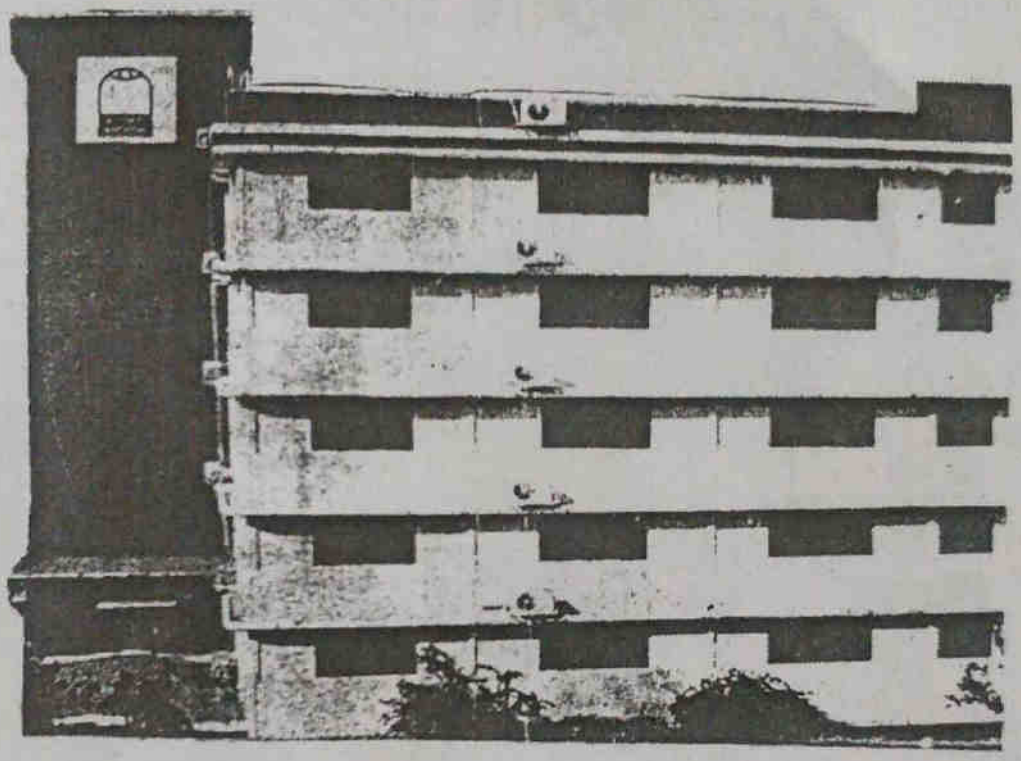

Monowara Hospital (Pvt.) Ltd. is a genuine multi-hospital system with 60 beds, housed in a 7-storeyed scientifically planned building.

Its prime location in the heart of Dhaka on Siddeshwari Road adds yet another dimension to the significance of this outstanding facility.

IN-PATIENT SERVICES :

- Internal Medicine
- Cardiology
- Endocrinology
- Gastroenterology
- General Surgery
- Gynaecology and Obstetrics
- Health Screening
- Hepatology
- Nephrology
- Neurology
- Orthopaedics
- Paediatrics & Paediatric Surgery
- Neonatology
- Plastic Surgery
- Reconstructive Surgery
- Respiratory Medicine
- Urology

The Hospital Surgical Suite comprises of most modern and highly equipped 3 Operation Theatres. For all kinds of surgery including Laparoscopic and Endoscopic procedures.

Emergency, Medicine, X-Ray, ECG services available for 24 hours

Monowara Hospital (Pvt.) Ltd.
54, Siddeshwari Road, Dhaka-1217
Phone : 838135, 839802, 838529
Fax : 933-6595

সম্মানিত পলিসিহোল্ডারগণের আস্থাই আমাদের সাফল্যের মূলে

সন্ধানী লাইফের অব্যাহত অগ্রগতি কোটি টাকায়

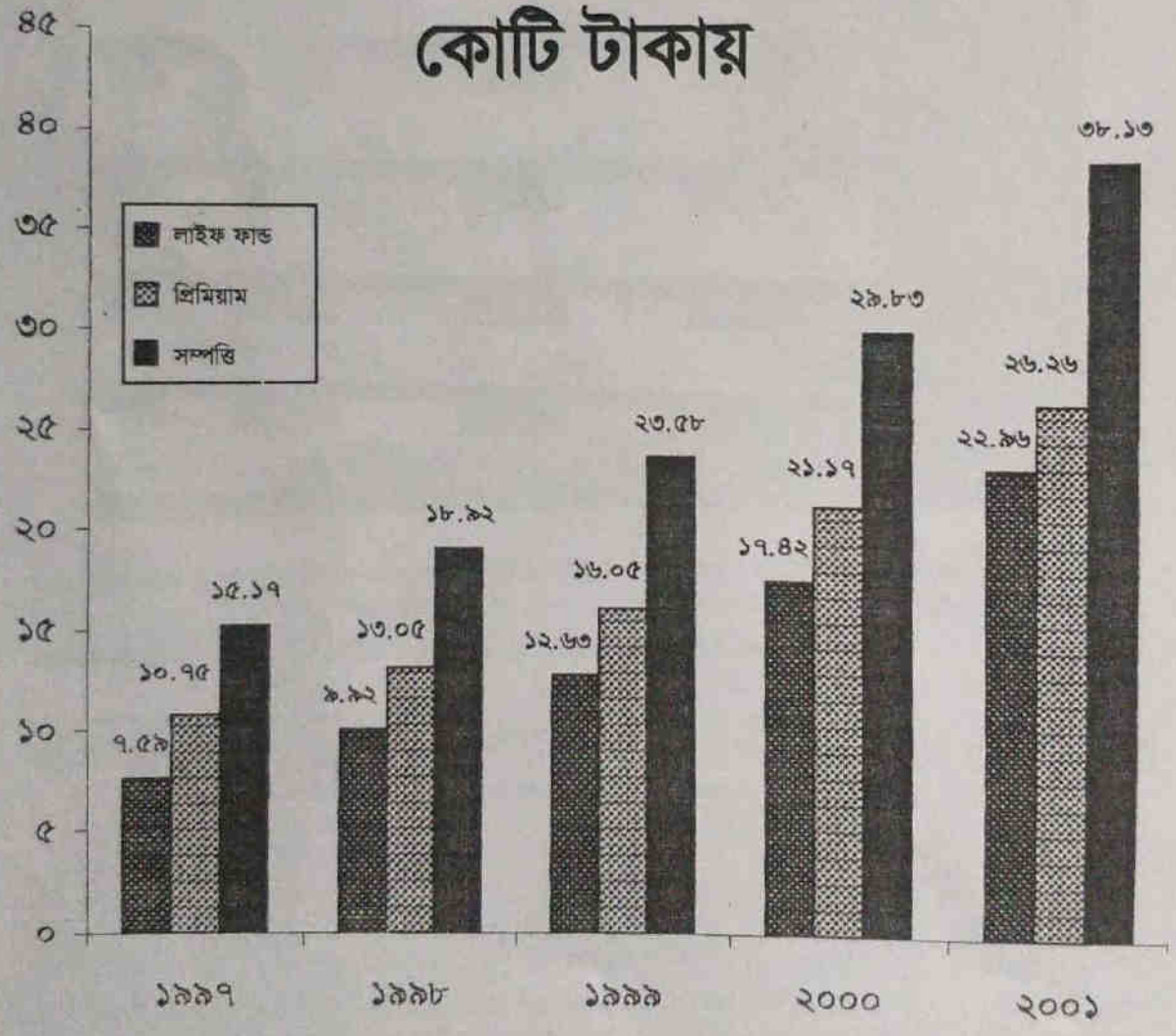

সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

তরঙ্গ কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ১৯ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫৬৩৫২১, ৯৫৬৩৪৬৪, ৯৫৫৫৮২৮, ৯৬৬৭০৩০, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০২-৯৫৫৪৮৪৭

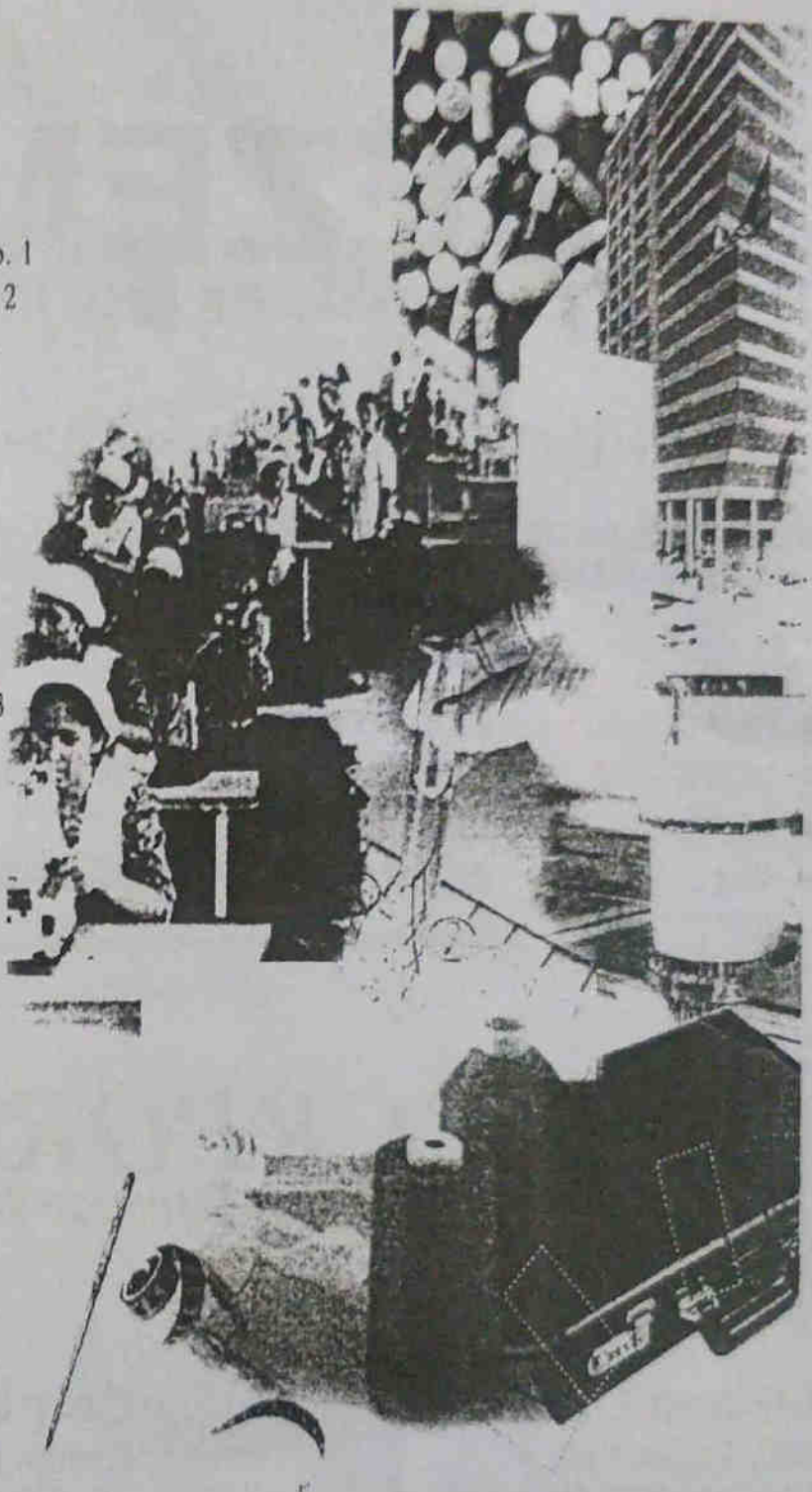

Spinning Division

Shamsul Alamin Cotton Mills Ltd. No. 1
Shamsul Alamin Cotton Mills Ltd. No. 2
Abdul Bari Cotton Spinning Mills Ltd.
Jahanara Alamin Spinning Mills Ltd.
Rokara Spinning Mills Ltd.
Sunny Specialised Spinning Ltd.
Fuad Spinning Mills Ltd.
S. A. Spinning Mills Ltd.
S. A. W Textile Mills Ltd.

Fabrics & Garments Division

Shamsul Alamin Cotton Mills Ltd. No. 3
Shamsul Alamin Fabrics Ltd.
Shamsul Alamin Fashions Ltd.

Oil Division

Shamsul Alamin Oil Refinery Ltd.
Sanchita Edible Oil Refinery Ltd.

Leather Division

Rana Leather Industries Ltd.

Trading Division

Shahin Traders Co.
Premier Jute Baling Ltd.

Real Estate Division

Shamsul Alamin Real Estate Ltd.

Pharmaceuticals Division

Shamsul Alamin Pharmaceuticals Ltd.

Shamsul Alamin Group

ALAMIN CENTRE : 25/A, Dilkusha C/A, Dhaka, Bangladesh
Phone PABX: 9564507, 9564509, 9566025-6

BEZEMA

COLOURS ARE OUR PASSION

SEE THE FUTURE IN COLOUR WITH BEZEMA

BEZEMA AG, SWITZERLAND IS THE PRESTIGIOUS MEMBER OF ETAD CLUB OF DYESTUFFS MANUFACTURES WHO OFFERS AZO FREE HIGH QUALITY DYESTUFF

- REACTIVE - BEZAKTIV
- DISPERSE - BEMACRON
- CATIONIC - BEZACRYL
- VAT - BEZATHREN
- DIRECT - TUBANTIN
- PIGMENT - BEZAPRINT & BEZAFLOUR
- OTHERS DYESTUFFS

R.H. CORPORATION

(COUNTRY REPRESENTATIVE OF CAT & BEZEMA)

Liaison Office :
240, Tejgaon I/A
Dhaka, 1208, Bangladesh
Tel : 9886437, 8829161, 603485
Fax : 9881481
E-mail : marina@bol-online.com

Corporate Office :
Zaman Court (2nd Floor)
45, Dilkusha C/A, Dhaka
Tel : 9554101, 9551479, 9551583
Fax : 9559433
E-mail : marina@bol-online.com
khushi@intechworld.net

The
STATEMENT
The
STYLE
The
STATUS
The
LEISURE
The
PLEASURE
The
LIFE

at

Dhanmondi
Kemal Ataturk Avenue
Segun Bagicha

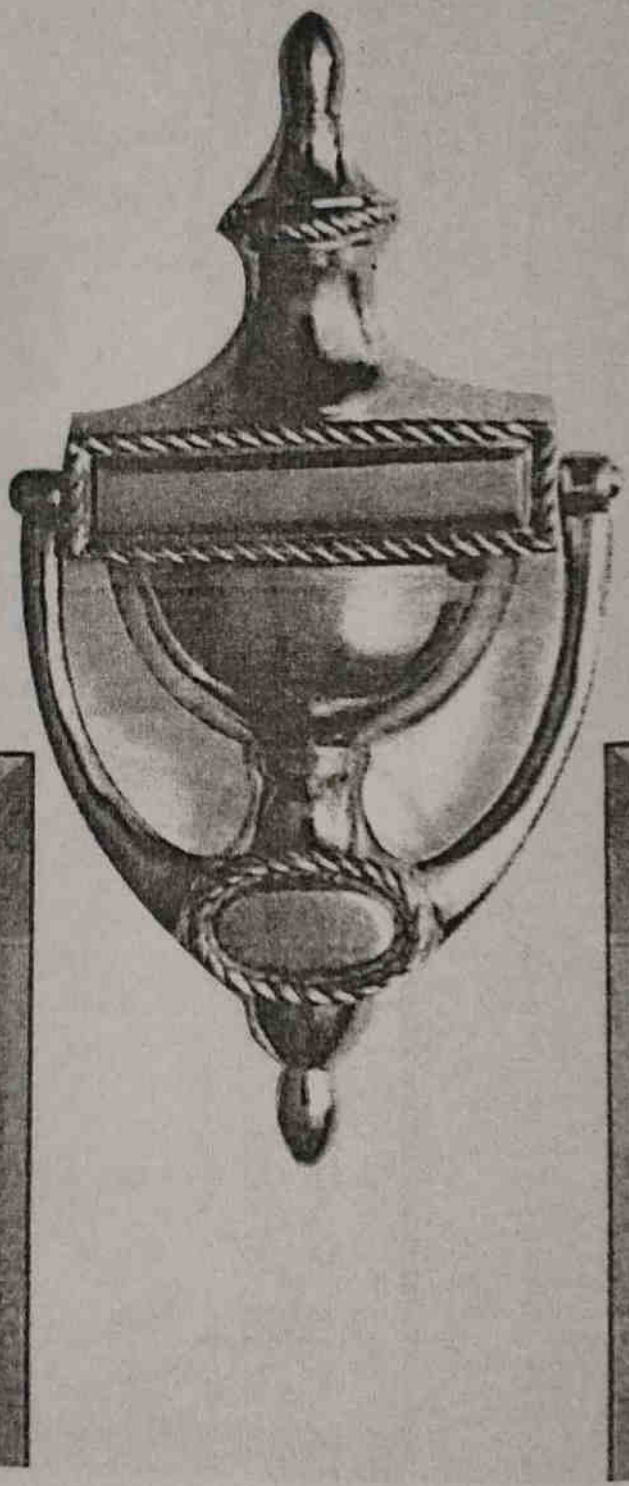

প্রিয়াঙ্গন

PRIYO PRANGON

-when the choice is forever

HCL

Hamid Real
Estate Construction Ltd.
2 Paribagh Dhaka
Tel 8613053 8613912
Fax 8613155 8613052
e-mail hamid@bangla.net
web site : www.hamidgroup.com

শিক্ষা ভবন-২